লোককথার লিখিত ঐতিহ্য

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

গাঙচিল

শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত

শ্রীদুলাল চৌধুরি

শ্রীবরুণকুমার চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

সূচি

লোককথার ঐতিহ্য

লোককথা মৌখিক ঐতিহ্য-বাহিত সাহিত্য। এর প্রাচীনতা বিষয়ে প্রাজ্ঞজনদের কোনো সংশয় নেই। কিন্তু ইতিহাসের কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। যেহেতু লোককথা লিখিত সাহিত্য নয়, তাই এর উৎসকালের পাথুরে প্রমাণ থাকাও সম্ভব নয়।

মানবসমাজের বিবর্তনের ধারায় একসময় গ্রামসমাজ গড়ে উঠল। গ্রামসমাজ হল গোষ্ঠীজীবনের সমাজ। এর আগেও গোষ্ঠীজীবন ছিল, কিন্তু গ্রামসমাজ ছিল না। যারা খাদ্য-সংগ্রাহক তারাও এক এক গোষ্ঠী হয়ে জীবনযাপন করত। কিন্তু প্রাকৃতিক ফল-মূল সংগ্রহের জন্য নানা জঙ্গলে যাযাবরের মতো ঘুরতে হত। যারা শিকারজীবী, তারাও শিকারের সন্ধানে এখানে ওখানে বিচরণ করত। যারা পশুপালক, তারাও পশুর চারণভূমির জন্যই স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হত।

পরের স্তরে কৃষির উদ্ভাবন ঘটল। একই জমিতে বারবার ফসল হয়, বহুবিধ ফসল হয়, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ফসল ঘরে ওঠে। অর্থাৎ যাযাবর গোষ্ঠীজীবনে স্থিতি এল। আর জীবন-রক্ষার জন্য কিছুটা

নিশ্চিন্ত-ভাব দেখা গেল। হয়তো খরা-বন্যায় ফসল অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তবু তো আগের তুলনায় অনেক শান্তি। আর তখনই গড়ে উঠল গ্রাম-জীবন। সারাদিনের ক্লান্তির পরে অবসরও মিলল। আর এই সময়ই জন্ম দিল মৌখিক ঐতিহ্যের।

শিকারজীবী স্তরেও যে সংস্কৃতি ছিল তার পরিচয় রয়েছে গুহাচিত্রে। আর নৃত্য যে প্রথম সাংস্কৃতিক প্রকাশ তারও হদিস মিলেছে গুহাচিত্রে। হরিণ-বাইসনের ছবি এঁকে তারা নাচ করত হাতে তির-ধনুক-বর্শা নিয়ে। এসব 'পবিত্র জাদু', ছবি এঁকে নাচ করলে সহজে শিকার পাওয়া যাবে। কিন্তু ছবি ও নাচের অতিরিক্ত কোনো মৌখিক ঐতিহ্য সেই সমাজে সম্ভব ছিল না।

আবার বিশ্বের সব জনগোষ্ঠীই একই সময়কালে কৃষিজীবীতে পরিণত হয়নি। সমাজ-বিকাশে মানবগোষ্ঠীর অসম সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে। একুশ শতকেও অস্ট্রেলিয়ার আর্নহেম ল্যান্ড কিংবা আন্দামানের ওংগে-জারোয়া জনগোষ্ঠী মধ্য-প্রস্তর যুগের জীবনযাপন করে। এরকম উদাহরণ এখনও শত শত পাওয়া যায়।

অবশ্য কৃষি-সভ্যতার উন্মেষের সময়কালে ব্যাপক দুনিয়া-জুড়ে এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে। কারও কোনো প্রভাবে নয়, নিরপেক্ষভাবে মানবসমাজের ব্যবহারিক প্রয়োজনে, শ্রমশক্তিকে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত করে, পারিবারিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে, সংহত চিন্তার উত্তরণ ঘটিয়ে গ্রামসমাজের মধ্যে নতুন ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হল। গ্রামীণ সমাজে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, দক্ষ, বিচক্ষণ ও উদার একজন মানুষ গোষ্ঠীপতি হয়ে সমাজকে পরিচালনা করতে উদ্‌যোগী হল।

এই কৃষিজীবী গ্রামসমাজে প্রথম সুষ্ঠু কামনার জন্ম হল। এদের তিনটি কামনা সমাজকে শুধু নিয়ন্ত্রণই করল না, স্তরে স্তরে এগিয়ে নিয়ে চলল। এই তিনটি কামনা হল: আমাদের সমাজের মায়েদের অনেক সন্তান হোক, আমাদের ফসলের জমিতে প্রচুর শস্য হোক আর আমাদের গৃহপালিত পশুদের অনেক ছানা হোক। এর চেয়ে বড় কামনা সেই সভ্যতার স্তরে আর কী হতে পারে!

আর সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে নিশ্চিত জীবনে যে অবসর মিলল সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টির প্রেরণায় প্রকাশিত হল গান, লোককথা, জীবনের অভিজ্ঞতা।

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা পরিশ্রমী গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কৃষিজীবী সমাজের গ্রামসমাজেই প্রথম লোককথার সৃষ্টি হয়। সেসব কোন লোককথা তার ইতিবৃত্ত জানা সম্ভব নয়, মৌখিক ঐতিহ্য বলেই সেসব অজানা থেকে গিয়েছে। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে জানা যায়, লোককথার ঐতিহ্য ছিল সেই সমাজেই।

লোককথার ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করে আমরা তিনটি ধারা পেয়েছি। প্রথম ধারাটি বিশ্লেষণ করে আমরা পরের দুটি স্তরের হদিস পেয়েছি। এই তিনটি পর্ব আলোচনা করলে আমরা লোককথার ঐতিহ্য বিষয়ে জানতে পারব।

ক. গ্রাম-সমাজের কৃষক নিজের নিজের গোষ্ঠীতে লোককথা বলেন। বিশেষ করে একান্নবর্তী পরিবারে নারী অর্থাৎ ঠাকুমা-দিদিমা-পিসিমা-মাসিমা নাতি-নাতনি-শিশু-কিশোর-কিশোরীকে লোককথা শোনাতেন। কিন্তু সেসব তো লোকসমাজের বাইরে প্রচারিত হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। লোকসমাজে যারা বলতেন এবং যারা শুনতেন তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে শিক্ষিত নাগরিক মানুষ এসবের কোনো সংবাদই রাখতেন না। যদিও-বা শুনতেন, নিরক্ষর চাষিদের এসব লোকসাহিত্যের গুরুত্ব বুঝবার মতো মানসিকতা তাদের ছিল না।

কিন্তু পরিবর্তন ঘটল লোককথার একটি সংকলনকে ঘিরে। সময়কাল উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে সেখানকার কৃষকদের লোককথার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। সংকলন করেন উচ্চশিক্ষিত দুই ভাই। তাঁদের নাম জেকব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রিম ও উইল্‌হেল্‌ম কার্ল গ্রিম। এই দুই ভাই ছিলেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গবেষক, পুরাণতত্ত্ববিদ এবং পদ্ধতিগত লোকসংস্কৃতি-চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ।

জার্মানির কৃষকদের লোককথার সংকলনটির নাম Kinder-und Hausemarchen. দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে।

শিক্ষিত ও নাগরিক মানুষ কৃষকদের মৌখিক সাহিত্যের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন। আর লৌকিক ঐতিহ্যের লোককথা সংগ্রহে উৎসাহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

একটি বিস্ময়কর তথ্য রয়েছে আমাদের দেশে। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টীয় পুরোহিত উইলিয়াম কেরি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। নাম 'ইতিহাসমালা'। এই সংকলনটির সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই। দেড়শত কাহিনির

সংকলন। এর মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রচলিত কয়েকটি রূপকথা-পশুকথাও রয়েছে। হয়তো তেমন সচেতনভাবে এগুলি সংকলিত হয়নি। কিন্তু লোককথা সংগ্রহে যে মানসিকতা তিনি প্রকাশ করেছিলেন তার ইতিহাসগত গুরুত্ব রয়েছে। একে উপনিবেশ, পরবশ দেশ, তার ওপরে ভাষা বাংলা— তাই এই গুরুত্ব প্রচারিত হয়নি।

জার্মানির পরেই এ বিষয়ে সবচেয়ে ব্যাপক কাজ হয়েছে ফিনল্যান্ডে। কিন্তু ব্যাপ্ত সংগ্রহের আগে খ্রিস্টিয়ান গানানডার ১৭৮৪ সালে পশুকথা ও ১৭৮৯ সালে লোকপুরাণের দুটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এইসব লোককথা ফিনল্যান্ডের কৃষক-পশুপালক-মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করেন।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল 'ফিনিশ লিটারারি সোসাইটি'। এই সোসাইটি গড়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ গবেষক। পাঁচ বছর পরে সংস্থা একটু সংগঠিত হওয়ায় এঁরা দেশের মানুষের কাছে আবেদন জানালেন, দেশের প্রতিটি মানুষ সাধ্যানুযায়ী যেন লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে সোসাইটির দপ্তরে পাঠায়। সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকে সংগ্রহ-বিষয়ে শিক্ষিত করে বৃত্তি দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ১৮৪৯ সালের মধ্যেই লোককথার বিপুল সংগ্রহ হাতে এল।

একজনের নাম স্মরণ করতেই হবে। পিতা জুলিয়াস ক্রোন ছিলেন লোকসংস্কৃতি গবেষক। তাঁর পুত্র কার্লে ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে ফিনল্যান্ডের ওলোনেজ ও ওয়ার্মল্যান্ড এলাকায় সমীক্ষা করে আট হাজার লোককথা সংগ্রহ করেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইউরোপ আমেরিকা ও এশিয়ায় কৃষকদের লোককথা সংগ্রহে উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। হানস্ খ্রিস্টিয়ান অ্যান্ডারসেন, লালবিহারী দে, সি. এইচ. বোমপাস, ডি. এ. ম্যাকেনজি, এ. প্লেফেয়ার, কে. এল. পাসকার, পি. এ. ট্যালবট, জেমস্ জর্জ ফ্রেজার, স্টিথ টমসন, জন ফিস্ক, শোভনা দেবী, উইলিয়ম ম্যাক্কুলোচ প্রমুখ অসংখ্য সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতি গবেষক লোককথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। তাঁদের এসব সংগ্রহ ও আলোচনা চিরায়ত লৌকিক সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। এই প্রবণতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত তীব্র ছিল।

খ. দ্বিতীয় ধারাতেও লোককথার সংগ্রহ বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। কিছু মানুষ বিশেষ আদর্শের দ্বারা প্রাণিত হয়ে এসব লোককথা সংগ্রহ করেন।

এঁরা মহৎ মানুষ। শিশু-কিশোরদের সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে এঁরা নীতিশিক্ষা দিতে চেয়েছেন। সরাসরি নীতিশিক্ষা দিলে সুকুমারমতি শিশু-কিশোর যে সেসব গ্রহণ করে না, সে অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল। তাই তাঁরা সঠিকভাবে আশ্রয় করেছেন লোককথার।

এঁরা হলেন বিষ্ণু শর্মা, নারায়ণ, পিলপে, ঈশপ, জাতকরচনাকার প্রমুখ। এঁদের উদ্দেশ্য মানবশিশুর মানসিকতাকে উদ্দীপিত করা। এসব লোককথা সবই লিখিত আকারে প্রকাশিত।

আর কিছু সংগ্রহ রয়েছে যেগুলির উদ্দেশ্য অস্পষ্ট, মনে হয় এগুলি বিনোদনের জন্য সংকলিত হয়েছিল। গল্পের মাধ্যমে আনন্দদানই ছিল মূল কথা।

কিন্তু এসবের শেকড়ে রয়েছে লোককথার ঐতিহ্য। লৌকিক সংস্কৃতি থেকেই এসব কাহিনির উৎসার। বৃহৎকথা, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎকথামঞ্জরী, লুসিয়াস অ্যাপুলেইয়াসের লোককথা সংগ্রহ, জাঁ দ্য লা ফঁতেন-এর নীতিকথা, সহস্র এক আরব্য-রজনী এই পর্যায়ভুক্ত। লোককথার ঐতিহ্য-আলোচনায় এসব সংগ্রহও খুবই মূল্যবান।

গ. তৃতীয় ধারাটি সবচেয়ে জটিল। কেননা, এইসব লিখিত রূপে কীভাবে লোককথা জড়িয়ে রয়েছে তার জট খোলা বেশ গবেষণাসাপেক্ষ। একমাত্র ভারতবর্ষীয় মহাভারতে উল্লিখিত লোককথার সন্ধান বেশ সহজ। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তত স্পষ্ট নয়।

তৃতীয় ধারায় রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি, গিলগামেশ— পৃথিবীর পাঁচটি সুপ্রাচীন মহাকাব্য। সেইসঙ্গে বেদ, উপনিষদ, ওল্ড টেস্টামেন্ট, গ্রিক মিথকথা, মধ্যপ্রাচ্যের মিথকথা প্রভৃতির মধ্যে অনেক লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলি চিরায়ত সাহিত্য-ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। এই লোকসমাজের লোককথা প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত হলেও এইসব মহাকবি ও ধর্মপ্রণেতাগণ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধিত করবার জন্য লোককথার পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন। মহাকাব্য, ধর্মীয় গ্রন্থ কিংবা চিরায়ত মিথকথা লিখিত রূপে প্রকাশের সময় স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন আনতে হয়েছে। কেননা, লোককথা বলা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, লোককথার নীতি ও মর্মবস্তু তাঁদের চিন্তার ক্ষেত্রে অনুকূল বলেই এগুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। তাঁদের ভাবনা ও

দর্শনকে মহাকাব্য-ধর্মগ্রন্থে প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। সহায়ক হয়েছে লোককথা। তাই এসবের মধ্যে লোককথাকে আলাদা করা বেশ কষ্টসাধ্য। কিন্তু অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে একেবারে অসাধ্য নয়। পরিশ্রমী পর্যবেক্ষণে এসবের মধ্যে লোককথার সন্ধান মিলেছে। কেননা, লোককথার মধ্যে এক ধরনের স্বতন্ত্র পদ্ধতি ও মানসিকতার অস্তিত্ব বহমান থাকে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধারাটির মধ্যে লোককথার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

লোককথার শ্রেণিবিভাগ

লোকসংস্কৃতির অন্যতম জনপ্রিয় আঙ্গিক হল লোককথা। কোন কালে কোন মানবসমাজে লোককথার উৎসার ঘটেছিল তা আমাদের অজানা। কেননা, আজও পৃথিবীর এমন অনেক জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা দূর এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে, এমন সমাজ রয়েছে যারা এখনও পুরোপুরি শিকারজীবী, চাষ করতে জানে না, এমন সমাজ রয়েছে যারা শিকার করতে জানে না, পুরোপুরি খাদ্যসংগ্রাহক গোষ্ঠী— এসব লোকসমাজেও কিন্তু লোককথার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ গোষ্ঠীজীবন শুরু হওয়ার পর থেকেই লোকসমাজে লোককথার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মানব-ইতিহাসের কোন স্তরে তা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরাও সঠিকভাবে বলতে পারেননি।

আবহমান কাল ধরে লোকসমাজে লোককথা সৃষ্টি হয়ে আসছে। কিন্তু সেসবের খবর গোষ্ঠীর বাইরে কেউ জানত না। অষ্টাদশ শতক থেকে ইউরোপের উপনিবেশবাদীরা গোটা পৃথিবীতে দেশ আবিষ্কারে নেমে পড়ল। দেশ দখল, সে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন, উপনিবেশ স্থাপনই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এভাবে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার অসংখ্য এলাকা

একদিন ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হল। এদের অত্যাচার-নৃশংসতার কাহিনি ইতিহাসে রয়েছে। উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে এল সরকারি প্রশাসক এবং খ্রিস্টীয় পুরোহিত সম্প্রদায়। নির্মমভাবে কিংবা 'ভালোভাবে' শাসন করতে গেলে সেই দেশের ভূগোল, ভৌগোলিক এলাকার মানুষ ও তার লৌকিক সংস্কৃতিকে জানা বড় জরুরি। এই দুই শ্রেণির মানুষ, প্রশাসক ও পুরোহিত প্রথম পরাভূত দেশের লৌকিক সংস্কৃতির ভাণ্ডার সংগ্রহ করতে থাকেন। তারপরে আসেন জ্ঞানান্বেষণের জন্য নৃবিজ্ঞানীরা। এই তিন শ্রেণির মানুষের সহায়তায় বিশ্ব অজানা লোকসংস্কৃতির অনন্য ভাণ্ডারের পরিচয় জানতে পারল। এভাবেই লোককথার ভাণ্ডার ধীরে ধীরে বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হল। এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতিপ্রেমী প্রাজ্ঞ মানুষজনের অক্লান্ত গবেষণায় লোককথার শ্রেণিবিভাগের তথ্যও আমাদের সমৃদ্ধ করল।

লোককথার শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে এইভাবে: ১. পশুকথা ২. রূপকথা ৩. পরিকথা ৪. কিংবদন্তি ৫. লোকপুরাণ ৬. নীতিকথা ৭. গীতিকার অন্তর্ভুক্ত কাহিনি এবং ৮. ব্রতকথা।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ করতে হবে, লোকসমাজের মন কোনোদিন রাজনৈতিক বিভাজন কিংবা আরোপিত ভৌগোলিক বিভাজন মেনে নেননি। তাই আমরা লোককথার বিস্তার দেখতে পাই পার্শ্ববর্তী এলাকায়। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সহজ লৌকিক মানসিকতায় একে অপরের আত্মজন হয়েছেন। এমন মানবিক-মানসিক সেতুবন্ধন লোকসমাজেই সম্ভব।

১. পশুকথা

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, লোককথার মধ্যে সবচেয়ে আদি সৃষ্টি পশুকথার। পশু-পাখিকে কেন্দ্র করে যে কাহিনি গড়ে ওঠে তাকেই সাধারণত পশুকথা বলা হয়। কিন্তু কাহিনিতে পশু-পাখির চরিত্র থাকলেই যে সেগুলো পশুকথা হবে তা নয়। যেমন রূপকথা কিংবা নীতিকথায় পশু-পাখি থাকে, সেগুলো পশুকথার অন্তর্ভুক্ত হবে না। মূল চরিত্র হবে পশু-পাখি, এবং তাদের ঘিরেই আবর্তিত হবে লৌকিক কাহিনি।

পশুকথা কেন লোককথার মধ্যে প্রাচীনতম, সে বিষয়ে মন্তব্য করেছেন একজন নৃবিজ্ঞানী, one of the oldest forms, perhaps the oldest,

of the folktale and found everywhere on the globe at all levels of culture. *Mac Edward Leach· Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend. Funk & Wagnalls Co. New york. 1949.* page 61

পশুকথা কেন প্রাচীনতম আঙ্গিক তার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি। পশুকথার বৈশিষ্ট্য হল, এগুলো আকারে খুব ছোট হয়। আদিম মানুষ ব্যাপ্ত চিন্তা করতে পারত না। আর পশুকথার পশু-পাখি কিন্তু আচার-আচরণে পশু-পাখি নয়, এরা মানবচরিত্রের মতোই আচরণ করে। মানবসমাজের আচার-আচরণ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-হীনতা-ক্ষুদ্রতা-স্বার্থপরতা-উদারতা-মহত্ত্ব-আত্মত্যাগ-বীরত্ব-বুদ্ধি সবই পশু-পাখির প্রতীকে প্রকাশিত হয়েছে।

পশুকথা যে প্রাচীনতম লোককথা তা মানবসমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের বিবর্তনধারার ইতিহাস লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। পশুকথার জন্মের ইতিহাসটি কেন প্রাচীনতম তার বিস্তৃত পরিচয় জানা জরুরি।

নানাবিধ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা আদিম মানুষকে বিব্রত করে তুলত। তারা ভেবেছে, অদেখা শক্তি নিশ্চয়ই এইসব প্রতিকূলতার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে, আর তার ফলেই এইসব অঘটন ঘটছে। ভীতি আর সরল বিশ্বাস থেকেই আদিম মানুষের মধ্যে সহজ ধর্মের উৎপত্তি ঘটে।

আদিমকালের এইসব দেবতা প্রথমে পাহাড়, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষের আকারে পূজিত হয়েছেন। তারপর পশুর আকৃতিতে দেবতা পুজো পেয়েছেন। তারপরে অর্ধেক পশু, অর্ধেক মানুষরূপে দেবতা আবির্ভূত হয়েছেন।

লোককথার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ও মুখ্য স্থান জুড়ে রয়েছে পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ— এবং এদের ঘিরে পশুকথা। কখনও কৌতুকরসমিশ্রিত আবার কখনও বেদনায় দীর্ণ অনিন্দ্যসুন্দর গল্পকথা গড়ে উঠেছে নানা জাতের পরিচিত পশু-পাখিকে ঘিরে। মানুষ পশু-পাখিকে ঘিরে ক্লান্তিহীনভাবে গল্প সৃষ্টি করেছে।

পশু-পাখি আদিম সমাজে দেবতার সুদৃঢ় আসন দখল করেছে। সিংহ ভালুক হাতি নেকড়ে বেড়াল নেউল সাপ তোতাপাখি ঈগল পশুদেবতার স্তরে উঠেছে। আবার মিশরীয়-সুমেরীয়-গ্রিসীয়-ভারতবর্ষীয়-চিনা সভ্যতায় দেখা গিয়েছে অর্ধ পশু-অর্ধ মানব দেবতা। আজও লৌকিক সমাজে পশু পুজো পেয়ে আসছে।

আদিম মানুষ নিজেদের কৌমদের পরিচয় দিয়েছে পশু-পাখির নামে। অর্থাৎ টোটেম বা গোত্র প্রায় সবই পশু-পাখির নামে। এরাই সমাজের আদি পিতা। লুইস হেনরি মর্গান টোটেমের যে তালিকা তৈরি করেন তার অধিকাংশই পশু কিংবা পাখি। শুধুমাত্র আদিবাসী সমাজে নয়, হিন্দুদের গোত্র-ভাবনায়ও এর ইঙ্গিত রয়েছে। কাশ্যপ—>কচ্ছপ, ভরদ্বাজ—>ভরত বা ভারুই পাখি প্রভৃতি।

উন্নত সমাজে যে রাশির প্রচলন হয়, সেখানেও পশুর আধিপত্য। মেষ বৃশ্চিক সিংহ মীন কর্কট মকর বৃষ— বারোটির মধ্যে সাতটিই প্রাণী।

প্রাথমিক অবস্থায় রোগের তো অন্ত ছিল না। এখানেও নির্ভর করতে হয়েছে পশু-পাখির ওপর। রোগ-নিবারক হিসেবে পশু-পাখির ভূমিকা ছিল ব্যাপক। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, কতকগুলো পশু-পাখির রোগ নিরাময়ের অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে তারা নির্বাচন করত শিকারি পশুকে, অবশ্য অন্য পশুও একেবারে বাদ যায়নি। ভালুক সিংহ নেকড়ে ঈগল বাদুড় প্রভৃতির রোগ-নিরাময়ের ক্ষমতা রয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করে।

আদিম সমাজে পশু ছিল মানুষের পরিচালক ও অভিভাবক। পথ-প্রদর্শক ছিল কুকুর, শিকার খুঁজে দিত কুকুর। পশুর দেহের হাড় কিংবা পশুর প্রতিমূর্তি সঙ্গে থাকলে দুর্গম পথে কোনো বিপদ হবে না বলে তাদের বিশ্বাস ছিল।

পশু কখনও জননী, কখনও ধাত্রী। রোমের চিরকুমারী সিলভিয়ার যমজ সন্তান রেমুস ও রোমুলাস-এর কাহিনি লৌকিক ঐতিহ্য থেকেই এসেছে। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্মদায়িনী একটি হরিণী। এইসব জননী বা ধাত্রী হন স্তন্যপায়ী পশু— হরিণ নেকড়ে গোরু ছাগল কিংবা ঘোড়া।

দুটি আত্মার ধারণা বহু প্রাচীন। দ্বিতীয় আত্মাটির বাহন হয় সাধারণত পশু কিংবা পাখি।

মানুষ গুহায় যে চিত্রাঙ্কন করল তাও পশুর। 'হোয়াইট ম্যাজিক'-এর প্রথম নিদর্শন রয়ে গিয়েছে পশুর চিত্রে।

পশু-পাখির এই যে সার্বিক প্রভাব, কর্মে-চিন্তায়-পার্বণে-আচারে এই যে পশু-পাখির প্রাধান্য তাকে কোনো সময়েই কর্মী ও রসজ্ঞ লোকসমাজ অস্বীকার করতে চায়নি। তাই সে যখন গল্প বলতে বসল, স্বাভাবিকভাবেই

অবচেতন অবস্থায় পশু-পাখিই হল তার গল্পের প্রথম বিষয়বস্তু। সামাজিক মন ও পরিবেশ সাহিত্যে প্রতিফলিত হবেই, এই মৌখিক পশুকথা রচনার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। জীবনকে যারা ঘিরে ছিল, গল্পেও তারা এল মিছিল করে।

পশুকথার পশু-পাখিরা এক বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ চারিত্রিক গুণ নিয়ে উপস্থিত হয়। যেমন, শেয়াল খুব ধূর্ত, খরগোশ অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, ভালুক বোকা, পিঁপড়ে খুব সঞ্চয়ী, সিংহ শক্তিমান হয়েও গোঁয়ার ও বোকা, বাঘ শুধু বোকামি করে, হাতি অবিবেচক, কাঁকড়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে, কচ্ছপ ধীর গতি হলেও কর্মে পারঙ্গম। আবার অন্য কোনো গোষ্ঠীতে এসব চরিত্রের অন্য ধারণাও রয়েছে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পশুকথার পশুরা পুরোপুরি আঞ্চলিক। কিন্তু বক্তব্য-প্রকাশে ও আবেদনে আন্তর্জাতিক।

২. রূপকথা

আফ্রিকা মহাদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার সবচেয়ে জনপ্রিয় লোককথা হল রূপকথা। আফ্রিকার সব দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল পশুকথা। আধুনিক বিশ্বে উনিশ শতকের প্রথমে লোকসাহিত্যের লিখিত রূপের প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয় রূপকথার মাধ্যমেই। গ্রিমভাইদের সেই রূপকথা সংকলন থেকেই লোকসাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত ঘটে।

জর্মন ভাষার 'মারচেন' কিংবা সুইডিশ ভাষার 'সাগা' সত্যিকারের রূপকথার মর্মকথা প্রকাশ করে। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় এসবকে যখন 'ফেইরি টেলস্' হিসেবে উল্লেখ করা হয় তখন কিন্তু রূপকথার তাৎপর্য হারিয়ে যায়। কেননা,— In many ways this is an unfortunate word since not more than a small number of such stories have to do with fairies. *Stith Thompson.*

লোককথার আলোচনায় পরিকথা হল স্বতন্ত্র বিষয়। ইংরেজিভাষী মানুষের 'ফেইরি টেলস্' কোনোভাবেই রূপকথা নয়। কিন্তু তাদের সমাজে 'ফেইরি টেলস্'ই রূপকথা।

রূপকথা অত্যন্ত প্রাচীন এবং ঐতিহ্যময়। প্রাচীন কয়েকটি মহাকাব্য, কাব্য ও পুরাণেও রূপকথা লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মহাভারত ইলিয়াড ওডিসিতেও বিক্ষিপ্ত রূপকথা আছে।

মৌখিক ঐতিহ্যের পথ বেয়ে অন্যান্য লোককথার মতোই এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে রূপকথা প্রবহমান। তাই এর অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে, এবং সে সন্দেহ যথার্থ। কারণও স্পষ্ট। কেননা, কথক কাহিনি বলবার সময়ে নিজের মনের মাধুরী ও কল্পনা মিশিয়ে নতুন গল্পাংশ সৃষ্টি করেন।— It is handed down from one person to another, and there is no virtue of originality. The tale is heard and is repeated as it is remembered, with or without additions or changes made by the new teller: *Stith Thompson. The Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend. Funk & Wagnalls, New york. 1949.* pages 408-409.

রূপকথার মধ্যেই আমরা সবচেয়ে বেশি রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য-দানো-পেত্নি-ডাইনি প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাই। এসবই লোকসমাজের অবচেতন মনের অশুভ-ক্ষতিকারক-দুষ্টু শক্তি। এদের নিধন ও শাস্তিদানই রূপকথার নায়কের প্রধানতম কর্তব্য হয়ে ওঠে। অশুভ শক্তিসমূহকে উচ্ছেদ করেই শুভ ও পবিত্র শক্তি রাজকন্যাকে জয় করতে হয়। মাঝখানে থাকে অসংখ্য বাধা ও বিপদ। কিন্তু নায়কের উদ্দেশ্য যেখানে সৎ, বন্দিদশা থেকে শুভ শক্তিকে উদ্ধার করাই যখন ব্রত তখন সমস্ত বাধা-বিপদ সে অতিক্রম করবেই, অশুভ শক্তি পরাভূত হবেই। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, সৎ কাজে অগ্রসর হলে সাহায্যকারীর অভাব হয় না। সামান্য তুচ্ছ বস্তুও সাহায্যে এগিয়ে আসে, এবং তার সাহায্যও মূল্যবান বলে উপলব্ধি করা যায়।

লোককথার মধ্যে রূপকথাই দীর্ঘতম। এর কারণ হল, রূপকথার আঙ্গিক এমনই শিথিল যে কথক ইচ্ছে করলে গল্পকে বাড়াতে পারেন। রূপকথার কাহিনি ঋজু হলে এই সম্ভাবনা থাকত না। অনেক উপকাহিনি যুক্ত করবার সুযোগ রয়েছে। যেমন, নায়ক অনেক বাধা পেরিয়ে পাতালপুরীতে রাজকন্যার সন্ধানে যাচ্ছে, কথক ভালো শ্রোতা পেলে কিংবা সময় বেশি পেলে বাধাগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে পারেন। কথকের ব্যক্তিগত অভিরুচি, কল্পনাপ্রবণ মন, সৃষ্টি ক্ষমতা, উদ্দীপনা রূপকথাকে দীর্ঘায়িত করতে সাহায্য করে। আবার কিছু রূপকথায় দেখা যায়, রাজপুত্র রাজকন্যাকে মুক্ত করে ফেরার পথে নতুন নতুন বিপদের মুখোমুখি হয়। এটা প্রচলিত রূপকথার রীতি নয়। কিন্তু কথকের ব্যক্তিগত অভিরুচিতে এমন ভিন্নধর্মী রূপকথারও

সন্ধান মিলেছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, রূপকথা সবসময়েই দীর্ঘ হবে, তবে দীর্ঘ করার সুযোগ রয়েছে।

আফ্রিকার সব রূপকথার চরিত্রগুলির নাম রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ রূপকথায় চরিত্রদের কোনো নাম থাকে না। এক যে ছিল রাজা, তার তিন রানি, রাজার তিন ছেলে ইত্যাদি। ডালিমকুমার, শীতবসন্ত, নীলকমল-লালকমল ব্যতিক্রম।— The character of the tale are usually annonymous, and the places are vague and nameless. *A Lang. Introduction to Cox, Cinderella. Folklore Society, London, 1893,* page xiff.

রূপকথার মধ্যে রয়েছে স্থানগত ও চারিত্রিক নির্বিশেষত্ব। তাই রূপকথা অতি সহজেই এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে গৃহীত হয়।

'মাইগ্রেশন' ঘটে সহজেই। গ্রামীণ মানুষ কাহিনির আকর্ষণে রূপকথাকে সহজেই আপন করে নিতে পারে।

সব রূপকথার একটি বিশেষ ছাঁচ রয়েছে। এর আরম্ভ ও শেষ প্রায় একই রকমের। রূপকথায় কখনই বিয়োগান্ত পরিণতি হয় না। রূপকথার মধ্য অংশও একই রীতিতে অগ্রসর হয়। এই কারণে অনেক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী বলেন, রূপকথার বৈচিত্র্য বড় কম। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য কম স্বীকার করে নিয়েও বলতে হবে, রূপকথার মধ্যে এমন কিছু আবেদন রয়েছে যার ফলে রূপকথা সকল জনগোষ্ঠীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় লোককথা। এই আবেদন হল মানবিক ও ইচ্ছাপূরণের মানসিকতায় পূর্ণ।

মানবিক আবেদনের পেছনে কাজ করে সাধারণ মানুষের ইচ্ছাপূরণের তাগিদ। আপাত অবাস্তব অলীক ঘটনাবলির অন্তরালে আমাদের বাস্তব জগতের সঙ্গে রূপকথার যোগসূত্রটি ধরা পড়েছে। এর মধ্যে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-নৈতিক জীবন প্রতিফলিত হয়, না-মেটা আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাওয়া যায়। সব রূপকথায় সেই সেই সমাজের সমাজ-চিত্র প্রতিফলিত হবেই।— As a general with bearing some relation to human nature and experience something very much wider and deeper than the plain surface meaning of the story. *R W Dawkings. The meaning of Folktales. Folklore, LXII, 1951* page 418.

রূপক-প্রতীক প্রভৃতির জাল ছিন্ন করলে রূপকথার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সামাজিক-পারিবারিক অবস্থানের নিখুঁত ছবি।

রূপকথায় অনেক আদর্শ হৃদয়বান আত্মত্যাগী মানুষের চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। পশু-শক্তির বিরুদ্ধে, অশুভ কার্যাবলির বিরুদ্ধে এরা সংগ্রাম করে সমাজ ও ব্যক্তিমানুষকে রক্ষা করে, বিপন্নকে উদ্ধার করে। এইসব সনাতন গুণের পূজারি হল লোকসমাজ, তাই আদর্শ মানুষের চিত্র এঁকে তারা তৃপ্তি বোধ করে। এখানেও রয়েছে ইচ্ছাপূরণের তাগিদ।

রূপকথায় নিয়তি বা অদৃষ্টের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে লোকসমাজ যেমন অসংখ্য লৌকিক দেবতা-নির্ভর, তেমনি নিয়তি-নির্ভর। রূপকথার নিয়তি এমনই প্রবল যে তা কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কাহিনির মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

রূপকথা কোনো দেশ ও ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়। বিষয় পরিবর্তিত হয়ে যায় দেশে দেশে, উদ্দেশ্যও হয়তো ভিন্নতর, কিন্তু সামাজিক-পারিবারিক-ব্যক্তিগত চাহিদার মূলত কোনো তফাত নেই রূপকথায়। সেই কারণে, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের আলোকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে রূপকথার মধ্যে সামাজিক গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ধর্মচেতনার কিছু রূপের সন্ধানও পাওয়া যায়।

একটি বিস্ময়কর বিষয় রূপকথায় রয়েছে, যার সমাধান আজও নির্ণয় করা যায়নি। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। রাজপুত্র অনেক বাধা পেরিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করল, তারপরে বিয়ে করে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা পেল। তাহলে কি মাতৃতান্ত্রিক সমাজের চিত্র রয়েছে রূপকথায়? রাজপুত্র রাজকন্যার পিতার রাজ্যে রয়ে যায়। নিজের পিতার রাজ্যে ফিরে আসে না। রাজপুত্রের পিতার রাজ্য পাবে আর এক রাজপুত্র যে তার বোনকে বিয়ে করবে? এর উত্তর আজও মেলেনি।

৩. পরিকথা

যেসব লোককথা পরিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তাই পরিকথা। আবার বিক্ষিপ্তভাবে পরির উল্লেখ থাকলেই তা পরিকথা হয় না। যে পরি কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কাহিনিকে আবর্তিত করে, মুখ্য ভূমিকা পালন করে তাকেই নির্ভেজাল পরিকথা বলা যায়।

ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যেই সবচেয়ে বেশি পরিকথা রয়েছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের পরিকথাই খুব সমৃদ্ধ। আবার প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে অপ্সরা-যক্ষিণী-কিন্নরী চরিত্রের সন্ধান পাওয়া গেলেও তারা ঠিক পরি নয়। আফ্রিকা-উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-পলিনেশিয়া-মেলানেশিয়া-মাইক্রোনেশিয়ার আদিবাসীদের মধ্যেও পরি বা পরিকথা নেই। বাংলার লোকসাহিত্যে মধ্যযুগে ইসলামি সংস্কৃতির প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যের পরির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাও খুব ব্যাপক নয়।

পরিরা ভালো-মন্দ দুইই হয়। কিন্তু অধিকাংশ পরিই মঙ্গলকারী। ইউরোপে মন্দ পরির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। আফ্রিকার একটি লোককথায় এক অভিমানিনী পরির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উগান্ডার বাগান্ডা আদিবাসী পরিকথায় তার পরিচয় রয়েছে। এটি একটি ব্যতিক্রমী লোককথা।

পরিরা অপরূপ রূপবতী। তারা থাকে দূর আকাশে। মাঝেমধ্যে স্নান করতে নামে পৃথিবীর বুকে, সমুদ্রে কিংবা নদীতে। পোশাক খুলে স্নান করতে নামে। তখনই পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে।

পরিরা শুধু রূপবতী নয়, তারা সবসময় শ্বেতশুভ্র, পোশাকও তাই। এরা লজ্জাবতী, বিনয়ী, কম কথা বলে, মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলে, পৃথিবীতে নামে দলবদ্ধভাবে, সংযত আচরণ করে।

বাংলা লোকসাহিত্যে পরির উল্লেখ থাকলেও নির্ভেজাল পরিকথা নেই। তবে মোটিফ ইনডেক্‌স বিচার করে পরির কিছু হদিস মেলে— পরি, পরির দেশ, দ্বীপের মধ্যে পরিব রাজ্য, পরির জন্মকথা, পরিরানি, নৃত্যরতা পরি, স্নানরতা পরি, পরিরাজ্যে গমন।

৪. কিংবদন্তি

পাশ্চাত্য দেশে লেজেন্ড, আঞ্চলিক ঐতিহ্য বা লোকাল ট্র্যাডিশান, পপুলার অ্যান্টিকুইটিস নামের আঙ্গিককে বাংলায় বলা হয় কিংবদন্তি। একসময় আদিতে কিংবদন্তি ছিল— something to be read at religious service or at meals, usually a saint's or martyr's life. কিন্তু পরবর্তীকালে এর প্রয়োগ ব্যাপ্ত হয়।

কিংবদন্তিতে যেসব চরিত্র বা ঘটনা বলা হয়, লোকসমাজ মনে করে একদিন সেসব চরিত্র জীবন্ত ছিল, কিংবা সেসব ঘটনা ঘটেছিল। এবং সেসব

তাদেরই এলাকার নিজস্ব। তাই সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, কিংবদন্তির মধ্যে ক্ষীণভাবে হলেও ইতিহাসের সূত্র রয়েছে। অবশ্য মৌখিক ঐতিহ্যে প্রবাহিত হতে হতে ইতিহাসের আদি ঘটনার ওপরে অনেক কাল্পনিক প্রলেপ পড়ে যায়। ইতিহাসকে তখন আর খুঁজে পাওয়া সহজ হয় না।

যেমন ধরা যাক একজন বীর মানুষের জীবনকথা। এই মানুষটি লোকসমাজের আঞ্চলিক গণ্ডির মধ্যে পরোপকার-ত্যাগ-উদারতা-মানবিকতা-বুদ্ধি-শৌর্যে জীবিত অবস্থাতেই প্রায়-দেবতা হয়ে উঠেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁকে ঘিরে সম্ভব-অসম্ভব বাস্তব-কল্পনায় মিলেমিশে কাহিনি রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে। তারপরে বহু পুরুষ-পরম্পরায় পরবর্তী কালে যে কাহিনি আমরা শুনি, তাতে ইতিহাসের সূত্র অনুসন্ধান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তাই কিংবদন্তির মধ্যে সত্য ইতিহাসভিত্তিক আদি কাহিনি থাকতে পারে। অর্ধ ইতিহাস-ভিত্তিক কাহিনি, প্রেম-বিরহের গাথা, অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক কাহিনি, সন্ন্যাসী-পির-ফকির-দরবেশ-যাজক-পরি-ভূত-প্রেত কিংবা পুরনো দিঘি-বটগাছ-শ্মশান-কবরস্থান প্রভৃতি থাকতে পারে। কিংবদন্তির প্রেক্ষাপটে বিস্ময় ও কল্পনা সক্রিয় থাকে। কিংবদন্তি হল ইতিহাসের অপক্ব ফসল। কিংবদন্তির মধ্যে ইতিহাস অনুসন্ধান তাই প্রায় অসম্ভব কাজ।

ঐতিহাসিকেরা বলেছেন, কৃষ্ণ, হারকিউলিস, প্রমিথিউস প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এঁদের ঘিরে অসংখ্য কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেসব কিংবদন্তিতে এঁদের যে পরিচয় পাই তার মধ্যে ইতিহাসের সত্য আবিষ্কার করতে যাওয়া মূঢ়তা। শুধু এটুকু অনুভব করা যায়, সেইসব ব্যক্তিত্ব ছিলেন অসীম বলশালী, সাহসী ও মানবদরদি, দুষ্টের দমনে সদা ব্যগ্র।

প্রাথমিক অবস্থায় কিংবদন্তির মধ্যে ইতিহাসের বীজ থাকে কিন্তু পরবর্তীকালে পল্লবিত হতে হতে ইতিহাস প্রায় মুছে যায়, রয়ে যায় সম্ভব-অসম্ভবের এক অপরূপ কাহিনি।— And it may give what has been handed down as a memory — often fantastic or even absurd of some historical characters. *Stith Thompson : The Folktale University of California Press, 1977.* pages 8-9.

প্রাচীন সভ্যতার আমলে অনেক ইতিহাসবিদ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবার সময় প্রচলিত অনেক কিংবদন্তিকে সত্য ইতিহাস ভেবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সেসব ইতিহাসগ্রন্থও প্রায় কিংবদন্তির স্তরে পৌঁছে গিয়েছে।

কিংবদন্তির উদ্ভব বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। তবে একথা প্রমাণিত যে, পুরাকাহিনির পরবর্তী সময়ে তার সৃষ্টি। মানুষ তখন সামাজিক বিবর্তনের অনেক অগ্রসর পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুরাকাহিনির কল্পকথার অতিলৌকিক স্তরের পরে যখন বাস্তব কিছু ইতিহাসবোধ সমাজের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে তখনই এসব কিংবদন্তির জন্ম হয়।

ভারতবর্ষে রাজস্থানের রানা ও বীরাঙ্গনা, সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর শহিদ সিধো-কানু, মুন্ডা বিদ্রোহের অমর নায়ক বিরসা ভগবান, বাংলার রঘু ডাকাত, মৈমনসিংহ গীতিকা ও গোপীচন্দ্রের গানের নায়ক-নায়িকাকে ঘিরে কিংবদন্তির জন্ম হয়েছে। বাংলায় পিরদের নিয়েও অনেক কিংবদন্তি আছে। ধর্মগুরুর ভক্তেরাও জীবন্ত মানুষ গুরুকে নিয়েও কিংবদন্তি তৈরি করেন। পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় কিংবদন্তি রবিন হুডকে ঘিরে। ব্রিটেনের শেরউড জঙ্গলের এই ডাকাত তাঁর মহত্ত্বের কারণে বহু দেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

৫. লোকপুরাণ বা মিথকথা

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা যেসব দেশে পুষ্টিলাভ করেছিল সেসব দেশের লোকপুরাণ বা মিথ লোকসংস্কৃতির এক আশ্চর্য ভাণ্ডারের জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষ গ্রিস মিশর চিন রোম ব্যাবিলন সুমের আক্কাদ মেসোপটেমিয়া পলিনেশিয়া মেলানেশিয়া মাইক্রোনেশিয়া আফ্রিকা প্রভৃতির লোকপুরাণ আজও অগ্রসর দুনিয়ার বিস্ময়। পৃথিবীর প্রাচীনতম পাঁচটি মহাকাব্য গিলগামেশ রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ওডিসির উৎসও লোকপুরাণ।

লোকপুরাণের বিষয়বস্তুতে আন্তর্জাতিক মানসিকতার প্রকাশ রয়েছে। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য, দেবতা-মানুষের জন্ম, পশু ও প্রকৃতির জন্ম, আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের জন্ম, মহাপ্লাবন, দিন-রাত্রির উদ্ভব, দেবতা-দানব-মানবের দ্বন্দ্ব, জন্ম-মৃত্যু-আত্মা-পুনর্জন্ম-অবতার, আচার-সংস্কার-ধর্ম-সামাজিক রীতি-নীতির জন্ম, স্বর্গ-নরক-পাপ-পুণ্য— এসব বিষয়ই এসেছে লোকপুরাণে।

লোকপুরাণের মধ্যে মানবমনের রহস্যঘন রূপটির সন্ধান সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। যে জনগোষ্ঠী যত প্রাচীন ও পুরনো মূল্যবোধে অচল রয়েছে তাদের মধ্যে লোকপুরাণের সন্ধান তত বেশি পাওয়া যায়।

লোকপুরাণের সংজ্ঞা নানাভাবে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ব্রিটেনের ফোকলোর সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা প্রত্নতত্ত্ববিদ জর্জ লরেন্স গোম। তিনি বলেছেন, লোকপুরাণ হল 'দ্য সায়েন্স অব এ প্রিসায়েনটিফিক এজ।' সমাজের পরিবেশের চতুর্দিকে, আকাশে, মাটিতে যেসব প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটছে তার উত্তর খোঁজার তাগিদেই প্রথম সৃষ্টি বিষয়ক লোকপুরাণ গড়ে ওঠে। 'কেন'র উত্তর খোঁজার একটি স্থূল ও প্রাথমিক চেষ্টা থেকেই মানুষের মনে লোকপুরাণের উদ্ভব ঘটেছিল। তাই লোকপুরাণকে মানবজাতির শৈশবাবস্থার জিজ্ঞাসার প্রতিচ্ছবিরূপে গ্রহণ করা যায়।

লোকপুরাণের কাহিনিগুলির মধ্যে অসম্ভব অবাস্তব অতিলৌকিক কল্পনার আধিক্য রয়েছে। কিন্তু এসব কাহিনির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না করলে লোকসমাজের সামাজিক ইতিহাস লেখার কাজ অসম্পূর্ণ থাকবে।

লোকপুরাণের আবেদনে প্রত্যক্ষভাবে কিছু ধর্মীয় প্রভাব থাকে। যেখানে দেবদেবীর প্রসঙ্গ নেই, সেখানেও ধর্মভাবের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। একসময় এইসব কাহিনির সঙ্গে কোনো আচার-অনুষ্ঠান-পরব যুক্ত ছিল, পরবর্তীকালে রয়ে গেল শুধু কাহিনি। কিন্তু কাহিনি-বিবৃতির সময় 'পবিত্র মানসিকতার ভাবটি' অঙ্গাঙ্গিভাবে জুড়ে থাকে লোকপুরাণের দেহে। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াসমূহও যে লোকপুরাণের সঙ্গে একদা সম্পৃক্ত ছিল তারও বহু প্রমাণ রয়েছে। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াসমূহ কিংবা বিশেষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-পরব একদিন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল, সামাজিক মানুষ সেসবের প্রয়োজন হারিয়ে ফেলল, কিন্তু লোকপুরাণের কাহিনিগুলি স্মৃতিতে ধরা রইল।

স্মৃতিতে ধরা রয়েছে বলেই আধুনিক কালেও লোকসমাজে এত লোকপুরাণ শোনা যায়। Ceremonies often dies out while myths survive and thus we are left to infer the dead ceremony from the living myth. *J. G. Frazer: The Golden Bough, Ab. Ed. Macmillan, London, 1957.*

বাঙালি লোকসমাজে লৌকিক দেবদেবীকে ঘিরে অসংখ্য লোকপুরাণ গড়ে উঠেছে। আবার কথকের মাধ্যমে নিরক্ষর লোকসমাজ যেসব চিরায়ত পুরাণকাহিনি শুনেছে তাও বিকৃত আকারে নতুনরূপে প্রচলিত রয়েছে। যেমন, সংস্কৃত রামায়ণে রত্নাকরের বাল্মীকি হওয়ার কোনো কাহিনি নেই।

মরা শব্দ সংস্কৃত নয়, তাই সেই শব্দ উল্‌টে রাম হতে পারে না। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ-কথা কথকের মুখে শুনে শুনে রত্নাকরের লোকপুরাণ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়।

বাংলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসংখ্য সমৃদ্ধ লোকপুরাণ, বিশেষ করে সৃষ্টি বিষয়ক লোকপুরাণ রয়েছে।

ধর্মঠাকুর, সূর্যদেবতা, মনসা, শিব, গণেশ, শীতলা, ষষ্ঠী, অসংখ্য সিনি দেবী, বুড়ি নামের দেবী, বনবিবি, দক্ষিণরায়, সাতবউনি, কল্যাণেশ্বরী, চণ্ডী, সর্বমঙ্গলা প্রভৃতি লৌকিক ঐতিহ্যবাহিত দেবদেবীকে ঘিরেই প্রধানত বাংলার লোকপুরাণ গড়ে উঠেছে।

৬. নীতিকথা

মানবসমাজের বিবর্তনের ধারায় যখন গোষ্ঠীজীবন শুরু হল, একসঙ্গে বসতি করবার মানসিকতা গড়ে উঠল, গ্রামসমাজ স্থিতিশীল হল, তখন থেকে নীতিবোধের জন্ম। সামাজিক-পারিবারিক কিছু নীতি মেনে না চললে তো শৃঙ্খলা থাকে না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এসব নীতির কথা বলতেন। কিন্তু সেগুলি নিছকই উপদেশ-নির্দেশ-আদেশ।

কিন্তু নীতিকথার জন্ম অনেক পরে। সামাজিক বিবর্তন অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পরে লোকসমাজের অভিজ্ঞ মানুষ উপলব্ধি করলেন, শুধুমাত্র উপদেশ-নির্দেশ-আদেশ দিলেই সমাজে নীতিবোধ জন্মায় না। নীতিবোধ জন্মাবার জন্য কিছু দৃষ্টান্ত বড় জরুরি। এই মানসিকতা থেকেই নীতিকথার উৎসার। প্রাচীন প্রতিটি ধর্মের ধর্মগুরু গল্পের মাধ্যমেই এসব নীতিবাক্য শুনিয়েছেন। খ্রিস্টধর্মের প্যারাব্‌ল, মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নাবলির উত্তরে পিতামহ ভীষ্মের নীতিকথা, ইহুদি ধর্মের মোজেসের নীতিকথা এসবের জীবন্ত উদাহরণ। নীতিবোধ থেকে সরে এলে ব্যক্তি ও সমাজের যে সমূহ বিপদ একথাই তাঁরা বলতে চেয়েছেন।

কিন্তু সেই সমাজ নিছক উপদেশ দিতে চায়নি। শুকনো উপদেশ আর আদেশ সমার্থক বলে তাদের কাছে মনে হয়েছে। তাই সেই সমাজ এমন একটি আঙ্গিক বেছে নিল, যেখানে রয়েছে সরস গল্পের আকর্ষণ। নীতিকথার গল্পগুলোর সংক্ষিপ্ত বাঁধুনি এমন যে শ্রোতারা শোনামাত্রই নীতিকথার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে। কী উপদেশ তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না।

নীতিকথার প্রথম পর্যায়ে নীতিকথার শেষে নীতিবাক্য উচ্চারিত হত না। লোকসমাজের সেইসব গল্প যখন শিক্ষিতজন সংকলন করেন, তখন নীতিকথার শেষে উপদেশগুলি স্পষ্ট করে লিপিবদ্ধ করলেন। লোকসমাজের সম্পদ লিপিবদ্ধ হলেই এরকম প্রবণতা দেখা দেয়।

নীতিকথা শুধুমাত্র পশু-পাখিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে না। কিন্তু নীতিকথার পঁচানব্বই ভাগ গল্পের নায়ক-নায়িকা পশু-পাখি। এই নীতিকথার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— the term is synonymous with apologue and denotes a short narrative in prose or verse designed to convey a moral or useful lesson. The characters are most often animals, but inanimate objects, human beings or gods may also appear. *Encyclopaedia Britannica. 1970 Ed. Vol. 9.* page 22.

লোককথার বিভাগগুলির মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত কাহিনি হল নীতিকথা। আসলে মূল উদ্দেশ্য নীতির প্রচার, দ্বিতীয়ত দীর্ঘায়িত কাহিনি মনে রাখা কষ্টকর, তাই গল্পকথাকে অতি সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে।

পশুকথার মতো নীতিকথার কোনো পশু-পাখিই স্বভাবে পশু-পাখি নয়। মানবসমাজে মানুষের অনেক স্বভাব-বৈচিত্র্য রয়েছে অর্থাৎ নির্দয় দয়ালু নিন্দুক হিংসাপরায়ণ উদার ক্ষুদ্রচেতা নিষ্ঠুর সংকীর্ণমনা পরোপকারী হীনবুদ্ধি ঝগড়ুটে অন্যায়কারী অকারণ-অন্যায়কারী লোভী পেটুক দুষ্টুবুদ্ধি সাহসী ভীরু সদা-সন্ত্রস্ত কুঁড়ে বদমেজাজি কটুভাষী কৃপণ অপব্যয়ী মিতব্যয়ী ক্ষুদ্রবুদ্ধি অকারণ-অনিষ্টকারী দাম্ভিক প্রভৃতি দোষগুণে ভরা মানুষ। এদের এসব আচরণ বা গুণ-দোষ সমাজের উপকার করে, অনিষ্ট ডেকে আনে। এদেরই প্রকাশ ঘটেছে নীতিকথায়।

জাতক পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ প্রভৃতি পৃথিবীখ্যাত নীতিকথাগুলো লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকেই সংগৃহীত। সংকলিত হওয়ার বহু আগে থেকেই এসব লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। সংকলনে বাড়তি যুক্ত হয়েছে গল্পের শেষের উপদেশগুলি।

এইসব নীতিকথার আবেদন সুদূরপ্রসারী বলেই পৃথিবীর সব ধর্মের ধর্মগুরুগণ তাঁদের ধর্ম-প্রচারে মানুষকে নৈতিক পথের দিশা দিতে এইসব লৌকিক নীতিকথার আশ্রয় নিয়েছেন। মোজেস, জিশুখ্রিস্ট, হজরত মহম্মদ,

ভীষ্ম, বুদ্ধদেব, জৈনধর্মগুরু, উপনিষদকার থেকে শুরু করে উনিশ শতকের রামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত এই ঐতিহ্য বয়ে চলেছে। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় লৌকিক নীতিকথার লোকভিত্তিক জোর ও প্রভাব।

৭. গীতিকার অন্তর্ভুক্ত কাহিনি

লোকসংস্কৃতির অন্যতম জনপ্রিয় আঙ্গিক হল গীতিকা। যেসব জনগোষ্ঠী চিন্তার দিক থেকে অগ্রসর, সেইসব জনগোষ্ঠীতেই রয়েছে গীতিকা। গীতিকা সুর করে নাটকীয় ভঙ্গিতে গাওয়া হয়। একটি নিটোল আকর্ষণীয় গল্প থাকে গীতিকায়। এই কাহিনিই গীতিকার মূল আকর্ষণ। তাই লোককথা আলোচনায় গীতিকার অন্তর্ভুক্ত কাহিনিকেও ধরা হয়।

গীতিকার মধ্যে কাহিনি অংশে যে নাটকীয় মুহূর্ত, আর্তি, বিচ্ছেদ-বেদনা, ব্যর্থ প্রেম, নায়িকার আত্মহনন, দয়িত-দয়িতার মিলনের আকাঙ্ক্ষা, নরনারীর প্রেমে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, সমাজপতির নিষ্ঠুরতা, ভাগ্য-বিপর্যয়, তঞ্চকতা, জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা ও কান্না-যন্ত্রণা রূপ পায় তারই আকর্ষণে গীতিকা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও গীতিকা আখ্যানমূলক। এইসব আখ্যান সাধারণত আঞ্চলিক কিংবদন্তি কিংবা সত্য কাহিনিকে ঘিরে গড়ে ওঠে। আঞ্চলিক ভাবনা, ভাষা, রীতিনীতি, পরব, পারিবারিক-সামাজিক জীবন ও আঞ্চলিক লোকসাংস্কৃতিক পরম্পরা গীতিকার কাহিনিতে ধরা পড়ে।

গীতিকার গল্প নিটোল। গীতিকায় একটিই কাহিনি থাকে, কোনো শাখা-গল্প এর অবয়বকে স্ফীত করে না। একটি ধারাবাহিক কাহিনি থাকে বলেই শ্রোতার অন্যদিকে মন দেবার সুযোগ থাকে না, তাই কাহিনি দ্রুতবেগে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। কথক বা গীতিকা-গায়ক থাকেন আত্মনির্লিপ্ত আর ঘটনা যেহেতু সামাজিক বাস্তবধর্মী— তাই শ্রোতাকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা গীতিকার অসাধারণ। সেইসঙ্গে যুক্ত হয় সংগীতধর্মী নাটকীয়তা।

লোককথায় থাকে ইচ্ছাপূরণের তাগিদ। তাই লোককথার শেষে বিয়োগান্তক পরিণতি দেখা যায় না। দুষ্টের দমন হয় ঠিকই, শেষে শুভ শক্তিই বিজয়ী হয়। কিন্তু গীতিকার কাহিনির অধিকাংশই বিয়োগ-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় শেষ হয়। মিলনের পরিণতি খুব কম। এই ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির ভাবনার পরম্পরায় গীতিকা এক স্পর্ধিত ব্যতিক্রম।

গীতিকার কাহিনির মধ্যে ক্রিয়াশীলতা হল মুখ্য, নাটকীয় মুহূর্তগুলিতে যে ক্রিয়াশীলতা সক্রিয় থাকে তাতে গীতিকা কোনো অবস্থাতেই বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে হয় না। তাই পরিবেশের ওপর কোনো গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। অনাবশ্যক ঘটনা বা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা গীতিকায় থাকে না বলেই কাহিনি দ্রুত এগিয়ে চলে।

লোকসংস্কৃতি সামন্ত-সমাজের লৌকিক সৃষ্টি। লোকসংস্কৃতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী সংকুচিত। কিন্তু গীতিকার মধ্যে নারীর স্বাধীন প্রেমের বিষয়টিকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হয়েছে সামন্তসমাজ। তাই পৃথিবীর সব দেশে গীতিকায় রয়েছে নারী চরিত্রের প্রাধান্য। এই বিষয়টি গীতিকা আলোচনায় খুব প্রাসঙ্গিক।

৮. ব্রতকথা

বিশ্বের অসংখ্য লোকসমাজে ব্রত রয়েছে। গ্রামীণজীবনে নানাবিধ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে ব্রতের মাধ্যমে। কিন্তু কোথাও ব্রতকথা নেই, ব্রত ব্রততেই শেষ, ব্রতের শেষে কোনো কাহিনি বলা হয় না।

লোককথার এই বিভাগটি ভারতীয় ঐতিহ্যের নিজস্ব সৃষ্টি, বিশেষ করে বলতে গেলে বাঙালির একান্তই নিজস্ব সম্পদ। বাংলা ব্রতকথার অনুষঙ্গে যেসব আচার-অনুষ্ঠান-বিশ্বাস-কামনার উল্লেখ রয়েছে তার নিদর্শন পৃথিবীর বহু লোকসমাজ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যাবে, কিন্তু বাংলা ব্রতকথার মতো এমন কাহিনি আর কোথাও পাওয়া যায়নি। ব্রতকথা বাংলার নির্ভেজাল আন্তরিক সম্পদ। বাঙালির একান্ত আপন ঐহিক ধর্মবোধ থেকে ব্রতের আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম, আর সেসব ব্রতকে ঘিরেই সরস অথচ মরমি কাহিনির উদ্ভব ঘটেছে।

ব্রতকথার অপরূপ কাহিনির মধ্যে বাঙালি নারী পারত্রিক কল্যাণ চায়নি, অদেখা সুদূরের স্বর্গবাস আকাঙ্ক্ষা করেনি, নারী চেয়েছে অভাবহীন সংসার, স্বামী-পুত্রের অক্ষয় আয়ু, এয়োতির অক্ষয় সিঁথির সিঁদুর রেখা, গাঁয়ের মঙ্গল, গৃহপালিত পশু-পাখির মঙ্গল, প্রতিবেশীর মঙ্গল এবং সর্বোপরি 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'।

দুধরনের ব্রত রয়েছে, শাস্ত্রীয় ও মেয়েলি ব্রত। শাস্ত্রীয় ব্রতে আচমন, স্বস্তিবাচন, শান্তিমন্ত্র, পঞ্চগব্যশোধন প্রভৃতি পালিত হয়। কিন্তু বাংলার

গ্রামীণ ঘরে ঘরে শাস্ত্রীয় ব্রত কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, বেঁচে রয়েছে মেয়েলি ব্রত ও ব্রতকথা।

আমাদের আলোচনার বিষয় ব্রতকথা। ব্রতের কাহিনিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

কাহিনিতে দু ধরনের দেবতা রয়েছেন— শান্তশিষ্ট ভালোমানুষ দেবতা ও রুষ্ট দেবতা যিনি অবহেলা-উপেক্ষা সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু তাঁকে প্রসন্ন করতে পারলে তিনি মানুষের উপকার করেন। মানুষের দোষগুণের অবিকল প্রতিরূপ এইসব দেবতা। ব্রতকথার দেবতা ও মানুষ একীভূত হয়ে রয়েছে।

ব্রতকথায় নিয়তির স্থান খুব ব্যাপ্ত। কাকে যে দেবতা অশেষ কৃপা করবেন তা পূর্বনির্ধারিত নয়— তাই নিয়তিনির্ভর।

বাংলা রূপকথা ও পশুকথার কাহিনি প্রায় অবিকৃতভাবে ব্রতকথায় স্থান করে নিয়েছে। শুধু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাগতিক কামনা-বাসনা।

বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যেহেতু ব্রতকথা গড়ে ওঠে তাই ব্রতকথার সব চরিত্রই একঘেয়ে, প্রায় বৈচিত্র্যহীন। গল্প তো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ইহজাগতিক চাওয়া-পাওয়া। এই কারণেই কাহিনির মধ্যে সমাজচিত্র, সমাজমন, পারিবারিক-সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থূল রূপকে অনুভব করা যায়।

আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই সন্দেহ জাগে, সমাজ থেকে ব্রতের আচার-অনুষ্ঠান উঠে গেলে এই ব্রতকথাগুলিও হারিয়ে যাবে। প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত বলেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে লোকসমাজ আর তাদের স্মৃতিতে ব্রতকথা ধরে রাখতে চাইবে না। সাম্প্রতিক কালে গ্রামসমাজের পরিবর্তন ঘটছে খুব তাড়াতাড়ি, পরিবর্তন অভিপ্রেত, গ্রামীণ জীবনে নাগরিক সুখ-সুবিধা প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই দেখা যাচ্ছে, ব্রত আর তেমন পালিত হয় না, ব্রতকথাও শোনা যায় না। আক্ষেপ করে লাভ নেই, সমাজবিকাশের ধারায় এই প্রক্রিয়াই স্বাভাবিক।

লোককথার মাইগ্রেশান

আধুনিক বিশ্বে অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়া থেকে লোককথার এই বিষয়টি সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী, তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক ও লোকসংস্কৃতির সংগ্রাহকদের ব্যাপকভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোককথা সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, এমন সব লোককথা পাওয়া যাচ্ছে যেগুলির মধ্যে আশ্চর্য মিল। ভারতবর্ষের একটি পশুকথা তিব্বত জর্জিয়া গ্রিস ইতালি ও স্পেনে একই আকারে পাওয়া যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, কোনো একটি দেশ থেকেই লোকমুখে লোককথাটি অন্য দেশে ছড়িয়েছে। তা না হলে, এই সাদৃশ্য কীভাবে সম্ভব?

এই সহজ ও স্বাভাবিক বিশ্বাস থেকেই লোককথার দেশে দেশে পরিভ্রমণের তত্ত্ব গড়ে ওঠে। কোনো কোনো প্রাজ্ঞ গবেষক পরিভ্রমণের ভৌগোলিক মানচিত্রও ব্যাখ্যা করেন। এভাবেই তত্ত্বটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিশেষ করে থিওডর বেনফে প্রমাণ করেন যে, লোককথার আদি উৎসভূমি ভারতবর্ষ এবং সেখান থেকেই দশম শতাব্দীর পর থেকে লোককথা ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন এই মতটি গ্রাহ্য ছিল।

আবার বিরোধিতাও যে হয়নি তা নয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে অনেকে আফ্রিকা মহাদেশের নামও যুক্ত করেন।

কিন্তু একটি লোককথা সংগ্রহের পরে এই তত্ত্ব প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হল। আফ্রিকার একটি রূপকথার সঙ্গে ইউরোপের একটি রূপকথার সাদৃশ্য সব চিন্তাকে এলোমেলো করে দিল। ইতিহাসের কোনো সূত্রেই দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগের কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি।

ইউরোপের রূপকথাটি হল 'স্নো হোয়াইট অ্যান্ড দ্য সেভেন ডোয়ার্ফস্', আর আফ্রিকার রূপকথা হল 'জাদু আয়না ও সুন্দরী মেয়ে'। ইউরোপের এই রূপকথা আমাদের দেশেও খুবই পরিচিত এবং হলিউডের ওয়াল্ট ডিজনির কার্টুন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে খুবই জনপ্রিয়।

আফ্রিকার এই রূপকথা আবিষ্কারের একটি ইতিহাস রয়েছে। কংগোর এক গ্রাম থেকে সংগৃহীত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ফরাসি ও পোর্তুগিজ হানাদারেরা কংগো দেশে উপস্থিত হয়। কিন্তু পাকাপাকি শতকের শেষে দখল নেয়। সেও মোটামুটি সমুদ্রকূলের কাছাকাছি এলাকায়। দূর গ্রামীণ এলাকায় আধিপত্য তখনও ঘটেনি।

পার্থক্য যে একেবারে নেই তা নয়। ইউরোপের রূপকথায় রয়েছে সাত বেঁটে মানুষ, আফ্রিকায় রয়েছে সাত ডাকাত। স্নো হোয়াইটের দেহ বরফের মতো সাদা আর গালদুটি রক্তরাঙা। আফ্রিকার মেয়ের দেহের এই রং হতে পারে না, তার দেহের রং কালো। বেঁটে সাতজন সন্ধেবেলা আলো জ্বেলে স্নো হোয়াইটকে দেখেছে, আর সুন্দরী কালো মেয়ে রান্নাবান্না করে কয়েকদিন লুকোচুরি খেলেছে। স্নো হোয়াইট বিষাক্ত আপেল খেয়ে মারা গিয়েছিল, প্রথম বারে বিষাক্ত চিরুনি মাথায় ফুটেছিল, কিন্তু বেঁটেরা বাঁচিয়েছিল। আর সুন্দরী মেয়ের মাথায় ফুটেছিল তীক্ষ্ণ কাঁটা।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে দূর গ্রাম থেকে একজন খ্রিস্টীয় মিশনারি প্রথম রূপকথাটি সংগ্রহ করেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য তখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুরোহিতের নাম রেভারেন্ড রবার্ট হামিল নাসাউ। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে।

এই সংগ্রহের আড়াইশো বছর আগে একজন পোর্তুগিজ ভাড়াটে সৈনিক জাহাজ-ডুবি থেকে রক্ষা পেয়ে কংগো উপকূলে আসে। বহুকাল সেই সৈনিক এক গাঁয়ে থেকে যেতে বাধ্য হয়। সে স্থানীয় ম্‌পোংগোয়ে ভাষা শিখেছিল।

তেমন ভালো করে নয়। বহুকাল পরে কীভাবে সে স্বদেশে ফিরে আসে। পোর্তুগিজ ভাষায় সে এই রূপকথাটি কাগজে লিখে রেখেছিল। সে স্নো হোয়াইটের গল্প বোধহয় জানত না। কেননা, তার লেখায় কোনো উল্লেখ নেই। বহুকাল পরে তার লেখা গল্পটি তার পরিবার থেকে পাওয়া যায়। প্রকাশিতও নয়। কিন্তু তেমন প্রচার হয়নি। ভাষান্তরিতও হয়নি।

১৯০০ সালে পোর্তুগিজ পুরোহিত যখন এই রূপকথা সংগ্রহ করেন, সেই গ্রামে আগে কোনো ইউরোপীয় মানুষ আসেননি। অন্যভাবে সেই কালে আফ্রিকার কোনো লোককথা ইউরোপে প্রচারিত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছে, কিংবা ইউরোপের কোনো রূপকথা আফ্রিকায় প্রচারিত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছে, কিংবা ইউরোপের কোনো রূপকথা আফ্রিকার মানুষ শুনেছে এরকম কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি।

'জাদু আয়না ও সুন্দরী মেয়ে' রূপকথাটি জানা দরকার, তাহলেই লোককথার মাইগ্রেশান তত্ত্বের ভ্রান্তিমূলক বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সবুজ ঘন বনভূমি আর গান-গাওয়া নদীর পাশে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের রাজার ছিল একটিমাত্র মেয়ে। সে ছিল খুব সুন্দরী। তার আলো-করা রূপে মানুষ পশু-পাখি সবাই অবাক হয়ে যেত। এমন রূপ তারা আগে কোনোদিন দেখেনি।

মেয়ে কিশোরী হল। একদিন তার বিয়ে হল। বিয়ে হল ভিন গাঁয়ে। তার ছিল একটা জাদু আয়না, এই আয়না কথা বলতে পারত। ঠিক মানুষের মতো। যখনই সে সাজগোজ করত, শুধু এই আয়নাতেই মুখ দেখত। আর বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় কিংবা নাচের আসরে যাওয়ার আগে এ আয়না না হলে তো তার সাজগোজই হত না। বড় প্রিয় আয়না।

একটা ঘরে সে এই আয়নাকে রেখে দিত। কাউকে ঢুকতে দিত না সেই ঘরে। এমন কি আপনজনদেরও না। সেই ঘরে একা একা সে আয়নাকে জিজ্ঞেস করত, ও আমার প্রাণের আয়না, ও আমার আদরের আয়না, বল তো, এই দুনিয়ায় আমার চেয়ে সুন্দরী আর কেউ আছে কি না! আয়না সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিত, কেউ না কেউ না। কেউ নেই কেউ নেই।

যখনই সে সাজগোজ করত, তখন একই প্রশ্ন করত। একই উত্তর পেত। রোজ রোজ একই প্রশ্ন, একই উত্তর। শুনে শুনে তার বিশ্বাস হল— তার মতো সুন্দরী দুনিয়ায় আর কেউ নেই। নিজের রূপের গর্বে সে হয়ে উঠল

ভীষণ হিংসুটে। দেমাকে যেন মাটিতে তার পা পড়ে না। আর হবেই বা না কেন? আয়না যে সে কথাই বলে। আর এ আয়না যে জাদু আয়না।

দিন কাটে। অনেক দিন কেটে গেল। এমন সময় সেই সুন্দরী মেয়ে একদিন মা হল। তার একটা ফুটফুটে মেয়ে হল। কচি শিশুর রূপ দেখে মা চমকে উঠল। মেয়ের এ কী রূপ? এ যে তার থেকেও সুন্দরী! মায়ের মাথাটা কেমন টলমল করছে।

শিশু মেয়ে বড় হচ্ছে। পুকুরের ফুল যত ফোটে, দেখতে হয় তত সুন্দর! এ মেয়ে যত বড় হচ্ছে রূপও যেন ফেটে পড়ল। এ কী রূপের বাহার! মা বুঝল, রূপে এ মেয়ে তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তার ওপরে মেয়ের মিষ্টি কথা। দুয়ে মিলে অপরূপ। কিন্তু মেয়ে তার রূপ জানে না, তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই, গর্বও নেই। তাকে তাই আরও মিষ্টি লাগে।

মেয়ের বয়স হল বারো বছর। মা ভয় পেয়ে যাচ্ছে, এই বুঝি তার মেয়ে জেনে ফেলে সে কত সুন্দরী! মেয়ে যদি জেনে ফেলে?

একদিন মেয়েকে ডেকে মা বলল, ওই ঘরে তুমি কখনও ঢুকবে না। কেউ ঢোকে না। তুমিও ঢুকবে না। মনে রাখবে আমার কথাটা। মেয়ে মাথা নাড়ল।

এমনি করে আবার দিন বয়ে যায়। মা রোজ রোজ একই প্রশ্ন করে, জাদু আয়না একই উত্তর দেয়। উত্তর শুনে শান্তি পায় মা।

একদিন মেয়ের খুব কৌতূহল হল। তাকে সবাই ভালোবাসে, সে সব ঘরে যায়, ঘোরে। শুধু ওই ঘর বাদে। কেন? ও ঘরে কী আছে? সে গেলে কী হবে? সে কেন যেতে পারবে না? সে তো কোনো খারাপ কাজ করে না কখনও। তবে? এ নিষেধ তার ভালো লাগে না। কৌতূহল বাড়ে।

মা গিয়েছে নাচের আসরে। বাড়িতে সে একা। সে চাবি নিয়ে সেই ঘরের কাছে গেল। খুলে ফেলল দরজা। ঘরে ঢুকেই তার খুব আনন্দ হল। কেন এতদিন বাধা দিয়েছে তাকে? কিন্তু ঘরে বিশেষ কিছুই দেখতে পেল না। এমন কিছু নেই যাতে নিষেধ মানতে হবে। সে চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে গেল।

পরের দিন। মা বেড়াতে গিয়েছে। মেয়ে মনে মনে ভাবল, আচ্ছা, ওই ঘরে যদি কিছু নাই থাকবে তাহলে মা কেন নিষেধ করল? কেন আমায় ঘরে ঢুকতে বারণ করল? নিশ্চয়ই কিছু আছে। এই ভেবে সে আবার ঘরে ঢুকল।

চারদিকে তাকাতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল, একপাশে একটা কাঠের ঝুড়ি রয়েছে। ঝুড়িতে কী সুন্দর লতাপাতা নকশা করা। ঢাকনা খুলেই সে একটা আয়না দেখতে পেল। হাতে তুলে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে সে আয়না দেখছে। হঠাৎ আয়না মানুষের মতো কথা বলে উঠল। বলল, ও মেয়ে! তোমার মতো সুন্দরী তো এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই। মেয়ে তাড়াতাড়ি আয়নাকে ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিল। দরজা ঠিকমতো বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে গেল।

পরের দিন মা আয়না হাতে সাজগোজ করতে বসেছে। অন্য দিনের মতো মা জিজ্ঞেস করল, ও আমার প্রাণের আয়না, ও আমার আদরের আয়না, বল তো, এই দুনিয়ায় আমার চেয়ে সুন্দরী আর কেউ আছে কিনা। জাদু আয়না উত্তর দিল, হ্যাঁ তোমার চেয়েও একজন সুন্দরী আছে। সে অনেক বেশি রূপসী।

ঝড়ের বেগে মা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খুব ব্যথা মনে, মুখ শুকনো। সন্দেহ হল, এ ঠিক মেয়ের কাজ। ওই সুন্দরী নিশ্চয়ই তার মেয়ে। রাগে কপাল দপ্‌দপ্‌ করছে। মেয়ের কাছে গিয়েই ফেটে পড়ল মা, তুই ঘরে ঢুকেছিলি?

মেয়ের তো বুক কাঁপছে। বলল, কই না তো! আমি কখন ঢুকলাম?

মা বলল, মিথ্যে কথা। তুই ঢুকেছিলি। হ্যাঁ তুই, জাদু আয়না নইলে বলল কী করে আমার চেয়েও সুন্দরী আর একজন আছে। আর তুই-ই শুধু আমার চেয়ে সুন্দরী। আর কেউ নেই। তুই ঢুকিসনি ঘরে?

মা শুধু যে মেয়েকে ওই ঘরেই ঢুকতে দেয়নি তা নয়, এত বয়স পর্যন্ত কোনোদিন তাকে প্রাসাদের বাইরে যেতে দেয়নি। বাইরের কোনো লোক মেয়েকে চেনে না, জানে না, দেখেওনি। কেউ যদি মেয়েকে দেখে বলে, মায়ের চেয়েও সুন্দরী! তাহলে! মা রাগে-দুঃখে দিশেহারা হয়ে গেল।

রাতে স্বামীর কয়েকজন বিখ্যাত বিশ্বাসী সৈন্যকে ডেকে পাঠাল মা। তাদের কাছে মেয়ে দিয়ে মা বলল, এই হতভাগীকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। কেউ যেন না জানে।

সৈন্যরা আর কী করবে। তারা মেয়েকে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে এল। সঙ্গে দুটো কুকুর। আঁধার রাতে কষ্টে তারা পথ চলতে লাগল। শেষকালে পৌঁছল গভীর জঙ্গলে। মেয়ে একটি কথাও বলছে না। সৈন্যরা বলল,

কেউ না জানলেও আমরা প্রাসাদ প্রহরীরা জানি তুমি কার মেয়ে। তোমার মা বড় নির্দয়, সে তোমাকে মেরে ফেলতে বলেছে। সে কাজ আমরা কেমন করে করি? তুমি এত ভালো মেয়ে, তুমি এত রূপসী, তোমার কথা এত সুন্দর। আমরা তোমাকে মারতে পারি না। তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াও। বনের দেবতা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি ভালো থেকো।

সৈন্যদের চোখের পাতা ভিজে এল। মেয়ে বনের পথে হাঁটতে লাগল। বন থেকে বেরুবার আগে সৈন্যরা সঙ্গের কুকুর দুটোকে মেরে ফেলল। তাদের তরবারিতে টাটকা রক্ত লেগে রইল। তারা ফিরে এল প্রাসাদে। মাকে বলল, আমরা হতভাগী মেয়েটাকে মেরে ফেলেছি। তার দেহের রক্ত লেগে রয়েছে আমাদের অস্ত্রে। মা বেজায় খুশি। লাফিয়ে লাফিয়ে সে চলতে লাগল।

মেয়ে গভীর বনের কিছুই চেনে না। আপন মনে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। বড় একা লাগছে, ভয়ও করছে। গা ছম্‌ছম্‌ করছে। এমন সময় সে একটা সুন্দর ছোট বাড়ি দেখতে পেল। একটাই বাড়ি, আশেপাশে আর নেই। সে দরজার সামনে গেল, দরজায় তালা নেই, ভেজানো রয়েছে। সে ভেতরে ঢুকল, কাউকে দেখতে পেল না। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে ঘরটা বড় অগোছালো রয়েছে। কী আর করে। সে ঘর গোছাতে লাগল, সব জিনিস পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। তারপরে একটা খাটের নীচে চুপটি করে লুকিয়ে থাকল।

মেয়ে তো জানত না এই বাড়ি আসলে একদল ডাকাতের। ডাকাতেরা দিনের বেলায় নানা দূর দূর জায়গায় ডাকাতি করতে যেত, আর সন্ধেবেলা ফিরে আসত এই ডেরায়। সেদিনও লুটের মালপত্র নিয়ে ডাকাতরা ফিরে এল। ঘরে ঢুকেই সবাই অবাক হয়ে গেল। একী ? সবকিছু এমন সাজানো-গোছানো কেমন করে হল? এরকম তো থাকে না? তারা অবাক হয়ে বলল, কে ঢুকেছিল আমাদের ঘরে? কে-ই বা এমন করে সব গুছিয়ে রাখল?

বড় ক্লান্ত তারা। রান্নাবান্না করে খেয়ে-দেয়ে তারা শুতে গেল। আর ঘুমিয়ে পড়ল। যেখানে তারা খেয়েছিল সে জায়গা তেমনই রইল, পরিষ্কার করল না। সকাল হতেই তারা বেরিয়ে পড়ল ডাকাতি করতে। এই তো তাদের নিত্য দিনের কাজ।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখনও তেমন অন্ধকার হয়নি। বাইরের উঠোনে দুজন গল্প করছে। এমন সময় ডাকাতরা ফিরে এল। আজ তারা বেশ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। বাড়িতে কী হল জানার জন্য সবাই ব্যস্ত। দেখে, দুজনে বসে আপনমনে গল্প করছে।

কাছে এসে তারা বলল, তাহলে খুঁজে পেয়েছ?

ডাকাতটি মাথা নেড়ে শুধু বলল, হ্যাঁ।

ডাকাতরা বলল, আঃ কী সুন্দর মেয়ে। আমাদের আদরের বোন। কোনো ভয় নেই তোমার। আমরা প্রাণ দিয়ে তোমাকে আগলে রাখব। আজ থেকে তুমি আমাদের বোন হলে। আদরের বোন।

ঘরে এসে তারা বোনকে সবকিছু বুঝিয়ে দিল। সব জিনিসের ভার দিল তার ওপরে। সব কিছু সেই দেখাশোনা করবে। এমন বিশ্বাসী আর কে আছে? তাদের বোন যে এই মেয়ে। তারা ডাকাতি করে সব এনে দেয় বোনকে। বোন তাদের দেখাশোনা করে। এমনি করে সুখে দিন কেটে যেতে লাগল।

প্রাসাদে মা দিন কাটায়। বেশ আনন্দে-ফুর্তিতে। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার কেন যেন সন্দেহ হল, মনটা কেমন করে উঠল। যদি মেয়ে বেঁচে থাকে। সৈন্যরা কি সত্যিই তাকে মেরে ফেলেছে? যদি না মেরে থাকে? তবে? তার কথা হয়তো সৈন্যরা রাখেনি। তাহলে? মেয়ে তবে বেঁচে আছে? সন্দেহ হল কেন? মন এমন করছে কেন?। তাহলে নিশ্চয়ই মেয়ে মরেনি, ঠিক বেঁচে আছে। কী করবে মা তা ভেবে নিল।

মায়ের এক দাসী ছিল। সে খুব বিশ্বাসী। সেই ছেলেবেলা থেকে তার কাছে আছে। এখন সে বুড়ি। কিন্তু তাকে না হলে মায়ের চলে না। নিজের ঘরে ডেকে এনে মা সেদিন তাকে সব খুলে বলল। সন্দেহের কথা জানাল। এখন কী করতে হবে তাও মা বলে দিল।

মা চুপচুপ করে বলল, বুড়িমা, তুমি এক কাজ করো। তুমিই পারবে। নানা গাঁয়ে তুমি খোঁজ করো। যেখানে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে তুমি দেখবে, বুঝবে সেই আমার মেয়ে। তারপরে যেমন করে হোক তাকে তুমি মেরে ফেলবে। আমার জন্য এ কাজ তোমাকে করতেই হবে।

বুড়ি বলল, ওমা, তুমি বলছ আর এ কাজ আমি করব না? দেখ না আমি ফিরে এলাম বলে। এই কথা বলে বুড়ি রওনা দিল।

ঘুরতে ঘুরতে বুড়ি এল ডাকাতদের বাড়িতে। কাউকে সে দেখতে পেল না। ঘরে ঢুকল। ঢুকেই দেখে অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ঘরের কাজ করছে। দেখেই বুঝতে পারল— এ মেয়ে কে! এই মেয়েকেই তো সে খুঁজছে। যাক, তাহলে সব কাজই ঠিকঠাক করা যাবে। বুড়িকে দেখেই মেয়ের খুব আনন্দ হল। তাকে আদর করে বসতে দিল। খেতে দিল।

বুড়ি তখন বলল, মেয়ে, কি সুন্দরী তুমি! এমন রূপ আগে দেখিনি। তা তুমি কে? তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার মায়ের নাম কী? মেয়ে কিছুই সন্দেহ করল না। সব খুলে বলল, বুড়ি ঠোঁটের ফাঁকে হাসতে লাগল।

বুড়ি বলল, আহা, তোমাকে দেখাশোনার কেউ নেই। এমন রূপ, অথচ চুলগুলো কী এলোমেলো। দাও, ভালোভাবে চুল বেঁধে দি। কাছে এসো। মেয়ে রাজি হল। কেউ তো কোনোদিন এমন করে আদর করেনি। পেছন ফিরে সে বুড়ির সামনে বসে পড়ল। বুড়ি আদর করে তার চুল আঁচড়িয়ে বেঁধে দিতে লাগল। বুড়ি তার পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল একটা লম্বা ধারালো কাঁটা। চুল বাঁধা শেষ হয়ে এসেছে, বুড়ি হঠাৎ মেয়ের ঘন চুলের মধ্যে কাঁটা ঢুকিয়ে দিল। ধারালো কাঁটা মাথায় ঢুকে গেল। ঢলে পড়ল মেয়ে। নিথর হয়ে গেল তার দেহ। মনে হল সে সত্যি মরে গিয়েছে। নিস্তেজ দেহটার দিকে তাকিয়ে বুড়ি হাসতে হাসতে বলল, যাক। ঠিকঠাক কাজ হয়েছে, কথা রেখেছি। দেহ সেখানেই পড়ে রইল, বুড়ি রওনা দিল বাড়ির পথে। বুড়ির কাছে সব কথা শুনে মা নিশ্চিন্ত হল। বুড়িমা তো আর তাকে ঠকাবে না। যাক আপদ বিদায় হল।

ডাকাতরা ফিরে এসে দেখে তাদের আদরের বোন কাটা গাছের মতো পড়ে রয়েছে। তাদের চোখ ছলছল করে উঠল। এ কী হল? কেন এমন হল? তারা খুব যত্নে দেহটি পরীক্ষা করল, কোনো আঘাতের চিহ্নই দেখতে পেল না। বোন মরে গিয়েছে, কিন্তু দেহ তো এখনও শক্ত কাঠ হয়ে যায়নি। কেমন যেন নিস্তেজ ভাব। বোনের কপালে আর গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখটা ফুলের মতো তাজা আর সুন্দর। তারা বলল, আমরা এমন সুন্দর মুখের বোনকে মাটিতে পুঁততে পারব না। কিছুতেই না। তাই তারা সকলে মিলে একটা সুন্দর শবাধার তৈরি করল। শবাধারের ওপরে সোনা-হিরে-মুক্তো দিয়ে সাজাল আর তাদের যত সোনার গয়না ছিল সব পরিয়ে দিল আদরের বোনের দেহে। শবাধারের ঢাকনা কাঁটা দিয়ে আটকাল না, আলগোছে

ঢাকনা বন্ধ করল। আর হাওয়া-বাতাস ঢোকবার জন্য কয়েকটা ফুটো রাখল। বোনের দেহ যাতে পচে না যায় তাই শবাধার বাইরে আলো হাওয়ায় রেখে দিল। বুনো জন্তুরা যাতে বোনকে স্পর্শ না করতে না পারে তাই বুনো লতার সঙ্গে বেঁধে তাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। লতাটা ঢিলে করলেই শবাধার নেমে আসবে। সব কাজ শেষ করে তারা চুপ করে গাছের নীচে বসে রইল। গাল-বুক ভিজে যাচ্ছে, আজ তাদের বোন আর বেঁচে নেই। দিন দশেক তারা বাড়িতেই রইল, কাজে গেল না।

তারপরে কাজে যেতে হল। প্রতিদিন যাওয়ার সময় ও বাড়ি ফিরবার পরে তারা শবাধারটাকে নামাত আর বোনকে দেখত। সদ্য-ফোটা ফুলের মতো সতেজ রয়েছে তাদের বোনের মুখ। জীবন্ত মুখ। ঘুমিয়ে রয়েছে আদরের বোন। এমনি করে দিন কাটে।

এখন হয়েছে কী, একদিন ডাকাতরা সকালে কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। এমন সময় সেখানে এল একজন লোক। সে গাঁয়ের কথক। নানা জায়গায় সে গল্প শুনিয়ে বেড়ায়। তার ঝুলিতে অনেক অনেক গল্প। তার নাম এসেরেন্‌গিলা। আর তার মনিবের নাম ওগুলা। ডাকাতদের ডেরায় এসে কথক কাউকে দেখতে পেল না। এধার-ওধার তাকাতেই তার চোখে পড়ল সোনালি শবাধারটি। এমন সুন্দর 'আধার সে আগে দেখেনি। কত জায়গায় সে ঘুরে বেড়ায়। এসেরেন্‌গিলা ছুটে গেল মনিবের কাছে। বলল, এক্ষুনি চলো আমার সঙ্গে। এমন জিনিস আগে দেখিনি। কেউ নেই সেখানে। ওটাকে নিয়ে আসতেই হবে। কথক উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে। ওগুলাও অবাক হল।

দুজনে সেখানে গেল। লতা ঢিলে করে কথক শবাধারটি নামাল। কেউ নেই, তবু এসে পড়ে যদি। তাড়াতাড়ি করে দুজনে মাথায় তুলে শবাধার নিয়ে চলল। তারা জানেও না ভেতরে কী রয়েছে। শেষকালে ওগুলার বাড়ি পৌঁছে গেল। একটা ছোট ঘরে শবাধারটিকে রেখে দিল।

কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন ওগুলা ভাবল, আজ দেখব ওর মধ্যে কী আছে। ঢাকনা তো কাঁটা দিয়ে আটকানো ছিল না, আলগা করে বন্ধ ছিল। ঢাকনা খুলতেই ওগুলা অবাক হয়ে গেল। একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছে সে বেঁচে নেই। কিন্তু মৃতদেহের গা থেকে যেরকম গন্ধ বের হয় তা তো হচ্ছে না। কোনো রোগে মারা গিয়েছে বলেও তো মনে হচ্ছে

না। তবে? সে ভালোভাবে মেয়ের দেহ পরীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কিছুই পেল না। কিছুই বুঝতে পারল না। শুধু আপনমনে বলল, এমন ফুটফুটে মেয়ে। কীসে তার মৃত্যু হল? আশ্চর্য।

ওগুলা ঢাকনা বন্ধ করল। ভালোভাবে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু থাকতে পারল না। আবার ঘরে ঢুকল। আবার ঢাকনা খুলে দেখল। মনে মনে বলল, বোধহয় এ মরেনি। আহা। যদি বেঁচে থাকে। আমার মেয়েরও তো এইরকমই বয়েস। আহা। বেঁচে থাকলে দুজনে কেমন ভাব হত, একসঙ্গে খেলত। দরজা বন্ধ করে আবার সে বাইরে এল। নিজের মেয়েকে বলল, ও ঘরে যেয়ো না কিন্তু। কক্ষনো যেয়ো না। মেয়ে বলল, আচ্ছা। প্রতিদিন বহুবার করে ওগুলা ঘরে যায় ঢাকনা খোলে, মৃত মেয়েকে দেখে।

অনেক দিন কেটে গেল। ওগুলার মেয়ের কেমন কৌতূহল হয়। তাকে ঢুকতে দেয় না, অথচ, বাবা বারবার ঢোকে। তারও ইচ্ছে হয়, দেখি না কী আছে ও ঘরে। একদিন ওগুলা বাইরে গিয়েছে। মেয়ে বলল, খালি খালি বারণ করা। কেন ও ঘরে ঢুকব না? ঢুকলে কী হয়? আজ দেখব ও ঘরে কী আছে। ঘরে ঢুকেই ওগুলার মেয়ে অবাক হয়ে গেল, কী সুন্দর একটা কাঠের আধার। দেখি না ভেতরে কী আছে। কী হয় দেখলে?

ওগুলার মেয়ে আস্তে আস্তে ঢাকনা তুলে ধরল। একটি মেয়ের মাথা দেখা যাচ্ছে, মাথায় ভর্তি কালো চুল আর সোনার গয়না। পুরো ঢাকনাটি খুলে ফেলল। একটি সুন্দর মেয়ে শুয়ে রয়েছে। তারই বয়সি কী সুন্দর মেয়ে। এত গয়না গায়ে। কী সুন্দর মুখ আর মাথার চুল। সে বুঝতে পারল না, মেয়েটি কেন এর মধ্যে এভাবে ঘুমিয়ে আছে। আপনমনে বলল, আহা! ও যদি কথা বলত। কেমন বন্ধু হতাম আমরা। কত গল্প করতাম। ও যদি কথা বলত। মুখের কাছে মুখ এনে সে ডাকল, এম্‌বোলো! এম্‌বোলে! যেমন করে অপরিচিত কাউকে তারা ডাকে। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আবার ডাকল। জলভরা চোখে বলল, এমন করে ডাকছি, তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন? এম্‌বোলো। এম্‌বোলো। ঢাকনা বন্ধ করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ওগুলা ফিরে এল। এমন করে দরজা বন্ধ কেন? মেয়েকে বলল, তুমি কি ওই ঘরে ঢুকেছিলে? মেয়ে বলল, না তো। তুমি তো আমায় ঢুকতে দাও না। আমি তো যাইনি।

পরের দিন ওগুলা কাজে বেরিয়ে গেল। মেয়েও ঢুকল ওই ঘরে। না ঢুকে থাকতে পারছে না। ঘরে ঢুকে ঢাকনা খুলে ফেলল। ডাকল, এম্‌বোলো, এম্‌বোলো! কোনো সাড়া নেই। মেয়ে ঘুমিয়েই আছে। 'আমি তোমাকে বার বার ডাকছি। তুমি কেন সাড়া দিচ্ছ না। তোমার সাথে খেলতে ইচ্ছে করছে। তোমার চুলগুলো ঠিক করে দেব? মাথায় আদর করব? তোমার চুলের উকুন বেছে দেব? তবু সাড়া নেই। ওগুলার মেয়ে ঘুমিয়ে-থাকা মেয়ের মাথায় হাত দিল। আঙুল ঢুকিয়ে দিল ঘন চুলের মধ্যে। কী যেন শক্ত মতো হাতে ঠেকল? কোনো গয়না বুঝি? চুল ফাঁক করে মেয়ে দেখল একটা লম্বা ধারালো কাঁটা মাথায় ফোটানো রয়েছে। ইস ওর মাথায় কাঁটা বেঁধা? আমি ওটাকে তুলতে চেষ্টা করি। আহা! ওর যেন না লাগে। কাঁটাটা টেনে বের করতেই ঘুমন্ত মেয়ে হেঁচে উঠল একবার, চোখ খুলল, বড় বড় চোখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল, চারিদিকে দেখল। আস্তে আস্তে আধারের মধ্যে উঠে বসল। মিষ্টি গলায় বলল, ওঃ! কতদিন যে ঘুমিয়ে ছিলাম।

ওগুলার মেয়ের গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চোখ ছলছল করছে। সে সামলে নিয়ে বলল, শুধুই ঘুমিয়েছিলে?

মেয়ে বলল, হ্যাঁ।

ওগুলার মেয়ে বলল, এম্‌বোলো।

সুন্দরী মেয়ে বলল, আই এম্‌বোলো।

এবার মেয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি কোথায়? এটা কোন জায়গা?

অন্য মেয়ে উত্তর দিল, তুমি আমার বাবার বাড়িতে আছ। কেন? এটা তো আমার বাবার বাড়ি।

মেয়ে বলল, কিন্তু আমাকে এখানে কে আনল? কেমন করে শবাধার দেখতে পেল, কীভাবে ওগুলাকে খবর দিল, কীভাবে তারা সোনালি আধার নিয়ে এল। সব বলল তাকে। তক্ষুনি দুজন দুজনকে খুব ভালোবেসে ফেলল। যেন আপন দুই বোন। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল, আদর করল, খেলল, গল্পগুজব করল। অনেকক্ষণ কেটে গেল।

মেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বলল, বোন, তুমি আমার মাথায় আবার কাঁটাটা ঢুকিয়ে দাও, আমি একটু ঘুমিয়ে থাকি। ওগুলার মেয়ে তাই করল। মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঢাকনা বন্ধ করে মেয়ে ফিরে এল। ঘুমিয়ে-থাকা মেয়ে আবার মৃতের মতো নিস্তেজ হয়ে গেল। এখন তার মাথায় যে ধারালো কাঁটা বেঁধা রয়েছে!

ওগুলার মেয়ে এখন আর বাইরে অন্য সখীদের সঙ্গে খেলতে যায় না। বাড়ির বাইরে যেতে আর এতটুকু ভালো লাগে না। বন্ধুরা অভিযোগ করে, সে নানা অজুহাত দেখায়। কোনোভাবেই তাকে আর তারা পায় না। কেমন করে পাবে? একটি ঘর আর একটি নতুন সাথি তাকে আটকে দিয়েছে। অন্য আর কিছুই তার ভালো লাগে না। যখনই তার বাবা বাইরে যায়, তক্ষুনি সে ঘরে ঢুকে আধারের ঢাকনা খোলে, ঘন চুলের মাঝ থেকে ধারালো কাঁটা টেনে বের করে, খেলা করে, কতই আনন্দ। এমনি করে সুখে দিন কাটে। অনেকদিন একটানা ঘুমিয়ে মেয়ে কাহিল হয়ে গিয়েছিল, রোগা হয়ে গিয়েছিল। এখন বন্ধু প্রতিদিন খাবার আনে। মেয়ে আর রোগাটে রইল না। আরও সুন্দরী হয়ে উঠল।

এমনি করে অনেকদিন কেটে গেল। ওগুলা কিছুই জানতে পারল না।

কিন্তু একদিন তারা ধরা পড়ে গেল। অনেকক্ষণ গল্প করছে, খেলায় মেতে রয়েছে। সময়ের খেয়াল নেই। বাবার আসার সময়ের কথা ভুলে গিয়েছে। খেলছে তো খেলছেই। গল্প করছে তো করছেই। হঠাৎ বাবা ফিরে এল। দরজা ভেজানো রয়েছে। হাত দিতেই খুলে গেল। ওগুলা অবাক হয়ে দেখল দুটি মেয়ে গল্প করছে, মাথা-হাত নেড়ে শুধুই বক্‌বক্ করে চলেছে। ওগুলাকে দেখে তো মেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। বাবা কিন্তু তাকে বকুনি দিল না। নরম গলায় বলল, ভয় পাওয়ার কী আছে? তা, তুমি কেমন করে এ মেয়ের জীবন ফিরিয়ে আনলে? এর ঘুম ভাঙালে কেমন করে? তুমি কী করলে বলো তো?

মেয়ে বাবাকে সব খুলে বলল। লম্বা ধারালো কাঁটাটার কথা খুব ভালোভাবে বলল। ওগুলা তখন অপরূপ সুন্দরী মিষ্টি মেয়ের পাশে বসে পড়ল। তার সব কথা জানতে চাইল। মেয়েও মন খুলে সব কিছু বলল। তার জীবনের করুণ কাহিনি।

কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ করে রইল। তারপর ওগুলা বলল, আমি এই এলাকার সর্দার, আমি গোষ্ঠীপতি। তোমার মা যেখানে থাকে সেটাও আমার এলাকা। মা হয়ে এমন কাজ? রূপের গরব এত? আমার এলাকাতে বাস করে মেয়েকে মেরে ফেলার চক্রান্ত? ঠিক আছে, কালকে এসব নিয়ে খোঁজখবর করব। কালকে হবে এলাকার 'ওজাজা'— সবাইকে ডেকে

এনে এক সভা হবে। সবাইকে সেখানে থাকতে হবে। তুমিও থাকবে। কেননা তুমি হবে আমার বউ। বড় আদরের বউ'। একথা শুনে সুন্দরী মেয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল।

সেদিনই চারিদিকে খবর চলে গেল। কাল সকালে হবে এলাকার 'ওজাজা'। সে বিরাট জমায়েতে সবাই এল। নিষ্ঠুর মা, সৈন্যরা, বুড়িমা সবাই এল। এল না শুধু সেই কজন ডাকাত। ত'রা এ সভার কোনো খবর পায়নি। তারা যে গভীর বনে লুকিয়ে থাকে, তাদের বাড়ির খবর কেই বা রাখে? সবাই যার যার কথা বলল। এখানে তো মন খুলে কথা বলতেই আসা।

শেষ কালে এল সেই সুন্দরী মিষ্টি মেয়ে। ওগুলার মেয়ের হাত ধরে আস্তে আস্তে সে সভার মাঝে এল। চারিদিক আলো করে।

যেই না মা সেই মেয়েকে দেখেছে, অমনি লাফিয়ে উঠল সে। রাগে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। পাশে-বসা বুড়িমার চুল ধরে টেনে জিজ্ঞেস করল, ওই তো আমার মেয়ে। ওই-তো বেঁচে আছে। মরেনি। তুমি যে বললে, তাকে মেরে ফেলেছ?'

বুড়িমা খুব অবাক হয়ে গিয়েছে। মরা মেয়ে বেঁচে ফিরল কী করে? সত্যি কি সেই মেয়ে? বলল, হ্যাঁ, আমি তো তাকে মেরেই ফেলেছিলাম। কিন্তু...।

মেয়েটা একটা উঁচু পাথরে বসল। ওগুলা বলল, সবাই এখানে রয়েছে। তোমার জীবনের কথা তুমি বলো।

মেয়ে আরম্ভ করল। তার ছেলেবেলা থেকে শুরু করল। নিঃসঙ্গ জীবনের কথা, মায়ের নিষেধ, তার কৌতূহল, জাদু আয়না, সৈন্যদের কথা, মরে যাওয়ার কথা, বেঁচে ওঠার কথা— আর শেষকালে ওগুলার বাড়ির কথা। সব বলল সে। মাঝে মাঝে সব ঝাপসা হয়ে উঠছে, চোখের জল বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে মেয়ে যখন ডাকাতদের কথা বলছে তখন তার কী কান্না! কোথায় হারিয়ে গেল তারা। আর কি কোনোদিন দেখা হবে? মেয়ে থামল। মাথাটা নুয়ে রয়েছে।

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। এমন নিষ্ঠুর মা। মেয়েকে মেরে ফেলতে চায়। আর এমন মিষ্টি মেয়েকে? শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। প্রতিশোধ চাই। ডাইনি কোথাকার। তোকে পুড়িয়ে মারা উচিত। আর সেই বুড়িটাকেও।

এইরকম যখন চিৎকার হট্টগোল হচ্ছে তখন মা আর বুড়িমা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। মেয়ে যদি এক্ষুনি তাদের চিনিয়ে দেয়? তাহলে? ডাইনির শাস্তি? ভিড়ের মধ্যে তারা পেছন দিকে চলে গেল। সভা ছেড়ে পালাল। বনের পথ ধরল। আরও গভীর বন। তার পরে দূর এক দেশে চলে গেল। আর কখনও ফিরবে না, কোথায় হারিয়ে গেল দুজনে।

সবার সামনে ওগুলার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হল। সবাই খুশি। গাঁয়ের লোক, ওগুলা, মেয়ে— সবাই। সবার চেয়ে খুশি হল ওগুলার মেয়ে। এমন খেলার সাথি। এখন থেকে তারই কাছে থাকবে।

আর ডাকাতরা? তারা সেই গভীর বনে নির্জন বাড়িতে থাকে। তারা 'ওজাজা'র কথা শোনেনি। সেখানে যায়ওনি। সবই তাদের রয়েছে, শুধু নেই আদরের বোন। শবাধারে মেয়ে ছিল, হোক সে ঘুমন্ত. তবু তো বোনকে প্রতিদিন দেখতে পেত। তাও নেই। তারা ডাকাত। আরও কোনো বড় ডাকাত তাদের বোনকে বোধহয় ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছে। তারা প্রতিদিন চোখের জল ফেলে। কাজ করে, সব করে তবু বোনকে ভুলতে পারে না। কী হল তাদের বোনের? কোথায় রয়েছে সে? কোন দূর দেশে কোথায় গেল তাদের আদরের বোন।

নাসাউ-এর এই গ্রন্থটির নাম 'ফিটিশিজম্ ইন ওয়েস্ট আফ্রিকা।' পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অচেতন বস্তুতে প্রাণ আরোপ করে যেসব বিশ্বাস রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য রয়েছে। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। তাই লোকসংস্কৃতির গবেষকদের মধ্যে তেমন প্রচারিত হয়নি। গ্রন্থের মধ্যে যে এমন একটি রূপকথা রয়েছে তা দীর্ঘদিন অগোচরেই থেকে যায়।

এই লোককথাটির ক্ষেত্রে মাইগ্রেশন যে ঘটেনি তার প্রমাণ রয়েছে। আরও অসংখ্য লোককথার ক্ষেত্রে এটি প্রমাণিত হয়েছে।

অনেক দিনের গবেষণার পরে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা একটি তত্ত্বে পৌঁছান। সেইসঙ্গে লোককথার যে মাইগ্রেশান হয়েছে তার তথ্যও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে দ্বিতীয় স্তরের আক্ষরিক মাইগ্রেশান সম্প্রতিকালের. উপনিবেশ স্থাপনের পরে ক্রীতদাস আমদানির কালে।

দূর দূর প্রান্তের নানা দেশের লোককথার মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়, দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা একটি তত্ত্বে পৌঁছেছেন। এঁরা

মনে করেন, এইসব লোককথা নিরপেক্ষভাবেই লোকসমাজে সৃষ্টি হয়েছে। কোনো মাইগ্রেশানের ফলে নয়। পৃথিবীতে মানবসমাজের অসম সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে। বিকাশের এইসব স্তরে মানুষ সর্বজনীন কতকগুলো অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আর এইসব দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে মৌখিক সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে তারা সদৃশ চিন্তাকেই প্রতিফলিত করে। সব সমাজের অভিজ্ঞতাই মূলত এক, তাই লোককথার মাধ্যমে একই কাহিনি রূপ পায়। পার্থক্য শুধু পাত্র-পাত্রীর নামে। তাঁরা বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কহীন অবস্থাতেই এইসব লোককথার জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর অসংখ্য এলাকার লোককথার জন্ম-ইতিহাস সম্পর্কে এই তত্ত্ব অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মতভাবে সঠিক।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ভারতীয় পঞ্চতন্ত্র খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সংকলিত হয়েছিল। আর অষ্টম শতাব্দীতে ভাষান্তরিত হয় সিরিয়াক ও আরবি ভাষায়। সেখান থেকে গ্রিস হয়ে ইউরোপে যেতে পারে। ঈশপের নীতিকথাও খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দের কাছাকাছি সংকলিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব যুগে কিংবা তারও অনেক পরে ভারতের সঙ্গে গ্রিসের যোগাযোগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে, পঞ্চতন্ত্রের পশুকথার সঙ্গে ঈশপের নীতিকথার এত মিল কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? আসলে সমচিন্তা দুই দেশেই নিরপেক্ষভাবে গড়ে উঠেছিল।

নৃবিজ্ঞানীরা এরকম অসংখ্য বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এমনই একটি সুপরিচিত মিথকথা হল 'নিষিদ্ধ ফল'।

অনেক অনেক কাল আগে পৃথিবীতে কিছুই ছিল না। পরে কিছু কিছু হল, কিন্তু মানুষ ছিল না। পরে দেবতা মানুষ সৃষ্টি করলেন। তিনি চন্দ্র থেকে অংশ নিয়ে আদি মানব গড়লেন। তার নাম বা-আত্‌সি। আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে টিপেটুপে তিনি মানুষটার দেহ গড়ে তুললেন। তারপরে মসৃণ কালো চামড়া দিয়ে দেহটি দিলেন ঢেকে। সুন্দর দেহ তৈরি হওয়ার পরে দেবতা দেহের মধ্যে রক্ত ঢুকিয়ে দিলেন। মানুষ তখন প্রাণ পেল। আদি মানব বা-আত্‌সি, আমাদের প্রথম পিতা, চলেফিরে বেড়াতে লাগলেন।

দেবতা বা-আত্‌সিকে ডেকে কানে কানে বললেন— তুমি প্রাণ পেলে। তুমি আমার নতুন সৃষ্টি। এবার থেকে তোমার ছেলেমেয়ে হবে। সেই ছেলেমেয়ে পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। কিন্তু তুমি তাদের একটা ব্যাপারে সাবধান করে দেবে। এই নিষেধ তারা যেন মেনে চলে। নইলে সর্বনাশ হবে। সবাই

যেন মেনে চলে। বনে যত গাছ আছে তার ফল তারা খাবে। সব গাছের ফল তারা খেতে পারবে। কিন্তু তাহু গাছের ফল কখনও খাবে না। হ্যাঁ, তাহু গাছের ফল, ছেলেমেয়েদের বলে দেবে।

অল্পদিনের মধ্যে বা-আত্সির অনেক ছেলেমেয়ে হল। ছেলেমেয়ে একটু বড় হলেই সে দেবতার এই নিষেধের কথা তাদের জানিয়ে দিল। নিষেধ মেনে চলতে বলল। তারপর বয়স হলে বা-আত্সি আকাশে দেবতার কাছে চলে গেল। অনেক ছেলেমেয়ে পৃথিবীতে রইল।

সবাই প্রথম প্রথম নিষেধের কথা মেনে চলত। আর তাই সবাই খুব সুখে থাকত। বড় আনন্দ, বড় সুখ, অনেক শান্তি।

এখন হয়েছে কী, একদিন একটি মেয়ের খুব ইচ্ছে হল তাহু ফল খাবে। সে তখন পোয়াতি, মা হতে চলেছে। কিছুতেই লোভ যাচ্ছে না। সে খাবেই।

স্বামীকে বলল, খুব ইচ্ছে করছে, আমি ওই ফল খাব। স্বামী অবাক হল। আদি পিতার নিষেধের কথা বলল। কিন্তু বউ বারবার বলাতে স্বামী ভাবল, লুকিয়ে দিলে কেউ তো আর জানতে পারবে না। বনের গভীরে গিয়ে সে বউকে তাহু গাছের ফল দিল। বউ ফল খেল। ফলের বীজগুলো পাতায় জড়িয়ে রাখল।

চন্দ্র আকাশ থেকে সব দেখলেন। দেবতাকে বলে দিলেন। দেবতা ভীষণ রেগে গেলেন। মানুষ তার নিষেধ অমান্য করেছে? আর এই নিষেধ না মানার জন্য দেবতা শাস্তি দিলেন মানুষকে। তিনি মানুষের মধ্যে মৃত্যুকে পাঠিয়ে দিলেন। আগে মানুষ বয়েস হলে আকাশে দেবতার কাছে চলে যেত। এখন পাপ করায় মানুষের মৃত্যু হতে লাগল।

পশ্চিম আফ্রিকার য়োরুবা দেশের ইফে আদিবাসী গোষ্ঠীর সৃষ্টি বিষয়ক মিথকথা বা লোকপুরাণ এই 'নিষিদ্ধ ফল'।

এই সূত্রেই মনে পড়বে খ্রিস্টপূর্ব কালের ওল্ড টেস্টামেন্টের কথা। আদম-ইভের গল্প। মাইগ্রেশান কিংবা প্রভাবের সামান্যতম সূত্রও কি পাওয়া যাবে? নিরপেক্ষভাবেই গড়ে উঠেছে দুটি কাহিনি।

'আদিপুস্তকে'র কাহিনিটি কেমন ছিল তা জানা দরকার। সংক্ষেপে বিবৃত করছি। সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়।

'আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের

সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন।

সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে অর্থাৎ মনুষ্যকে নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন। তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল। ঈশ্বর এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেখানে ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। ঈশ্বর আদমের একখানি পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন। ইহার নাম নারী, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন। ওই সময়ে আদম ও তাহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিতেন, তাহাদের কোনো লজ্জাবোধ ছিল না।

ঈশ্বর বলিলেন, তোমরা বনের সকল বৃক্ষের ফল ভোজন করিও, শুধু উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে তাহা ভোজন করিও না, ভোজন করিলে মরিবে।

উদ্যানের এক খল সর্পের কথায় স্ত্রী সেই ফল ভোজন করিল। আদমকেও খাওয়াইলেন। উভয়ের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা উলঙ্গ। ডুমুরবৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া ঘাগ্‌রা প্রস্তুত করিয়া লইলেন।

ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। মনুষ্যের পাপে পতন হইল।'

আফ্রিকার আদিবাসী লোককথাটি সরল। আদিবাসী সমাজ সহজ-সরল, তাদের জীবনে জটিলতা নেই। তাদের লোককথাও সাদামাঠা। কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্ট ধর্মীয় গ্রন্থ, এর রচয়িতা বিদগ্ধ প্রাজ্ঞ মানুষ। তাই আদমের কাহিনিতেও রয়েছে জটিলতা। কিন্তু দুটি কাহিনির মধ্যে আশ্চর্য মিল, সদৃশ চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। আসলে লোককথা একই সঙ্গে আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন। কেউ কাউকে প্রভাবিত করেনি, এক অঞ্চলের লোককথা অন্য অঞ্চলে ছড়ায়নি। নিরপেক্ষভাবেই সেসব সাদৃশ্য গড়ে উঠেছে।

আবার লোককথার আক্ষরিক অর্থেই মাইগ্রেশান ঘটেছে, ইতিহাসে তারও প্রমাণ রয়েছে। তবে সেসব বেশি দিনের ইতিহাস নয়। বিভিন্ন এলাকায় মানুষের যখন নতুন বসতি গড়ে উঠতে লাগল, তখনই লোককথার সুস্পষ্ট মাইগ্রেশান ঘটল।

আজকের পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ত্রিনিদাদ, লিওয়ার্ড, বারবাডোস, ভার্জিন, টোবাগো, জ্যামাইকা প্রভৃতি দ্বীপের অধিকাংশ বাসিন্দা এককালে

এসেছিল আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ থেকে। ফসলের খেতে, বাগিচায় কুলি-কামিন হয়ে এসেছিল এরা।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। এইসব দেশে লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস আমদানি করা হয়েছে। সাধারণত আফ্রিকার সমুদ্র তীরবর্তী দেশ থেকেই ক্রীতদাস সংগ্রহ করা হত। কেননা, জাহাজ ভিড়ত এইসব এলাকায়। অতলান্তিক সমুদ্র ও গিনি উপসাগরের কাছাকাছি দেশ গাম্বিয়া লাইবেরিয়া আইভরি কোস্ট য়োরুবা ক্যামেরুন গাবোন কংগো অ্যাংগোলা দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ থেকেই এই আদি বাসিন্দারা সুদূর দেশে চালান হয়ে গিয়েছিল।

কালে কালে তারা নতুন 'স্বদেশভূমিতে' তাদের মাতৃভাষা ভুলে গিয়েছে, উপনিবেশবাদীদের ভাষা গ্রহণ করেছে। আদিবাসী লৌকিক ধর্ম বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে, খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। মাতৃভূমির জীবনাচরণ নতুন পরিবেশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পালটে গিয়েছে। চিন্তায়ও অন্য মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় এইসব উদ্বাস্তু আদিবাসীদের লোকসংস্কৃতির ওপরে গবেষণা শুরু হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ গবেষকগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ক্ষেত্রসমীক্ষা করেন।

দেখা গেল, ভাষা পরিবর্তিত হলেও ক্রীতদাসেরা যেসব লোককথা বলেছে তার মধ্যে কিছু কিছু ভিন্নতা সত্ত্বেও আফ্রিকার লোককথা ও লৌকিক ঐতিহ্য মিশে রয়েছে। বহু বছর কেটে গিয়েছে, পরবর্তী প্রজন্ম কোনোদিন মাতৃভূমি দেখেনি— তবু ঐতিহ্যে মিশে রয়েছে স্বদেশভূমির আদি চিন্তা-চেতনা।

আফ্রো-আমেরিকান জনগণের লোককথা বিশ্লেষণ করে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, আফ্রিকার নানা দেশের লোককথা নানাভাবে তাদের বর্তমান লোককথার ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে।

শুধু আফ্রিকার মানুষ নয়, আমেরিকার লোককথায় আরও অনেক ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। চারটি পথে আমেরিকায় লোককথার মাইগ্রেশান ঘটে।

একসময় আমেরিকায় আদি বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ান ছাড়া বহিরাগত তেমন ছিল না। ইউরোপ যখন কলম্বাসের মাধ্যমে আমেরিকার সন্ধান পেল তখন থেকে স্পেনীয় ভাষার সুযোগসন্ধানী মানুষ সেখানে আসতে শুরু

করে। তার পরে গ্রেট ব্রিটেন ইতালি ফ্রান্স জার্মানি পোর্তুগাল অস্ট্রিয়া স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশ থেকে মানুষ আসতে লাগল নতুন দেশে। সেইসঙ্গে যুক্ত হল এশিয়াবাসী এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চিনের মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী। তিন মহাদেশের চারটি ধারায় আমেরিকার লোককথায় নতুন পরিবেশ গড়ে উঠল। এসবই কিন্তু প্রত্যক্ষ মাইগ্রেশানের ফল।

আসলে পঞ্চদশ শতক থেকে পৃথিবীর চতুর্দিকে যখন ইউরোপীয় অভিযাত্রীর দল জলপথে জাহাজে চেপে নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল, তখন থেকেই লোকসমাজের নতুন বসতি সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করা শুরু হল। আর এই সময় থেকেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষের যাতায়াত সম্পর্কেও আমরা বিস্তৃতভাবে জানতে পারলাম। মানুষজনের মাইগ্রেশান বিষয়ে তথ্য নথিভুক্ত হল। আর মানুষের মাইগ্রেশানের সঙ্গে তার সংস্কৃতি ও মৌখিক ঐতিহ্যেরও যে মাইগ্রেশান ঘটে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আর তাই লোককথাও যে নতুন দেশে এসে নতুন রূপ পাবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

এসব তথ্য তো ইতিহাসের সাক্ষ্য। গত পাঁচশো বছরের কথা। কিন্তু যে ইতিহাস লিখিত নেই, তার হদিস পাওয়া যাবে কেমন করে? মানুষের মতো যাযাবর আর কোনো প্রাণী নেই। সেইসব যাযাবর মানুষের অলিখিত ইতিহাসের সন্ধান কি একেবারেই পাওয়া যায় না?

কিন্তু ইতিহাসের সেই সুদূর কালে মানুষ যে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নতুন বসতি গড়ে তুলেছিল তার কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। কিন্তু প্রমাণ যে একেবারে নেই তা তো নয়। নৃবিজ্ঞানী-ভাষাবিজ্ঞানীরা সেইসব সুদূরকালের তথ্যও সংগ্রহ করেছেন। তাই মাইগ্রেশানের বিষয়টিও আমরা জানতে পেরেছি। সন্দেহ যে সম্পূর্ণ নিরসন হয়েছে তা নয়। তবে অনেক কিছুই আমরা জানতে পেরেছি।

ভাষা-সংস্কৃতি-আচার-পাল-পার্বণ-পুজো-জীবাশ্ম-লোককথার সাদৃশ্য বিচার করে এইসব মাইগ্রেশানের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মিলেছে। ওশিয়ানিয়ার মানুষ ও তার মৌখিক ঐতিহ্যের যে মাইগ্রেশান ঘটেছে সে বিষয়ে আজ আর কারও সন্দেহ নেই। নিউজিল্যান্ডের মাওরি আদিবাসী তিরিশ হাজার বছর আগে ভারতীয় উপকূল থেকেই সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল।

তারা পৌঁছল ইরিহিয়া দেশে, সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন ভারতবর্ষের নাম ব্রীহিয়া। মাওরিদের প্রধান খাদ্য চাল, তারা বলে আরি। দক্ষিণ ভারতীয়রা চালকে বলে আরি। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধানকে বলা হত ব্রীহি আর ব্রীহিক হল ধান্যবিশিষ্ট। ব্রীহিয়া দেশের অর্থাৎ ইরিহিয়ার নাম এসেছে ব্রীহি বা ব্রীহিক থেকে। মাওরিয়া দক্ষ সমুদ্র-অভিযাত্রী। প্রাচীন ভারতীয় মানুষও ছিল অকূল দরিয়ার মাঝি। ভাষাগত এমন মিল দুই এলাকার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে যে, দুজন খ্যাতনামা ভাষাবিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী এস. পারসি স্মিথ এবং এল্‌স্‌ডন বেস্ট এই জনগোষ্ঠীর মাইগ্রেশান বিষয়ে প্রামাণ্য গবেষণা করেছেন। ভাষা ও লোকসংস্কৃতির সাদৃশ্য তারা ব্যাপকভাবে খুঁজে পেয়েছেন।

লোকসমাজের মাইগ্রেশান ঘটে দুভাবে। বাধ্যতামূলক দেশত্যাগ। পূর্ব ভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকা ও এশিয়ার মানুষকে নতুন বসতিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জোর করে। এইসব এলাকায় যারা গেল তাদের ঐতিহ্যে লোককথা রয়েছে, আদি বাসভূমির লোককথা বহমান রয়েছে, কিন্তু খণ্ডিত আকারে। তাই বর্তমান পরিবেশে সেইসব লোককথার আদি উৎস অর্থাৎ মূল রূপটি আবিষ্কার করা বড় সহজ নয়। তবে একেবারে অসম্ভবও নয়। সেসব গবেষণা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হল স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ। অবশ্য এখানেও কিছুটা বাধ্যবাধকতা থাকে। যুদ্ধে পরাজয়-বন্যা-খরা-খাদ্যাভাব প্রভৃতি কারণে দেশত্যাগ ঘটে। তবে কোনো জনগোষ্ঠী জোর করে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করেনি। ওশিয়ানিয়া এলাকায় ঘটেছে এই ধরনের দেশত্যাগ।

ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল ও ভারতবর্ষের দক্ষিণ এলাকা থেকে দলে দলে মানুষ মাইক্রোনেশিয়া, মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েছে স্বেচ্ছায়। ফলে তাদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-আচার-পাল-পার্বণ প্রভৃতি বিসর্জন দিতে হয়নি। কালের প্রভাবে, নানা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে তাদের ভাষা ও লৌকিক সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটেছে কিন্তু একেবারে ত্যাগ করতে হয়নি। তাই তাদের সামাজিক লৌকিক সংগঠনে পুরনো ঐতিহ্যের রেশ রয়ে গিয়েছে। নানা প্রতিকূল ঢেউ আছড়ে পড়লেও তাদের ঐতিহ্যলালিত ভাষা ও সংস্কৃতিকে একেবারে মুছে দিতে পারেনি। লোককথার মধ্যেও তার হদিস মিলেছে।

মাইগ্রেশান আলোচনার সময় এই দুটি ভিন্ন রূপকে মনে রাখতে হবে। ঔপনিবেশ ভারতবর্ষে অবিভক্ত বাংলার উত্তরবঙ্গ ও দার্জিলিং পাহাড়ি এলাকায় ইংরেজরা চা-বাগিচা গড়ে তুলল, তখন কুলি-কামিন সংগ্রহ করেছিল সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুরের আদিবাসী মানুষজনের মধ্যে থেকে। বাধ্যতামূলক দেশত্যাগ। অনেক অনেক বছর কেটে গিয়েছে, পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশে নতুন জীবনেও কিন্তু আদিবাসী লোককথার রূপ ও প্রাণস্পন্দন আজও অনুভব করা যাবে।

লোককথার লিখিত পরম্পরা

বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের লোকসমাজ সেই কোন ভুলে-যাওয়া কাল থেকে সামাজিক প্রয়োজনে, ধর্মীয় তাগিদে ও অনাবিল আনন্দে লোককথা সৃষ্টি করে চলেছেন। আজও হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যে, পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যেও লোককথা সৃষ্টি হচ্ছে। লোককথার এই ব্যাপ্ত বিশাল ভাণ্ডার প্রত্যেককেই বিস্মিত করে। যদিও মৌখিক ঐতিহ্যে যা রয়েছে তার সামান্য অংশই সংগৃহীত হয়েছে। কেননা, আজও শত-সহস্র লোকসমাজের কোনো লোককথাই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কবে থেকে মানুষ এইসব লোককথা বলছেন? প্রাচীন ভারতবর্ষের বিষ্ণুশর্মা কিংবা পিলপে অথবা প্রাচীন গ্রিসের ঈশপ মৌখিক লোককথা সংকলন করেছিলেন। কিন্তু তারও পূর্ববর্তী কালের লোককথার কি কোনো লিখিত নিদর্শন নেই? হরপ্পা কিংবা মহেঞ্জোদারোর নগর যখন গড়ে উঠছে তখন প্রয়োজন পড়েছে অসংখ্য শ্রমিকের। এরা গ্রামীণ সমাজের মানুষ ছিল। কৃষি-সভ্যতার সঙ্গেই এদের ছিল নাড়ীর যোগ। প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সের বিশাল প্রাসাদ-মন্দির-রঙ্গালয় প্রভৃতি যারা তৈরি করেছে, তারাও মূলত গ্রামীণ সমাজভুক্ত। প্রাচীন মিশরের পিরামিড কিংবা প্রাচীন ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান যারা গড়েছে তারাও ছিল কৃষিজীবী সম্প্রদায় থেকে আসা যুদ্ধবন্দি-ক্রীতদাস

শ্রমিক। দূর দূর গ্রাম থেকে তারা এসেছিল নগর-সভ্যতার বনিয়াদ গড়তে। অবসর সময়ে তারা নিছক বিনোদনের জন্যও কি কোনো লোককথা শোনাত না? গ্রামীণ জীবনের রক্তের সঙ্গে মিশে-থাকা লোককথা কি এত সহজেই ভুলে যাওয়া যায়? আফ্রো-আমেরিকান গ্রামীণ কৃষকেরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে, মাতৃভাষাও ভুলেছে কালক্রমে— কিন্তু নতুন দেশে নতুন পরিবেশে তারাও বাঁচিয়ে রেখেছে আফ্রিকার আদিবাসী লোককথাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের হাতে এসেছে বলেই একথা আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারছি। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে, মিশরে, গ্রিসে, ব্যাবিলনে যারা বছরের পর বছর ধরে অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজেদের গ্রামীণ পরিবেশ থেকে সুদূরে যাপন করেছে, গাঁয়ের স্মৃতিতে, আত্মীয়-পরিজনের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তারা কি কোনো লোককথা একে অপরকে শোনায়নি? এক অসহ্য পাশবিক যন্ত্রণাময় কালযাপন। গাঁয়ের স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখতেই নিশ্চয়ই তারা লোককথা বলেছে, গান গেয়েছে, লোকপুরাণ শুনিয়ে মানসিক শান্তি খুঁজেছে। কিন্তু সে সব লোক ঐতিহ্যের কোনো হদিস কি আমরা পেতে পারি?

ঝড়ো হাওয়া আজও বইছে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস কিংবা ব্যাপক খরা-বন্যা বহু জনগোষ্ঠীকে নিঃশেষ করে দেয় আজও। সে বিপর্যয়ের নথিপত্র থাকে, থাকে ইতিহাস। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে সব বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে তার তো কোনো ইতিহাস নেই। বড় বড় ঘটনার কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নই শুধু পাওয়া যায়। শতসহস্র অ্যাটিলা-সুলতান মামুদদের আক্রমণে অনেক লিখিত নথিপত্রই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাই কালের বিবর্তনে প্রাচীন পৃথিবীর লোকসমাজের লোককথারও প্রত্যক্ষ কোনো হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। সেদিনের লোককথার কোনো সংগ্রহই আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। বিষ্ণুশর্মা-পিলপে-ঈশপ-নারায়ণ-ক্ষেমেন্দ্র অনেক পরের সংগ্রাহক।

তবু অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ কি একেবারেই অজানা? সেদিনের লোককথার কোনো নিদর্শনই কি খোদিত নেই কোনো মন্দিরগাত্রে, প্রাচীন মহাকাব্যে? সেকালের লোককথা সম্পর্কে বোধহয় আজ আমরা আর একেবারেই অজ্ঞ নয়। কিছু তথ্য অন্তত জানা যায়।

সেই সুদূর কালের লোকসমাজের লোককথা সম্পর্কে জেনেছি, সেইসঙ্গে জেনেছি সেই কালে তাদের জীবনে লোককথার স্থান ও প্রভাব, লোককথাগুলি

কেন বলা হত তার উদ্দেশ্যও জানতে পেরেছি। প্রাচীন কালে লোককথা শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশই ছিল না, ছিল কোনো বিশেষ ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম। ধর্মীয় আচার ও সংস্কারের সঙ্গে এগুলোর নিবিড় যোগ ছিল। সেইকালে যে সব লিখিত সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে অনেক লোককথার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সেই সময়ে মানুষের মধ্যে যেসব লোককথার প্রচলন ছিল, বিশেষ প্রয়োজনে লেখক সেইসব লোককথাকে তার কাহিনির মধ্যে লিপিবদ্ধ করে যান। উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের মধ্যে স্থান পেলেও লোককথাগুলির বৈশিষ্ট্য একেবারে হারিয়ে যায়নি। মূল কাহিনি অংশের সঙ্গে লোককথাগুলি যুক্ত থাকে, কিন্তু আলাদাভাবে পড়লে মনে হবে, এটি মূল কাহিনির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে— আসলে আলাদাভাবে এটির সৃষ্টি হয়েছে।

আর একটি উৎস হল মন্দিরগাত্র-মাটির টালি-প্রাসাদচত্বর প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ লোককথা। মনে রাখতে হবে প্রাচীন কাব্য গেয়ে গেয়ে জীবিকা অর্জন করতেন কথক, তাদের কথকতা থেকে প্রাচীন কাব্যের অসংখ্য গল্পও লোকসমাজে প্রচারিত হয়েছিল। যে সব কাহিনি তাদের মনকে আন্দোলিত করত, সেগুলো তারা মনে গেঁথে রাখত, আবার নিজেরাই উত্তরপুরুষকে শোনাত। আবার অনেক সময়ে প্রাচীন কাব্যের কাহিনির মূল উৎস হল লোকসমাজে প্রচলিত কোনো সহজ সরল গাথা। এই লৌকিক উৎসটিকে লেখক মনের মাধুরী মিশিয়ে আরও অপরূপ করে তুলেছেন। প্রাচীনকালে লিখিত কাব্য কথকের মাধ্যমে যেমন প্রচারিত হয়েছে, তেমনি লৌকিক উপাদান লেখকের প্রয়োজনে লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীন কাব্যগুলির প্রত্যেকটিরই আদি উৎস হল লৌকিক কাহিনি— এ বিষয়ে এত তথ্য পাওয়া গিয়েছে যে আজ আর সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। লৌকিক গাথাকাব্যের কাহিনি কিংবা বীরকাহিনি উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের জনক। লৌকিক এইসব গাথা-রূপকথা-বীরকথা-পশুকথা ধর্মীয় আচার-আচরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে, পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতে সেগুলো পুরাণকথার মর্যাদা পেয়েছে, আবার এই পুরাণকথার আদিম কাঠামো থেকে গড়ে উঠেছে উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের বহু কাব্য-পুরাণ-মহাকাব্য। রূপগত ও চিন্তাগত অনেক পরিবর্তন ঘটে গেলেও কাহিনির মূল 'মোটিফের' তেমন কোনো হেরফের হয়নি।

প্রাচীন মিশর

প্রাচীন মিশর সম্পর্কে প্রত্নবিজ্ঞানীরা বলেন— ইজিপ্ট ওয়াজ এনসেন্ট্ ইভ্ন্ টু দ্য এনসেন্ট্স্। মহান গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস প্রাচীন মিশরে ব্যাপকভাবে পর্যটন করেন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। তিনি লিখেছেন— wonders more in number than those of any other land and works it has to show beyond expression great.

যে গ্রিক সভ্যতার প্রাচীনতা বিষয়ে গোটা বিশ্ব বিস্ময় প্রকাশ করে, সেই গ্রিক সভ্যতা তাদের সভ্যতা সম্পর্কে বলে থাকে— আমাদের নিজস্ব প্রাচীন সভ্যতা নতুন ও অনভিজ্ঞ। কার তুলনায়? সুপ্রাচীন কালের ঐতিহ্যবাহিত মিশরের সভ্যতা-সংস্কৃতি-দক্ষতা-প্রযুক্তির নিরিখে। সেইসঙ্গে প্রাচীন ইতিহাসবিদগণ মিশরের সংস্কৃতির মধ্যে রহস্যময়তারও সন্ধান পেয়েছেন।

প্রাচীন রোমান ঐতিহাসিক ও সম্রাটরাও মিশরের আশ্চর্য বর্ণময় ঐতিহ্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

আধুনিক কালে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মিশরে গিয়ে তার প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন অনুভব করে এই মহান দেশটির প্রতি মাথা নত করেছিলেন।

প্রাচীনতম কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে মিশরীয় সভ্যতার প্রতি এই মুগ্ধতা যে অকারণ নয়, মিশরের সভ্যতার ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর এইসব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে ঐতিহ্য, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় মানুষের ধর্মীয়-সামাজিক-পারিবারিক আচার-আচরণ ও লোককথার সূত্রে। লোককথা খুব বড় ভূমিকা পালন করেছে সত্য-উদ্ধারে। কেননা, প্রাচীন লোককথার মধ্যে সেই সেই কালের সামাজিক রীতিনীতি ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের কথা যুক্ত থাকে।

পৃথিবীর বিভন্ন এলাকাতেই সুপ্রাচীন কালের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। তার কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। পিকিং মানুষের গুহায় আগুন জ্বালাবার নিদর্শনও মিলেছে। নানা স্থানে প্রাচীন গুহাচিত্রে শিকারজীবী মানুষের সভ্যতার চিহ্নও রয়েছে। কিন্তু প্রাচীন মিশরে যেভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দের নিদর্শন থেকে ধারাবাহিক প্রমাণসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে, বিশ্বের অন্য কোনো এলাকায় তার হদিস নেই। নব্যপ্রস্তর ও তামা-পিতল যুগের কাল থেকে সভ্যতার সেই সূত্রের সন্ধান মিলেছে। আর লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১৭০০ অব্দে। এবং লিখিত আকারে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০ অব্দে রাজবংশ মেনার যুগ— আট-নজন রাজা ছিলেন। এই সময়েই অখণ্ড মিশর দেশ গড়ে ওঠে। বাড়ি তৈরিতে প্রথম পাথর ব্যবহার শুরু হয়। স্থাপত্যশৈলীতে পাথরের প্রচলন নতুন প্রযুক্তির জন্ম দিল। এই সময়েই হিয়েরোগ্লিফিক অর্থাৎ চিত্রলিপিতে বর্ণমালার আবির্ভাব ঘটল। লিখিত আকারে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্য নথিভুক্ত হতে থাকল।

মিশরের শিল্প-প্রতিভার স্বর্ণযুগ খ্রিস্টপূর্ব ১৯৯১ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৭৮৬ অব্দ। এই সময় থেকেই প্যালেস্টাইন-সিরিয়া সহ অনেক দেশে মিশর বহির্বাণিজ্য শুরু করে।

এইসব সময়কালে মিশরের সামাজিক-পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। সমাজে চিত্রশিল্পী-ভাস্কর-চারণকবি-সাহিত্যিকদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। সন্তানেরা পিতামাতা ও বয়স্ক মানুষকে সম্মান জানাত। তাদের উপদেশ মেনে চলত। কিছু ধনী মানুষ একের অধিক স্ত্রী রাখত। কিন্তু এই প্রথা ব্যাপক মানুষের মধ্যে ছিল না। নারী পিতার সম্পত্তির অংশ পেত।

এমনকী তারা ব্যাবসা-বাণিজ্যও করতে পারত। এই ধরনের সুস্থিত পরিবেশেই শিল্প-সাহিত্যের উজ্জীবন ঘটে। মিশরের লোককথার ক্ষেত্রে এই পরিবেশ অনুকূল ছিল।

মিশরীয় সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন বলেই লোককথার মধ্যে মিথ বা লোকপুরাণের আধিক্য বেশি।

মিশরের সমৃদ্ধি অনেক বিদেশি সম্রাটকে সেই দেশ জয়ে আকৃষ্ট করেছিল। অনেক সম্রাট ও সৈনিক দীর্ঘদিন মিশর দখল করে রেখেছিল। ফলে বহু দেশের সংস্কৃতি এসে মিশেছিল মিশরে। যেমন আমাদের ভারতবর্ষ। গ্রিসের আলেকজান্ডার, তাঁর মৃত্যুর পরে ম্যাসিডোনীয় লাগুস-এর ছেলে টলেমি, সাত শতাব্দী ধরে রোমের আধিপত্য, বিশেষ করে খ্রিস্টপূর্ব ৩০ অব্দ থেকে ক্লিয়োপেট্রার আত্মহত্যার পর থেকে, আর সবচেয়ে বেশি কাল ধরে ইসলামি দেশসমূহের আধিপত্য। এর ফলে মিশরে নানা দেশের মিশ্র সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যাবে। লোককথাও তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রাচীন মিশরের লোককথা

প্রাচীন মিশরের কিছু লোককথা নানা মাধ্যমে বর্তমান কালেও পাওয়া গিয়েছে। লৌকিক উৎস থেকে এগুলি সংরক্ষিত হয়েছিল প্যাপিরাসের ওপর। লোককথাগুলি খুব সাজানো বা বিন্যস্ত নয়। এগুলি সংরক্ষণ করেছিলেন সেকালের পুরোহিত সম্প্রদায়। অবশ্য পেছনে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আঙ্গিক ও মোটিফের বিচারে বোঝা যায়, এগুলি ছিল লোকসমাজের লোককথা। লোককথাগুলির মধ্যে প্রাচীন মিশরের জনজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে, সেইসঙ্গে সেই মোটিফগুলি যে বিশ্বজনীন তার স্বরূপও জানা যায়। লোককথা একই সময়ে আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন।

মিশরের লোককথার প্রাচীনতম লিখিত রূপটি পাওয়া যায় 'জাহাজডোবা মানুষ' লোককথায়। এই লোককথাটি লিখিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ ১৭০০ অব্দে। লোককথাটি হল: একজন মানুষ চলেছে জাহাজ ভাসিয়ে লোহিত সাগরের ওপর দিয়ে। হঠাৎ বিপদের মুখে পড়ল সেই জাহাজ। জাহাজ ডুবে গেল, জাহাজের সব মানুষ ডুবে গেল। শুধু বেঁচে রইল সে। ঢেউ-এ ঢেউ-এ ভাসতে ভাসতে সে এল এক নির্জন দ্বীপে। সেই দ্বীপে বাস

করত এক সাপ। সাপের দেহ হলেও আসলে সে ছিল আত্মাদের রাজা। এই সাপ জাহাজডোবা মানুষটিকে আদর করে দ্বীপে ডেকে নিল। সাপ মানুষটিকে তার দুর্ভাগ্যের কথা সব খুলে বলল। আরও বলল, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই দ্বীপ অতল সাগরে তলিয়ে যাবে, তার দিনও ফুরিয়ে যাবে। এই দ্বীপে ছিল এক মানবী কুমারী। কিন্তু আত্মাদের রাজার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে কুমারীও কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। এইসব দুঃখের কাহিনি শুনতে শুনতে চার মাস কেটে গেল। এমন সময় একদিন সেই দ্বীপের পাশ দিয়ে অন্য একটা জাহাজ ভেসে যাচ্ছিল— মানুষটি সেই জাহাজে চেপে উদ্ধার পেল।

লোককথাটি নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ ও রহস্যময়। লোককথার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল: এর মধ্যে একটি নিটোল কাহিনি থাকে, একটি কিংবা কয়েকটি মোটিফ থাকে, কাহিনির পরম্পরা থাকে। কিন্তু এই লোককথায় অনেক মোটিফ থাকলেও অন্য গুণগুলি অনুপস্থিত। যে পুরোহিত এই লোককথাটির লিখিত রূপ দেন, তিনি কেন যে এইরকম একটি অসম্পূর্ণ লোককথা সংরক্ষণ করলেন তা আজ আর বুঝবার উপায় নেই। অথচ এই কাঠামো থেকে বোঝা যাচ্ছে, লোককথাটির একটি সম্পূর্ণ লৌকিক রূপ ছিল, নইলে এর কোনো অর্থই হয় না। আর লোকসমাজ অর্থহীন কোনো অসম্পূর্ণ লোককথা কখনই সৃষ্টি করে না। আসলে লিখিত রূপ দেবার সময়েই এই বিপর্যয় ঘটে। পুরোহিত সম্প্রদায় তাদের কাজকর্মের মধ্যে কিছুটা রহস্যকে প্রশ্রয় দেন। কারণ, তাদের সবকিছু যদি সাধারণ মানুষ জেনে ফেলে তবে জীবিকায় অসুবিধা ঘটে, সম্ভ্রমবোধও চলে যেতে পারে। এই লোককথাটি যেহেতু কোনো ধর্মীয় কারণে পুরোহিত সংকলন করেছিলেন, তাই এখানে কাহিনিকে কেটেছেঁটে কিছুটা রহস্যজনক করে তোলা হল। স্বভাবের মধ্যেই রহস্য করার বীজ রয়ে গিয়েছে। অবশ্য অন্য কারণও থাকতে পারে। লোককথাটির মধ্যে রাজার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা ও ব্যর্থ প্রেমের বিষয়টি কিন্তু একেবারে অস্পষ্ট নয়।

লোককথাটির মধ্যে থেকে অনেক কিছুর উত্তর আজ আর জানা সম্ভব নয়। রাজা কেন শাপগ্রস্ত, কেন তার দৈহিক রূপান্তর, শেষের দিনগুলি কোন অভিশাপে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, কে দিয়েছে সেই অভিশাপ, আত্মাদের রাজা বিলীন হয়ে গেলে কে আত্মাদের মুক্তি দেবে, মানবী কুমারী কেন কীভাবে দ্বীপে এল, কেন অন্যান্যদের সঙ্গে সে মিলিয়ে গেল— এসব

সূত্রের কোনো হদিস নেই। অথচ মূল গল্পে যে ছিল তা লোককথাটির আঙ্গিকের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া না গেলেও মিশরের ও বিশ্বের প্রাচীনতম লোককথাটির যত সংক্ষিপ্ত রূপই হোক না কেন তা আমাদের হাতে এসেছে। এর জন্য আধুনিক বিশ্বের মানুষ সেই অজানা পুরোহিতের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

মিশরের মন্দির থেকে ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের একটি পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই তিনটি লোককথার মধ্যে থেকে আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি।

এই লোককথা তিনটির মধ্যে চিওপ্‌স্‌-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই মহান সম্রাট নাকি লোককথা শুনতে ভালোবাসতেন। চিওপ্‌স্‌ ছিলেন চতুর্থ রাজবংশের (২৭২০-২৫৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রতিষ্ঠাতা। তার পিতা ছিলেন স্নোফ্‌রু ও পিতামহ হুনি। তৃতীয় রাজবংশের সম্রাট হুনি মেইডাম এলাকায় বিশাল একটি পিরামিড গড়ে তুলতে থাকেন। কিন্তু সে কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি, সম্পূর্ণ করেন তার পুত্র স্নোফ্‌রু। পিতা ও পিতামহের ঐতিহ্য বহন করে চিওপ্‌স্‌ গিজা এলাকায় সর্ববৃহৎ পিরামিড গড়ে তোলেন। এর পরিধি ৭৫৫ ফিট, উচ্চতা ৪৮১ ফিট। এর মধ্যেকার অসংখ্য গৃহ ছাড়াও ২৫ লক্ষ চুনা পাথরের বিশাল বিশাল খণ্ড রয়েছে। কয়েকটি পাথর রয়েছে যার একেকটির ওজন ১৬ টনের মতো। সেইকালে মিশরীয়রা চাকার ব্যবহার জানত না, ক্রেন ছিল না— তবু অসাধ্য সাধন করেছিলেন সেদিনের ক্রীতদাস-যুদ্ধবন্দি শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদেরা। এই অসাধারণ পুরুষ চিওপ্‌স্‌-এর নামের উল্লেখ রয়েছে লোককথার এই লিখিত পুথিতে। এই সম্রাটের নাম লোকসমাজে খুব উজ্জ্বল ছিল বলেই এক হাজার বছর পরে লিখিত লোককথাতেও তার উল্লেখ রয়েছে।

বিশ্বের লিখিত লোককথাগুলির মধ্যে এই লোককথা তিনটিই সবচেয়ে প্রাচীন যার মধ্যে একজন ঐতিহাসিক মানুষের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। লোককথার মধ্যে লোকসমাজ যে সমসাময়িক কালের কথা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রকাশ করেন, এটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবশ্য, বিশেষ কালের বেদনা-ক্ষোভ-সংগ্রাম-আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র প্রতীকের মাধ্যমেই বেশি প্রকাশিত হয়। লোককথার অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করলেই সমাজ-মনকে জানা যাবে।

এই তিনটি লোককথায় অত্যন্ত প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর রয়েছে। একটি লোককথায় পঞ্চম রাজবংশের তিনজন সম্রাটের অতিলৌকিক জন্ম বৃত্তান্ত রয়েছে। লোককথাটি সংকলিত হয় ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। আর এই তিন সম্রাটের জীবনকাল আরও এক হাজার বছর আগের।

দুটি লোককথার মধ্যে জাদুকরদের কথা রয়েছে, তাদের কাজকর্মের বিবরণ রয়েছে। জাদুবিদ্যার সাহায্যে সৃষ্টি করা হল একটি কুমিরকে। জাদু-কুমির ব্যভিচারীকে শাস্তি দিয়েছিল। নদীর মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল একটি অলংকার, জাদুবিদ্যার জোরে হারানো অলংকার উদ্ধার করা হল। দুটি লোককথার বিষয়বস্তু এই জাদুকে কেন্দ্র করে।

একজন জাদুকর ছিলেন। তার অনেক গুণ। তিনি প্রচুর খেতে পারতেন, পান করতে পারতেন সেই পরিমাণ। অন্য কেউ ভাবতেই পারে না। মরে-যাওয়া প্রাণীকে তিনি বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন। দেশের রাজা আদেশ দিলেন, একটি মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে, জাদুকর তার শক্তিবলে মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুলুক। জাদুকর রাজার আদেশ অমান্য করলেন। রাজা আদেশ দিলেন, দেবতা থোথ্-এর খেলার ঘুঁটি দেখাতে হবে। জাদুকর বললেন, হ্যাঁ, তার সন্ধান দিতে পারি। হেলিওপোলিস্-এ সূর্যদেবতার মন্দিরে একটি সিন্দুকে আছে। কিন্তু যে-কেউ সে বস্তু আনতে পারবে না। সাচেবুর দেবতা রি-র পূজারিনির বড় ছেলেই শুধু আনতে পারবে। দেবতা রি-র সঙ্গে মিলনের ফলে পূজারিনি অন্তঃসত্ত্বা হলেন, গর্ভে রয়েছে তিনটি শিশু। এর পরে কাহিনিতে রয়েছে পূজারিনির অভিযান। এই তিনটি শিশুই হল পঞ্চম রাজবংশের প্রথম তিনজন সম্রাট। তারাই হলেন মিশরীয় লিপির দেবতা। লোকপুরাণের আদলে কাহিনিটি বর্ণিত হয়েছে। এই তিনটি লোককথাও অসম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিয়েছে।

এর পরবর্তীকালের লোককথা সংগ্রহের যে লিখিত রূপ আমাদের হাতে এসেছে তা 'নব্য রাজবংশের'। এর সময়কাল হল ১৬০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এর মধ্যে একটি গল্পে সামরিক কৌশল সম্পর্কে ঘটনাবলি রয়েছে। কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এইসব লোককথায়।

একটি সুন্দর লোককথা রয়েছে এই সংগ্রহে। এক যে ছিল রাজপুত্র। জন্মাবার মুহূর্তে ভবিষ্যদ্বাণী করা হল— এই রাজপুত্রকে হত্যা করবে সাপ,

কুমির কিংবা কুকুর। রাজপ্রাসাদের এক সুউচ্চ গৃহে তাকে রেখে দেওয়া হল। কোনোভাবেই যাতে অভিশাপ তাকে স্পর্শ করতে না পারে। কিশোর রাজপুত্র যুবক হল। কোনো বাধাকে না মেনে রাজপুত্র অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। অন্য আর এক রাজার দেশে। রাজার ছিল এক মেয়ে। রাজার প্রতিজ্ঞা, মেয়ে যে গৃহে থাকে সেই গৃহে যে পৌছতে পারবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। মেয়ে এমন এক গৃহে থাকে জমি থেকে যার উচ্চতা 'সত্তর এল'। রাজপুত্র পৌছল সেই সুউচ্চ গৃহে। রাজপুত্র যদিও পরিচয় দিয়েছিল যে সে একজন সামরিক ব্যক্তির পুত্র, কিন্তু রাজা তার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছেন। তাদের বিয়ে হয়ে গেল। একদিন রাজকন্যা একটি সাপের ছোবল থেকে স্বামীর প্রাণ বাঁচাল। রাজপুত্র একবার নিজের চেষ্টায় কুমিরের আঘাত থেকে বাঁচল। রাজপুত্রের কাছে সবসময় থাকত খেলনার একটা কুকুর। শেষপর্যন্ত এই খেলনা কুকুর থেকেই রাজপুত্রের মৃত্যু ঘটল। শেষকালে নিয়তি জয়ী হল।

লোককথায় সাধারণত এরকম পরিণতি ঘটে না। রাজপুত্র শেষপর্যন্ত কোনো অতিলৌকিক কৌশলের বলে নিয়তিকে জয় করে। এই মোটিফই বিশ্বজনীন। এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। নিয়তির অমোঘ পরিণাম বোঝাতে কোনো পুরোহিত হয়তো লিখিত রূপ দেবার সময় এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এই সংগ্রহের লোককথাগুলিও অসম্পূর্ণ।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে মিশর থেকে একটি লোককথা আবিষ্কৃত হল। প্যাপিরাসের ওপরে হিয়েরোগ্লিফিক চিত্রলিপিতে লিখিত। ১২৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় সেতি-র আমলে এটি লিপিবদ্ধ হয়। আন্নানা নামে একজন লিপিকর এই লোককথাটি লিখে রেখেছিলেন। এই লোককথাটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন, 'দুই ভাইয়ের গল্পটি' প্রথম লিখিত আকারে পাওয়া সম্পূর্ণ লোককথা।

দুই ভাইয়ের গল্প

এক যে ছিল বাবা-মা। তাদের দুই ছেলে। বড় ভাইয়ের নাম আনুপ, ছোট ভাইয়ের নাম বাটু। আনুপের ছিল এক বউ। দাদার বাড়িতে বাটু থাকত সন্তানের মতো। বাটু মাঠে বলদদের নিয়ে যেত, লাঙল দিত। সে ছিল খুব

কাজের ছেলে। ফসল তোলার কাজ শেষ হলে বাটু তখন মাঠে অন্যান্য কাজ করত। বড় ভাই ছোট ভাইকে সবকিছু দিত, খুব ভালোবাসত।

এমনি করে দিন যায়। বাটু প্রতিদিন সকালে মাঠে যায়, আঁধার নেমে এলে বলদদের নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। সকালে যখন সে মাঠে যায়, দাদা-বউদি তখনও ঘুম থেকে ওঠে না। খাবার নিয়ে সে মাঠে যায়, মাঠে বসেই নিজে খায়, কাজের লোকেরা খায়। কোথায় ভালো ঘাস আছে, গোরুরা বাটুকে তা জানিয়ে দিত। সে-ও গোরুর দলকে নিয়ে সেখানে যেত। গোরুর সংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগল।

আবার চাষের সময় এসে গেল। বড় ভাই বলল, চলো, বলদের দল নিয়ে মাঠে যাই। চাষ করি। তুমি বীজ নিয়ে মাঠে এসো। লাঙল দিতে মাঠে নেমে পড়ি।

ছোট ভাই দাদার কথামতো কাজ করল। মাঠে নেমে পড়ল দুই ভাই। বেশ কয়েকদিন ধরে কাজ চলল। কিন্তু আরও বীজের দরকার হয়ে পড়ল। দাদা বলল, আমি মাঠে থাকছি, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে বউদির কাছ থেকে বীজ নিয়ে এসো।

ছোট ভাই বাড়িতে এসে দেখে বউদি বসে চুল বাঁধছে। সে বলল, এক্ষুনি বীজ দাও, তাড়াতাড়ি মাঠে ফিরতে হবে। দাদা তাড়াতাড়ি মাঠে ফিরতে বলেছে।

বউদি বলল, আমি চুল বাঁধছি, উঠতে পারব না। তুমি গোলা খুলে বীজ নিয়ে যাও।

নিজের ঘরে গিয়ে ভাই একটা বড় ঝুড়ি নিল। অনেক বীজ নিয়ে যেতে হবে। সে ঝুড়িতে অনেক বীজ নিয়ে বউদির সামনে এল। হঠাৎ বড় ভাইয়ের বউ বাটুকে খারাপ পরামর্শ দিল। বাটুকে সে রাজি করাতে পারল না। কুপ্রস্তাব না শুনে ভাই মাঠে চলে গেল।

আঁধার নেমে এলে বড় ভাই ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে এল। ঘরে ঢুকে দেখে, বউ শুয়ে আছে। ঘর অন্ধকার, বউ আলো জ্বালাল না, স্বামী আসাতে ব্যস্তও হল না। স্বামী অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে তোমার? কেউ কিছু বলেছে?

বউ ছোট ভাইয়ের নামে নালিশ করল। এইসব অভিযোগ দাদা বিশ্বাস করল। সে রেগে আগুন হয়ে গেল। ছুরি হাতে গোয়ালের পাশে অন্ধকারে লুকিয়ে রইল। ছোট ভাইকে সে মেরেই ফেলবে।

সূর্য ডুবে গিয়েছে। মাঠ থেকে গোরু নিয়ে বাটু বাড়ি ফিরছে। একটা গোরুর বাছুর বাটুকে আগে থেকেই জানিয়ে দিল, তোমার বড় ভাই ছুরি হাতে অন্ধকারে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে। সাবধান! কাছে যেয়ো না।

ছোট ভাই দরজার ফাঁক দিয়ে ছুরি হাতে বড় ভাইকে দেখতে পেল। ছোট ভাই দৌড় দিল। বড় ভাই ছুটল ভাইয়ের পেছনে, হাতে তার ধারালো অস্ত্র। বাটু অন্ধকারে সূর্যদেবতাকে স্মরণ করল, তাকে সব বলল, শেষে বলল, সব অভিযোগ মিথ্যা। দয়ালু দেবতা, আমাকে রক্ষা কর।

হঠাৎ দেবতার কৃপায় দুই ভাইয়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেল এক স্রোতের ধারা। তার মধ্যে অনেক কুমির। দুপারে দুজন দাঁড়িয়ে।

সকাল হল। চারদিক আলোয় ঝলমল করে উঠল। বাটু করুণ স্বরে বলল, দাদা, তোমার কাছে কোনোদিন আমি খারাপ কিছু করিনি। কোনো অন্যায় করিনি। কেন তুমি আমাকে মারতে গেলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি যে তোমার ছোট ভাই, তুমি-বউদি আমার বাবা-মায়ের মতো। আমি তো কিছুই করিনি দাদা।

বাটু কাঁদতে কাঁদতে বড় ভাইয়ের বউয়ের কুপ্রস্তাবের কথাও জানিয়ে দিল। আর বলল, আমি আর কোনোদিন তোমার বাড়িতে ফিরে যাব না। আমি দূর পাহাড়ে-বনে কোথাও চলে যাব। তুমি ফিরে যাও বাড়িতে, পশুদের যত্ন নিও, জমির দেখাশোনা ভালোভাবে করবে। আমি দেবদারু বনে চলে যাচ্ছি। আমার হৃদয়কে দেবদারু ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রাখব। আমি আর আমার হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব। যেদিন কেউ ওই দেবদারু গাছ কেটে ফেলবে, সেদিন আমার হৃদয় মাটিতে পড়ে যাবে। যদি তুমি কখনও সেটা খুঁজতে আসো, তবে তোমাকে কষ্ট করে সাত বছর অপেক্ষা করতে হবে। হৃদয়টিকে জলের মধ্যে রাখবে, আমি আবার প্রাণ ফিরে পাব।

আনুপ কাঁদতে লাগল। হায়! এ কী করল সে! সব বুঝতে পারল বড় ভাই। ছোট ভাই চোখের সামনে ধীরে ধীরে বনের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এল সে, ঘরে ঢুকল। ঘরে ছিল বউ। আনুপ এক আঘাতে বউকে মেরে ফেলল। মাটিতে বসে ছোট ভাইয়ের জন্য কাঁদতে লাগল।

এদিকে বনের পথে হাঁটতে হাঁটতে ছোট ভাই একদিন এসে পৌঁছল পাহাড়ি বনে। সে একা, তার কোনো সঙ্গীসাথি নেই। সে দেবদারু গাছের উঁচু ডালে একটা ফুলের মধ্যে হৃদয়কে লুকিয়ে রাখল।

অনেক দিন ধরে বাটু সেই গাছের নীচে রইল। সে গাছের ডালপালা দিয়ে একটা ঘর তৈরি করল। সারাদিন শিকার করে, খায় দায়, রাতে ঘুমিয়ে থাকে ঘরে।

একদিন বাটু ঘরের বাইরে এসেই নয় জন দেবতাকে দেখতে পেল। দেবতারা বললেন, বড় ভাইয়ের বউয়ের জন্য তুমি কেন ঘরবাড়ি জমি গোরু ছেড়ে এখানে রয়েছ? তোমার দাদার বউ অনেক দিন আগে মারা গিয়েছে। তুমি দেশে ফিরে যাও, একা থাকার দরকার নেই।

হঠাৎ সূর্যদেবতা বললেন, বাটুর জন্য একটা মেয়ে দাও, সে তার বউ হবে। ওকে আর একা একা থাকতে হবে না।

দেবতা বাটুর জন্য একটি মেয়ে দিলেন। সে হল তার বউ। সবচেয়ে রূপসী সে। প্রেমের দেবী হাথোর ভবিষ্যৎ-বাণী করলেন, এই রূপসীর পরিণতি শুভ নয়। তার মৃত্যু হবে বীভৎসভাবে। বাটু বউকে খুব ভালোবাসতে লাগল। শিকার করে এনে সবকিছু সে বউকে দিত। আর বলত, দূরে কোথাও যেয়ো না। আমার হৃদয় রয়েছে গাছের ডালে, বিপদ এলে তোমায় বাঁচাতে পারব না।

একদিন বাটু বউকে ফুলের মধ্যে থেকে হৃদয় নিয়ে এসে দেখাল। বউ অবাক হয়ে দেখল।

এমনি করে দিন যায়, রাত কাটে। বাড়ির পাশেই ঘন বন। বউ একদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। হঠাৎ সাগর ধেয়ে এল বউয়ের পেছনে, তাকে ধরতে এল। কেননা, সাগর বউকে খুব ভালোবাসত। বউ ছুটে ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেল।

বউয়ের মাথার একগুচ্ছ চুল নদীর জলে গিয়ে পড়ল। ভাসতে ভাসতে সেই গুচ্ছ গেল ফারাও-এর প্রাসাদের নীচে। যারা কাপড় কাচছিল তারা কেশগুচ্ছ ফারাওকে দিল। অপূর্ব সুগন্ধি সেই কেশে। ফারাও ঠিক কবল, এই মেয়েকে সে বিয়ে করবে। দূত ছুটল। অনেক দূত। চারিদিকে। সবাই ফিরে এল। না মেয়েকে তারা খুঁজে পায়নি। যারা পাহাড়ি দেবদারু বনে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে শুধু একজন কোনোরকমে ফিরে এসেছে। সে জানাল, বাটু সবাইকে মেরে ফেলেছে। আমিই শুধু পালিয়ে আসতে পেরেছি।

ফারাও এবার অনেক সৈন্য-সামন্ত-লোকজন পাঠাল। যেমন করেই হোক মেয়েকে আনতেই হবে। এদের সঙ্গে গিয়েছিল ফারাও-এর একজন

নারী। এবার মেয়ে আসতে বাধ্য হল। নারীর হাত ধরে বাটুর বউ এল। রাজ্যে উৎসব লেগে গেল। ফারাও নতুন বউকে খুব ভালোবাসতে লাগল। বউ আরও সুন্দরী হয়ে উঠল। ফারাওকে একদিন বউ আগের স্বামী বাটুর কথা সব বলে দিল। আরও বলল, দেবদারু গাছের উঁচু ডালে ফুলের মধ্যে ওর হৃদয় রয়েছে। গাছ কেটে ফেললে বাটুও মরে যাবে।

কুঠার নিয়ে ফারাও-এর লোকজন চলল বনের পথে। দেবদারু গাছের উঁচু ডাল তারা কেটে ফেলল। ওখানেই ছিল বাটুর হৃদয়। সঙ্গে সঙ্গে বাটু মরে গেল।

এদিকে আনুপও আর বসে রইল না। সে জলের একটা পাত্র নিয়ে পানীয় ও খাবার নিয়ে রওনা দিল বনের পথে। হাঁটতে হাঁটতে খুঁজতে খুঁজতে শেষকালে বড় ভাই পৌঁছে গেল পাহাড়ি দেবদারু বনে। খুঁজে পেল বাটুর ছোট্ট ঘর। ঘরে ঢুকে দেখে, ভাই শুয়ে রয়েছে। নিথর দেহ। আনুপ ভাইয়ের এমন অবস্থা দেখে খুব কাঁদতে লাগল। তারপরে ঘর থেকে বেরিয়ে গাছের নীচে নীচে ঘুরতে লাগল। ভাইয়ের হৃদয়কে সে খুঁজছে। তিন বছর ধরে খুঁজল, কিন্তু হৃদয় পেল না। ভাবল, আর খুঁজে লাভ নেই, হৃদয় পাওয়া যাবে না। মন সায় দেয় না, যেতে ইচ্ছে করছে না। আবার খুঁজে ফেরে ভাইয়ের হৃদয়। আরও কিছুদিন কেটে গেল এমনি করে। সে ঠিক করল, কাল সকালেই চলে যাব। ও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় সে একটি ফুল দেখতে পেল। তার মধ্যেই রয়েছে তার আদরের ভাইয়ের হৃদয়। ফুলটিকে জলের পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিল—বসে রইল আনুপ।

সময় যায়, রাত বাড়ে। পাত্রের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আনুপ দেখল, ভাইয়ের নিথর দেহ কাঁপছে, হাত-পা নড়ছে। আরও কাছে গিয়ে বসল। বাটু চোখ মেলে চেয়ে দেখল, বড় ভাইয়ের দিকে চেয়ে রয়েছে ছোট ভাই। তবু ছোট ভাই উঠছে না কেন? কথা বলছে না কেন? আনুপ পাত্রের নীচে পড়ে থাকা জলটুকু খেয়ে ফেলল। বাটু উঠে দাঁড়াল, বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরল। দুজনের চোখেই জল।

বাটু প্রতিশোধ নিতে চাইল। সে বড় ভাইকে বলল, এবার আমি হব একটা ষাঁড়, আমার মানুষের দেহ পালটে যাবে। কেউ বুঝতে পারবে না, আমি কে। সকাল হলেই তুমি আমাকে নিয়ে রওনা দেবে, যাবে ফারাও-এর প্রাসাদে। ওখানে রয়েছে আমার বউ। ওখানে গেলে আমার ও তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। কি, যাবে তো আমায় নিয়ে?

অন্ধকার কমে গিয়ে আলো ফুটছে। শেষকালে সূর্যদেবতা আকাশের নীচে দেখা দিলেন। বাটু হয়ে গেল একটা ষাঁড়। ষাঁড়ের পিঠে চেপে আনুপ রওনা দিল। পথে চলেছে দুইজন।

ফারাও-এর প্রাসাদের সামনে এসে তারা থামল। এই ষাঁড়ের রয়েছে সব সুলক্ষণ। ফারাও খবর পেয়ে বাইরে এল। পশু দেখে খুব খুশি হল। উৎসব লেগে গেল তখন। রাজ্যের কল্যাণ হবে, কেননা এ ষাঁড় মঙ্গলের দূত। বড় ভাইকে সোনা-রুপো ও অনেক ভৃত্য উপহার দেওয়া হল, এসব নিয়ে বড় ভাই যেন নিজের গ্রামে চলে যায়। ফারাও বড় ভাইকে খুব সম্মান জানাল। বড় ভাই সব কিছু নিয়ে গ্রামে ফিরে এল। ষাঁড় রইল ফারাও-এর প্রাসাদে।

এক পরবের দিন ষাঁড়কে আনা হল মন্দির-চত্বরে। সেখানে রয়েছে বাটুর বউ। তাকে দেখে ষাঁড় বলল, আমি মরিনি, এখনও বেঁচে আছি যেমনভাবে বেঁচে থাকে সত্য।

বউ বলল, তুমি কে?

বাটু বলল, চিনতে পারছ না? আমি বাটু। তুমি তো চাওনি আমি বেঁচে থাকি? তাই দেবদারু ডালের ফুলের কথা ফারাওকে বলে দিয়েছিলে, গাছ কাটিয়েছিলে। আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। আমি ষাঁড়রূপে বেঁচে আছি, আমি জীবিত যেমনভাবে জীবিত থাকে সত্য।

বউ ষাঁড়ের কথা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। অপরাধী মন তার! সে তাড়াতাড়ি মন্দির-চত্বর থেকে পালিয়ে গেল।

এমন সময় ঘরে এল ফারাও। বউয়ের পাশেই এসে বসল। হঠাৎ বউ বলল, রাজা, আমি আপনার কাছে যা চাইব, আপনি আমাকে তাই দেবেন বলুন। সূর্যদেবতার নামে শপথ করুন। আমি যা চাইব তাই আপনাকে দিতে হবে।

ফারাও সবকিছুই তাকে দিতে পারে। বলল, তুমি কী চাও? তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দেব।

বউ বলল, এই ষাঁড়ের হৃদয় খেয়ে ফেলার অনুমতি দিন আমাকে। ষাঁড়ের কোনোই প্রয়োজন নেই। ষাঁড়কে দেবতার উদ্দেশে বলি দিন।

ফারাও ভাবতে পারেনি, বউ এমন জিনিস চাইবে। বড় পয়মন্ত ষাঁড়! কী আর করবে ফারাও। অনুমতি দিল, সে যে কথা দিয়েছে!

পরের দিন উজ্জ্বল আলো ফেলে সূর্য উঠল। ভৃত্যরা নিয়ে এল পয়মন্ত ষাঁড়কে। তারা এবার তাকে বলি দেবে। অনেকে এল ষাঁড়ের চারপাশে। অস্ত্র হাতে তৈরি হল বউ। ষাঁড়ের গলায় তীব্র আঘাত করল। গলা থেকে দু-ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল। দু-ফোঁটা রক্ত পড়ল দরজার দুপাশে। তৎক্ষণাৎ রক্ত থেকে জন্ম নিল দুটো পিচ্‌ গাছ। মঙ্গলের প্রতীক এই দুটি গাছ। সবাই খুশি।

এমনি করে দিন যায়। একদিন ফারাও এল স্বর্ণরথে চড়ে, পেছনের রথে রূপসী বউ। গাছ বড় হয়েছে। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে তারা চলল, দূর থেকেও গাছদুটিকে দেখা যাচ্ছে। শেষকালে তারা দুজন এল গাছের নীচে। রথ থেকে নামল।

গাছ বউকে বলল, তুমি বিশ্বাসঘাতিনী, তুমি একদিন ফারাওকে জানিয়ে দিয়েছিলে আমি কোন গাছের কোথায় রয়েছি। তুমি ষাঁড়রূপী আমাকে নিজে হাতে হত্যা করলে। তুমি কি রকম নারী? আমি তবু মরিনি, বেঁচে আছি, গাছ হয়ে বেঁচে আছি।

বউ মোহিনী-চোখে ফারাও-এর দিকে চাইল। অপরূপা রূপসী নারীর মোহময়ী চোখ। রাজা চেয়ে রয়েছে বউয়ের চোখের দিকে। চোখের ভাষায় প্রেম।

বউ বলল, সূর্যদেবতার নামে শপথ করুন রাজা, আমি যা চাইব আপনি তাই আমাকে দেবেন। বলুন, দেবেন তো?

রাজা মাথা নেড়ে সায় দিল। বউকে অদেয় তার কিছুই নেই। বউ বলল, দরজার পাশের দুটো গাছকে কেটে ফেলতে আদেশ দিন। ওখানে বসানো হবে কাঠের সুন্দর ফলক।

রাজা আদেশ দিল। ভৃত্যরা গাছ কাটতে লাগল। পাশে দাঁড়িয়ে বউ গাছ-কাটা দেখতে লাগল। মুখে তার মোহিনী হাসি। হঠাৎ কুঠারের আঘাতে গাছের এক চিল্‌তে কাঠ এসে বউয়ের মুখের মধ্যে ঢুকে গেল। বউ গর্ভবতী হল। একদিন জন্মাল এক পুত্রসন্তান। বউয়ের প্রথম সন্তান হল।

সবাই গিয়ে ফারাওকে জানাল, আপনার পুত্র হয়েছে। আনন্দ বয়ে গেল চারিদিকে। ধাত্রীর ওপরে ছেলের দায়িত্ব দেওয়া হল। উৎসব চলল অনেকদিন ধরে। ফারাও-এর প্রথম সন্তান। কিন্তু আসলে এই সন্তান বাটু ছাড়া আর কেউ নয়।

ছেলের একটা নাম রাখা হল। বাটু হলেও ছেলে ফারাও-এর ছেলে হিসেবেই বড় হতে লাগল। বড় হয়ে সে হল ফারাও-এর প্রতিনিধি। দেশের রাজপুত্র। ফারাও-এর প্রতিনিধি হিসেবে অনেক কাল কেটে গেল। তারপর একদিন বৃদ্ধ ফারাও মারা গেল। ছেলে হল নতুন ফারাও। বাটু হল ফারাও।

একদিন ফারাও বলল, আমি এখন এই দেশের রাজা। আমি সবাইকে ডেকে সত্য প্রকাশ করে দেব। আমার কথাও বলব, বলব রানির কথাও।

সবাই এল। রানিও এল। ফারাও বউকে বলল, আমি বাটু, তুমি নানা সময়ে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। কিন্তু পারনি। আমি আজও জীবিত। ফারাও হয়ে বেঁচে রয়েছি।

ফারাও 'মাকে' হত্যা করার আদেশ দিল। বিশ্বাসঘাতিনীকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। বউ মরে গেল।

বাটু গ্রাম থেকে দাদাকে ডেকে আনল। আনুপ হল গোটা রাজ্যের রাজা। সে হল মিশরের রাজা। তিরিশ বছর পরে আনুপ মারা গেল। তারপরে রাজা হল বাটু। ফারাও বাটু।

'দুই ভাইয়ের গল্পের' মধ্যে সেইকালের মিশরের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির অনেক আভাস পাওয়া যায়। গ্রামের মানুষ ছিল কৃষিজীবী, তারা নিজেরাই চাষ করত, আবার জমিতে বাড়তি লোক নিয়োগ করত। ষাঁড় ছিল পবিত্র পশু, কৃষিজীবনের ব্যাপক প্রভাব ছিল বলেই ষাঁড়কে পয়মন্ত জ্ঞান করা হত। নৈতিক মূল্যবোধ বেশ দৃঢ় ছিল, অন্তত কৃষিজীবীদের মধ্যে। বউদি রমণের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও ছোট ভাই ঘৃণায় তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আবার কামনায় জর্জরিত হয়ে নারী স্বামীর কাছে মিথ্যা অভিযোগও করেছে। এ যেন আজকের মানুষের প্রতিচ্ছবি। মানুষের মনের এই অন্ধকার দিকটি সেকালেও সক্রিয় ছিল, যেমন সক্রিয় ছিল বাটুর নৈতিকতা। সামন্তপ্রভু ইচ্ছা করলেই লোকবলের দ্বারা অন্য বিবাহিতা নারীকেও নিজের করে নিতে পারত। দুর্বল মানুষের প্রতিবাদের উপায় ছিল না। একটি দার্শনিক বক্তব্যও প্রকাশ পেয়েছে— যেমনভাবে সত্য বেঁচে থাকে। সেকালের সামাজিক অবস্থায়ও মানুষ সত্য সম্পর্কে এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিস্ময়কর উপলব্ধি। মানুষের দেহ থেকে হৃদয় বা আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার যে আদিমতম বিশ্বাস তা সেকালের মিশরীয় সমাজেও প্রচলিত ছিল। মানুষ নিজের দেহের পরিবর্তন ঘটাতে পারে— এই পৌরাণিক বিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে এই

গল্পে। সত্যি কথা বলতে কী, সাড়ে তিন হাজার বছর আগে লেখা এই লোককথার মধ্যে আধুনিক ছোটগল্পের মানসিকতার এক আশ্চর্য মিল রয়েছে।

ইউরোপে আধুনিক কালে দুই ভাইয়ের যে লোককথা সংগৃহীত হয়েছে তার সঙ্গে মিশরীয় এই লোককথাটির মনোভঙ্গির মিল রয়েছে। মূল কাহিনি অংশে তেমন মিল নেই, হয়তো বা প্রত্যক্ষ কোনো যোগসূত্রও নেই। তবু সাদৃশ্য কিছুটা বিস্ময়কর। এশিয়ার বিভিন্ন অংশেও এই ধরনের লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। লোকসংস্কৃতিবিদ সি. ডাবলিউ. ফন সাইডো মনে করেন, হয়তো আদিতে কোনো একটি ইন্দো-ইউরোপীয় লোকপুরাণ ছিল যা নানাভাবে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আদিরূপে বিকৃতি বা বিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তাই কালের বিবর্তনে কাহিনিও বিবর্তিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু গল্পের কাঠামোতে ভিন্নতা থাকলেও অধিকাংশ মোটিফে হুবহু মিল রয়েছে। এই ধরনের লোককথায় আমরা এই মোটিফগুলো পাচ্ছি: কথা-বলা গোরুর কাছ থেকে উপদেশ বি ২১১, বাধা অতিক্রম ডি ৬৭২, বিচ্ছিন্ন হৃদয় ই৭১০, অশুভ ভবিষ্যৎবাণী এম ৩৪০, অদেখা নারীর কেশগুচ্ছ দেখে প্রেমে পড়া টি ১১. ৪. ১, স্বামীর গোপন বিষয়ে স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা কে ২২১৩.৪, উপচে পড়া মদের পাত্র ই৭৬১.৬.৪, হৃদয়কে পুনর্জীবিত করা ই ৩০, বারবার শরীর গ্রহণ ই৬৭০, নিজের দেহকে পালটে ফেলে আবার জন্মানো ই৬০৭.২, কথা-বলা পশু বি২১০।

লোকসংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে এই লোককথাটি নানা দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, খ্রিস্ট জন্মের প্রায় তেরোশো বছর আগের একটি লোককথায় এতগুলি মোটিফের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

এর পরবর্তীকালের আরও অনেক লোককথা লিখিত আকারে আবিষ্কৃত হয়েছে। সবই প্যাপিরাসের ওপরে লিখিত। এই সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে কিছু পশুকথা ও নীতিকথা। কিছু পশুকথার সঙ্গে গ্রিসের ঈশপের গল্পগুলোর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। অনেকে বিশ্বাস করেন, ঈশপের লেখা গল্পগুলোর সঙ্গে লোক-ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই, সেগুলি ঈশপের নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু প্যাপিরাসের ওপরে উৎকীর্ণ পশুকথাগুলি আবিষ্কৃত হবার পরে একথা আর তেমন জোর দিয়ে বলা যায় না। লৌকিক কোনো ঐতিহ্যের পথ বেয়ে সেগুলো নিশ্চয়ই ঈশপের কাছে পৌঁছেছিল।

গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরীয় অনেক লোককথা শুনে তা লিপিবদ্ধ করে যান। তিনি ৪৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এশিয়া মাইনরে জন্মেছিলেন। সেই সময় সেই অঞ্চলে শুরু হয় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, তাই অল্প বয়সেই অঞ্চল ছেড়ে চলে যান। মরুভূমি পেরিয়ে যান ব্যাবিলনে, তারপরে নীল নদের অববাহিকায় মিশরে, শেষপর্যন্ত কৃষ্ণসাগর পেরিয়ে পৌঁছলেন গ্রিসে। এর আগে গ্রিসের কোনো মানুষ এত বিচিত্র পথ অতিক্রম করেননি, অন্তত লিখিত কোনো নথিপত্র নেই। পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিচিত্র মানুষজন, বিচিত্র লোকাচার-ঐতিহ্য দেখেই তিনি লোকসমাজ সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। 'পারস্য যুদ্ধের ইতিহাস'ই তিনি শুধু লেখেননি, ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস প্রাচীন মিশরের অনেক লোককথাও লিপিবদ্ধ করে যান। হেরোডোটাসের 'পারস্য যুদ্ধের ইতিহাস' আধুনিক অর্থে পুরোপুরি ইতিহাস নয়। এটা ইতিহাস-ভূগোল-নৃকুলবিদ্যা এবং লোকসংস্কৃতির মিশ্রিত রূপ। তিনি যেসব লোককথা ও বীরকথা লিপিবদ্ধ করেন তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল 'রাম্‌প্‌সিনিটাসের রত্নগৃহ'। তিনি মারা যান ৪২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এ গল্প দু'হাজার চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে লিখিতরূপে বেঁচে রয়েছে তাঁরই প্রচেষ্টায়।

প্রাচীন মিশরে লোককথা বিষয়ে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষ করে মিথ বা লোকপুরাণ প্রসঙ্গে। 'জাহাজডোবা মানুষ' ও 'দুই ভাইয়ের গল্পে'র সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় আরও দু-একটি প্রসঙ্গ।

'প্যাপিরাস ওয়েস্টকার'-এ উল্লেখ রয়েছে 'রাজা খুফু ও জাদুকর'-এর গল্প। সেখানে রয়েছে রাজার সভায় একজন জাদুকরের অলৌকিক বিস্ময়কর ঘটনাবলি। 'রে' মন্দিরের একজন পূজারিনি অলৌকিকভাবে গর্ভবতী হবে, তার একই সঙ্গে তিনটি সন্তান হবে। দৈববাণী হল এই সন্তানরাই হবে ভবিষ্যতের রাজা। তিনজনই পরপর রাজা হবে। অনেক মিশরীয় ইতিহাস বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এই ধরনের উক্তি রাজসভার অভ্যন্তরের হিংসা-কলহ থেকে উদ্ভূত, একধরনের রাজনৈতিক প্রচার। এসব অনুমান সত্ত্বেও এই কাহিনির মধ্যে লোকপুরাণ ও রূপকথার অনেক মিশ্র উপাদান রয়েছে।

আর একটি লোকপুরাণ পাওয়া গিয়েছে। তার নাম 'অভিশপ্ত রাজপুত্রের কথা।' তার জন্মের আগে থেকেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছিল, এই রাজপুত্র

কুমির, সাপ কিংবা কুকুরের দ্বারা নিহত হবে। একই সঙ্গে বলা হয়েছিল, কোনো চেষ্টাতেই তার এই অপঘাতে মৃত্যু আটকানো যাবে না। এই লোকপুরাণের কাহিনি অন্যভাবে পরবর্তীকালেও বিবৃত হয়েছে।

আর একটি কাহিনি হল 'বাক্‌পটু কৃষক'। তার প্রখর বুদ্ধি ও সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলবার ফলে শেষকালে সেই কৃষক সত্যিকার ন্যায়বিচার পেয়েছিল। এই কাহিনিতে কোথাও অতিলৌকিকতা নেই। 'সিনুহের গল্প'টি মধ্য রাজত্বকালের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিল। এখানেও অলৌকিকতার স্থান নেই। এই 'সিনুহের গল্প'টি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিয়েছে।

সিনুহে একজন পলাতক ব্যক্তি, সে মিশরের রাজসভা থেকে পালায়। সীমান্তের সৈনিকদের চোখ এড়িয়ে প্যালেস্টাইনে পালিয়ে যায়, সেখানে কয়েক বছর বসবাস করে। সে থাকত বেদুইনদের সঙ্গে। এমনি করে তার বয়েস বেড়ে চলল। সে বুড়ো হয়ে গেল। সেই সময়ে সে প্রবলভাবে নিজের দেশের টান অনুভব করতে লাগল। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে সে সম্রাট ফারাওকে চিঠি লিখল। অনুরোধ করল, ফারাও যেন তাকে মার্জনা করেন। এতদিন পরে রাজসভার পুরনো বন্ধুর চিঠি পেয়ে ফারাও নরম হলেন। আহা! মানুষটি তো বুড়ো হয়েছে, আবার দেশের প্রতি টানও রয়েছে। দূতকে পাঠালেন, ফারাও তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। পলাতক নিশ্চিন্তে নিজের দেশে ফিরে এল। তাকে রাজসভায় সবাই আন্তরিকভাবে বরণ করে নিল। মধুর সমাপ্তি ঘটল।

প্রাচীন মিশরে যত লোককথা পাওয়া গিয়েছে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবই অসম্পূর্ণ। কাহিনির কার্যকারণ পরম্পরাও অনুধাবন করা যায় না। কিন্তু প্যাপিরাসের ওপরে যে যে অংশ পাওয়া গিয়েছে, তা যে সেকালের প্রচলিত লোককথা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লোককথাগুলির মর্ম-স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই তা বোঝা যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষ: রামায়ণ ও মহাভারত

প্রাচীন ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষীয় মানুষ ঐতিহ্যপ্রিয়, ঐতিহ্যকে মেনে চলতে তারা আগ্রহী। প্রথাগত জীবনাচরণ, সামাজিক বিধিনিষেধ এবং শাস্ত্রীয়-লৌকিক ধর্মাচরণের পরিপন্থী কোনো কিছুকে তেমন আমল দেয় না। কিন্তু এসব ইতিহাসের বিষয় লিপিবদ্ধ করবার কোনো প্রেরণা তারা অনুভব করেনি। শ্রুতিনির্ভরতা পরম্পরার প্রতি বিশ্বাস ছিল প্রবল। বেদও ছিল শ্রুতিনির্ভর প্রাচীনতম সনাতন ধর্মের শাস্ত্র।

এই মানসিকতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে লিখিত ঐতিহ্যের ইতিহাসও কিন্তু সুপ্রাচীনকালের। বেদ শ্রুতিনির্ভর হলেও তাও একসময় লিখিত হল। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব যুগে বেদের আবির্ভাব ঘটে। অনেকে বলেন, এর চেয়ে পুরনো কালের ঘটনা। সবচেয়ে প্রাচীন যে বেদ অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ লিখিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের মধ্যে।

তাই ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের লিখিত ঐতিহ্যের গর্ব করবার মতো প্রাচীনতা রয়েছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো অনেকদিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার করা যায়নি। প্রাক্-বৈদিক এই সিন্ধু-সভ্যতার যে সমস্ত খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার অনুমান-নির্ভর অর্থোদ্ধারের চেষ্টা অনেকেই করেছেন। কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পাঠ আজও স্বীকৃত হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দের হরপ্পার দীর্ঘতম লিপিমালার পাঠোদ্ধার করেছেন ফাদার হেরাস। কিন্তু সে পাঠকে পণ্ডিতজনেরা মেনে নেননি। সেই পাঠে কিছু যুক্তি থাকলেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। এইসব লিপির সঠিক পাঠোদ্ধার না হলে জানা যাবে না, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয় কোনো লোককথা লিপিবদ্ধ রয়েছে কি না। মিশরীয় লিপির অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়েছে বলেই প্রাচীন মিশরীয় লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার সময়কালের কোনো লোককথা উৎকীর্ণ রয়েছে কি না তার জন্য কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!

প্রাচীন ভারতবর্ষের লোককথার সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন হল জাতক, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথামঞ্জরী, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর ও পিলপের নীতিকথা। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ও পিলপের নীতিকথা নির্ভেজাল লোককথার সংকলন। কিন্তু জাতক গ্রন্থের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। যদিও প্রাসঙ্গিকভাবে অসংখ্য লোককথা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অন্য তিনটি গ্রন্থের মতো জাতক শুধুই লোককথার সংকলন-গ্রন্থ নয়।

এই সব গ্রন্থ ছাড়া লোককথার অন্য কোনো লিখিত উৎস কি প্রাচীন ভারতবর্ষে রয়েছে? প্রত্যক্ষ উৎস নেই ঠিকই, কিন্তু আমাদের প্রাচীনতম দুটি মহাকাব্য থেকে লোকঐতিহ্যের এই বিষয়টির উৎস সন্ধান করতে হবে। আর এ বিষয়ে দুটি মহাকাব্যেই রয়েছে অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রামায়ণ মহাকাব্য: উৎসসন্ধানে

প্রাচীন ভারতবর্ষের আদি মহাকাব্য রামায়ণ ভারতব্যাপী লোকসমাজের মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত অসংখ্য কাহিনির লিখিত রূপ। আদিকবি বাল্মীকি যখন বিশেষ নির্দেশে রামকথা রচনা করতে প্রয়াসী হলেন, তখন

তিনিও এই 'প্রাচীন বৃত্তান্তের' সংকলন প্রসঙ্গে বিশদভাবে জানিয়েছেন। বাল্মীকির এই সত্যভাষণ পৃথিবীর মহাকাব্যিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় আঞ্চলিক রামকথা সংকলিত হয়েছে, ভারতীয় নানা ভাষায় আঞ্চলিক কবি রামকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব আঞ্চলিক রামায়ণের সঙ্গে সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনির হুবহু মিল নেই। সকলেই সংস্কৃত রামায়ণের অনুসরণ করেননি। রামায়ণের যে লৌকিক ভিত্তি রয়েছে, এইসব রামকথাই তার প্রমাণ।

আদি রামায়ণে লৌকিক উৎসের যে সন্ধান পাওয়া যায় তার পরিচয় জানা অত্যন্ত জরুরি।

ভারতবর্ষের আদি লিখিত মহাকাব্য রামায়ণের মূল ভিত্তিই হল লৌকিক কাহিনি। সুতরাং রামায়ণের সমস্ত অবয়ব জুড়েই রয়েছে লোক-উপাখ্যান। রামায়ণ রচনার কাল নিয়ে মতবিরোধের অবসান আজও ঘটেনি। তবু একথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, বাল্মীকি কোনোমতেই চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পরবর্তীকালের মানুষ নন। অর্থাৎ রামায়ণ রচিত হয়েছিল ৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ সময়কালে। তার আগেও হতে পারে, কিন্তু কখনোই পরবর্তীকালে নয়। তবে, অনেকে অনুমান করেন, ২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রামায়ণে অনেক পরিবর্তন ঘটে। মূল কাব্যাংশ বাল্মীকির সৃষ্টি হলেও বহু কবি বা কথক কালে কালে কাব্যের অনেক পরিবর্তন ঘটান।

মহর্ষি বাল্মীকি সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথক ও চারণকবি নারদের কাছে প্রথম বিস্তৃতভাবে গুণবান বিদ্বান মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী কৃতজ্ঞ দৃঢ়ব্রত ও সৎচরিত্র রামচন্দ্রের কথা শোনেন। অর্থাৎ চারণকবি আদিকবিকে রামচন্দ্রের যে জীবনবৃত্তান্ত শোনালেন তা রামায়ণ রচনার আগেই লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। রামচন্দ্রকে নিয়ে প্রথমেই কাব্য রচনার কোনো অভিপ্রায় বাল্মীকির ছিল না। তিনি একজন গুণসম্পন্ন মানুষের কথা শুনতেই কৌতূহলী ছিলেন। যেকালে মানুষের মনোজগতে দেবতাদের স্থায়ী আসন পাতা ছিল, সেইকালে বাল্মীকি রচনা করলেন একজন মানুষের কাহিনি, যাঁকে দেখে দেবতারাও ভীত হন। পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য রচিত হল মানুষকে নিয়ে, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি একটি গর্ব করবার মতো বিষয়।

বাল্মীকির কৌতূহল নিবৃত্ত করতে ত্রিলোকদর্শী মহর্ষি নারদ পুলকিত মনে বললেন, তাপস! তুমি যে সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করলে সেসব গুণ

সামান্য মানুষের মধ্যে নিতান্ত সুলভ নয়। যাই হোক, এরকম গুণবান মানুষ এই পৃথিবীতে কে আছেন, এখন আমি তা স্মরণ করে বলছি, শ্রবণ কর।

এই মানুষটি হলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবিখ্যাত নরপতি রামচন্দ্র। নারদ সংক্ষেপে রামকথা বিবৃত করলেন। রামচন্দ্রের জন্ম থেকে ব্রহ্মলোকে গমন পর্যন্ত জীবনকথা শোনালেন। এই কাহিনির বিস্তৃত কাব্যময় রূপটিই বাল্মীকি প্রকাশ করলেন তাঁর মহৎ রামায়ণ মহাকাব্যে। অর্থাৎ, বাল্মীকির কাব্যের উপাদান ও কাহিনিটি মৌলিক নয়, লোকসমাজের কাহিনি বাল্মীকির সৃষ্টি-প্রতিভায় নতুন রূপে বিকশিত হল।

নারদের কাছে রামকথা শুনে বাল্মীকি অল্পক্ষণ আশ্রমে অবস্থান করে ভাগীরথীর কাছে স্রোতস্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হলেন। তিনি নদীর অবতরণপ্রদেশ কর্দমশূন্য দেখে শিষ্য ভরদ্বাজকে বললেন, বৎস! দেখ, এই তীর্থ কেমন রমণীয় ও স্বচ্ছ, আমাকে বল্কল দাও, আমি এই নদীতে স্নান করব। বল্কল নিয়ে মুনি তীরবর্তী নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করতে করতে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন।

সেই বনের মধ্যে এক ক্রৌঞ্চমিথুন মধুর সুরে গান গেয়ে সুস্থ শরীরে বিহার করছিল। এই অবসরে অকারণ-বৈরী পাপমতি এক ব্যাধ এসে হঠাৎ ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করল। তখন ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিতলিপ্ত দেখে এবং সেই তাম্র-শীর্ষ কামোন্মত্ত আয়ত-পক্ষ সহচরের সঙ্গে চিরবিরহ জ্ঞান করে কাতরস্বরে কাঁদতে লাগল। ধর্মপরায়ণ বাল্মীকি সম্ভোগ-প্রবৃত্ত বিহঙ্গকে নিহত দেখে বিষাদমগ্ন হলেন। ক্রৌঞ্চীর করুণ কান্নায় তাঁর অন্তরে দয়ার সঞ্চার হল। তখন তিনি বললেন, রে নিষাদ! তুই ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করেছিস, তুই কোনো কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবি না।

মুনি নিষাদকে এই অভিশাপ দিয়ে বারবার চিন্তা করতে লাগলেন, আমি এই বিহঙ্গীর শোকে আকুল হয়ে কী বললাম! তারপর শিষ্যকে বললেন, আমার এই বাক্য চরণবদ্ধ অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করবার সম্যক উপযুক্ত হয়েছে, অতএব এ যখন আমার শোকাবেগ-প্রভাবে কণ্ঠ থেকে নির্গত হল তখন এ নিশ্চয়ই শ্লোকরূপে প্রথিত হবে। ভরদ্বাজ গুরুদেবের বাক্য অনুমোদন করলেন।

তারপরে তমসায় স্নান করে শ্লোকের কথা চিন্তা করতে করতে তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন।

ধর্মজ্ঞ ঋষি বাল্মীকি নিজের আশ্রমে এসে শিষ্যদের সঙ্গে বসে শ্লোকের বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন, এমন সময় মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা সেখানে এলেন। ব্রহ্মা আশ্রমে বসে যে উপদেশ বাল্মীকিকে দিলেন তাতে রামকথার লৌকিক উৎসের বিষয়টি স্পষ্টতর হল।

ব্রহ্মা বললেন, তপোধন! তোমার কণ্ঠ থেকে যে বাক্য নিঃসৃত হয়েছে, তা শ্লোক বলেই বিখ্যাত হবে। এ বিষয়ে সংশয় করবার আর প্রয়োজন নেই। আমার সংকল্পপ্রভাবেই তোমার কণ্ঠ থেকে এই বাক্য নির্গত হয়েছে। অতএব তুমি এখন সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের কাছে যেমন শুনেছ, সেইভাবে ধর্মশীল গম্ভীরস্বভাব বুদ্ধিমান রামের এবং লক্ষ্মণ সীতা ও রাক্ষসদের 'বিদিত ও অবিদিত' সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন কর। 'নারদ যা বলেননি', রচনাকালে তাও তোমার স্ফূর্তি পাবে। তোমার এই কাব্যের কোনো অংশই মিথ্যা হবে না। অতএব তুমি এই রমণীয় রামচরিত শ্লোকবদ্ধ কর।

ব্রহ্মা বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন করতে আদেশ দিয়েছিলেন। বিদিত রামকথা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল আর অবিদিত বিষয়সমূহ বাল্মীকির মনের মাধুরী দিয়ে গড়া কল্পনানির্ভর কাব্যকথা।

এর পরেই রামায়ণে রয়েছে, বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের কাছে ত্রিবর্গসাধক হিতজনক সমগ্র রামচরিত শ্রবণ করে 'পুনরায়' সেই ধীমান রামের 'ইতিবৃত্ত' প্রকৃতরূপে জানতে ইচ্ছা করলেন এবং যোগবলে তা অনুসন্ধান করতে লাগলেন। নারদ কর্তৃক 'পূর্বকীর্তিত' রামচরিত রচনায় তখন আত্মনিয়োগ করলেন আদিকবি। 'যোগবল' শব্দটি ব্যবহার করা হলেও এটা কোনো অতিলৌকিক বিষয় নয়। কাব্যসৃষ্টিতে যে সাধনা প্রয়োজন, সৃষ্টির যন্ত্রণায় যে আত্মনিমগ্নতা প্রয়োজন, এখানে তাকেই যোগবল বলা হয়েছে। বিদিত পূর্বকীর্তিত পুনরায় প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই রামকথার উৎসের সন্ধান মিলছে। রামায়ণের মতো অনন্য মহাকাব্য সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার দীর্ঘকালের সাধনা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

নারদের বলা রামচরিত ছিল প্রতিমার খড়-কাঠ-মাটির কাঠামো, বাল্মীকির কাব্য হল অপরূপ জীবন্ত রূপলাবণ্যবতী মানবীরূপিণী রং-গর্জনতেলের আবরণে অনন্যা প্রতিমা। নারদ যা বলেননি সেকথা প্রকাশ করেছেন বলেই বাল্মীকির কাব্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তিনি যদি শুধু নারদের বলা কাহিনি বিবৃত

করতেন তবে তিনি হতেন সাধারণ লোক-সংগ্রাহক কিংবা চারণকবি। কল্পনাশক্তি, মাধুরী, স্বকীয়তা ও কবিমন ছিল বলেই তিনি হলেন মহাকবি। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর মহাকাব্যের কাহিনির আদি উৎস লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত কাহিনি।

বাল্মীকির রামকথা রচনা বিষয়ে আর একটি পৌরাণিক 'বৃত্তান্ত' রয়েছে। আদিকবি রামকথা রচনা করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু রামকথার বহু বৃত্তান্ত তিনি অবগত নন। আশ্রমে সাধনা করেই জীবনের বেশিরভাগ কাল কেটেছে। তাই তিনি শিষ্যদের বললেন, তোমরা ভারতভূমির চারিদিকে পরিভ্রমণ কর, যেখানে যেখানে রামকথা শুনবে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের ফিরে আসতে বললেন। শিষ্যেরা রামকথা সংগ্রহ করে একদিন ফিরে এল, কবি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে অপরূপ কাব্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করলেন। সৃষ্টি হল রামায়ণের কাব্যগাথা।

এই বৃত্তান্তে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ভারতভূমির নানা দিগন্তে লোকসমাজের মধ্যে রামকথা প্রচলিত ছিল। সেই লৌকিক রামকথা শুনে তাকে কাব্যময় ভাষায় নতুনভাবে রূপ দিলেন আদিকবি।

রামায়ণে রামের যে জীবন কবি অঙ্কিত করলেন, সেই জীবনকাল অনেক কাল আগেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে এই ইঙ্গিত রয়েছে কাব্যের মধ্যেই। রামকথা আগে থেকেই সকলে জানতেন, বাল্মীকি তাকে 'সংকলন' করে কাব্যরূপ দিয়েছেন একথাও জানানো আছে কাব্যের মধ্যেই।

একদিন মহাভাগ মহাত্মা কুশ ও লব সভামধ্যে সমবেত বিশুদ্ধস্বভাব ঋষিগণের সামনে এই মহাকাব্য গান করতে লাগলেন। বাল্মীকিই এই দুই ভাইকে রামায়ণ গান শিখিয়েছিলেন। এই সংগীত শুনে সকলেই প্রীত ও বিস্মিত হলেন। তারা গানের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, আহা! গানের কী মাধুরী! শ্লোকগুলোও কী মনোহারী হয়েছে! 'বহুকাল হল রামের এসব কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে', তবু অধুনা যেন সেসব প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হচ্ছে।

সত্যবাদী ঋষিগণ কুশ ও লবকে আশীর্বাদ করে বললেন, মহাত্মা বাল্মীকি যথাক্রমে যে উপাখ্যান 'সংকলন' করেছেন, তা অতি চমৎকার হয়েছে এবং প্রবন্ধ-রচনা বিষয়ে এ কবিগণের একমাত্র অবলম্বন হবে।

আগে থেকেই রামকথা প্রচলিত না থাকলে শিক্ষিত বিদগ্ধ ঋষিরা কখনই উপাখ্যানটিকে 'সংকলন' বলতেন না।

রামায়ণের কাহিনিটি যদি মৌলিক হত, মহাকবির একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি হত তবে মহাভারত ও জাতকে তার উল্লেখ এমনভাবে থাকত না। আসলে লৌকিক উৎস থেকেই নিরপেক্ষভাবে তিনটি প্রাচীন সাহিত্যে রামকথা স্থান পেয়েছে। মহাভারতকার রামকথা বিবৃত করবার সময় কোথাও বাল্মীকির উল্লেখ করেননি। কেননা, তিনি যে রামকথা শুনিয়েছেন তা সংগ্রহ করেছিলেন লৌকিক ঐতিহ্য থেকে।

শান্তিপর্বের একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়ে দশরথতনয় রামচন্দ্রের বিবরণ রয়েছে এইভাবে: দশরথতনয় রামচন্দ্রকে দেহত্যাগ করতে হয়েছে। ওই মহাত্মা নিয়ত পুত্রের ন্যায় প্রজাদের প্রতিপালন করতেন। তাঁর রাজত্বসময়ে কোনো কামিনীই বিধবা বা অনাথ ছিল না। মেঘ সময়মতো বারিবর্ষণ করাতে তাঁর রাজ্যে প্রচুর ফসল হত, কখনই দুর্ভিক্ষ হয়নি। অকালমৃত্যু অগ্নিদাহ বা রোগভয়ের সম্পর্কও ছিল না, প্রজারা ছেলেপুলে নিয়ে হাজার বছর পর্যন্ত সুস্থদেহে বেঁচে থাকত। ওই সময় সকলেই কর্মপটু ছিলেন। পুরুষদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ দূরে থাক, কামিনীদের মধ্যেও কখনও বিবাদ হত না। প্রজারা সকলেই ধার্মিক সন্তুষ্টচিত্ত নির্ভীক ও স্বেচ্ছাচারী ছিল। গাছে সবসময় ফলফুল ধরে থাকত। সব গাভীরই কলস-ভর্তি দুধ হত। মহাতপা রামচন্দ্র চোদ্দো বছর বনে বাস ও অবাধে ত্রিগুণ দক্ষিণাযুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ওই মহাত্মা শ্যামাঙ্গ লোহিত নেত্র আজানুলম্বিতবাহু সিংহস্কন্ধ ও সুন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন এবং মাতঙ্গতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি অযোধ্যার অধিপতি হয়ে একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য প্রতিপালন করেন।

আবার বনপর্বের অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ে রামকথার বিবরণ রয়েছে। হনুমান ভীমসেনকে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, আমাকে জানবার জন্য তোমার খুব কৌতূহল হয়েছে। অতএব আমার সমুদয় বৃত্তান্ত বলছি। আমি কেশরীর ক্ষেত্রে জগৎপ্রাণ বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার নাম হনুমান। অনেক কাল আগে বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে আমার প্রণয় জন্মেছিল। সুগ্রীব কোনো কারণে নিজের ভাই বালীর কাছে অপমানিত হয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে আমার সঙ্গে বহুদিন বাস করেছিলেন। তখন বিষ্ণু মানুষরূপে দশরথের ঔরসে জন্ম নিয়ে রাম নামে বিখ্যাত হলেন। পরে

রামচন্দ্র পিতার প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য স্ত্রী ও অনুজ লক্ষ্মণকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করছিলেন। তখন রাক্ষসরাজ মহাবল-পরাক্রান্ত দুরাত্মা রাবণ সোনার হরিণরূপধারী মারীচ নিশাচর দ্বারা রামকে বঞ্চনা করে ছলনা করে জনস্থান থেকে তাঁর স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করে।

এইভাবে মহাত্মা রামের পত্নী অপহৃতা হলে তিনি ভাইকে নিয়ে সীতার অন্বেষণ করতে করতে পাহাড়ে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখতে পেলেন। রামের সঙ্গে সুগ্রীবের বন্ধুত্ব হল। তিনি বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। রাজ্য পেয়ে সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের জন্য হাজার হাজার বানর পাঠালেন। তখন আমি কোটি কোটি বানরে পরিবৃত হয়ে দক্ষিণ দিকে গেলাম।

পথের মধ্যে পক্ষিবর সম্পাতির সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, সীতা রাবণের নিকেতনে আছেন। সম্পাতির মুখে সীতার খবর পেয়ে শতযোজন বিস্তীর্ণ সাগর পেরিয়ে রাবণ-নিকেতনে গিয়ে জনকদুহিতা সীতাকে দেখতে পেলাম। পরে প্রাসাদ প্রাকার ও তোরণে বিভূষিত সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করে আবার রামের কাছে ফিরে এলাম।

আমার কথা শুনে রাম বুদ্ধি করে সমুদ্রে সেতুবন্ধ করে বহু বানর নিয়ে সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় গেলেন। সেখানে রাবণ তার ভাই পুত্র ও বন্ধুদের হত্যা করে রামচন্দ্র নিজের ভক্ত পবমধার্মিক অনুগতবৎসল বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তারপরে রাম পত্নীকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। তখন আমি রামের কাছে বর প্রার্থনা করে বললাম, হে শত্রুসূদন রাম! এই সংসারে যতকাল আপনার কথা বর্তমান থাকবে, ততদিন আমি জীবিত থাকব। রাজীবলোচন রাম 'তথাস্তু' বলে আমাকে সেই বর দিলেন। সীতার প্রসাদে এই স্থানে আমার ইচ্ছানুসারে নানাবিধ দিব্য-ভোগসমুদয় উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র দশ সহস্র ও দশ শত বর্ষ রাজ্য প্রতিপালন করে স্বস্থানে গমনী করেছেন। অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ এই স্থানে সেই রামের চরিত্র গান করে আমাকে আনন্দ দেয়।

রামায়ণ মহাকাব্য কবিকল্পনার সৃষ্টি, কিন্তু কাহিনিটি আদৌ কবির কল্পনা নয়, লোকসমাজের মেঠো কাহিনি থেকে সংকলন করা। রামায়ণ মহাকাব্য থেকে কথকের মুখেমুখে এ কাহিনি প্রচারিত হলে রামকথা একইভাবে শুনতে পাওয়া যেত। কিন্তু ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেসব বামকথা শোনা যায় তা বাল্মীকির রামায়ণ-কাহিনি থেকে যেমন অন্যরকম, তেমনি

আবার লোকসমাজের এক অংশের কাহিনি বা জনশ্রুতির সঙ্গে অন্য অংশের কাহিনির তেমন মিল নেই।

রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন, "রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহেই প্রচলিত ছিল। রামচরিত সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"

আদিকবি বাল্মীকি সংস্কৃত রামায়ণে যেভাবে ভারতব্যাপী লৌকিক রামকথার ব্যাপ্ত প্রাচীন জনপ্রিয়তার কথা বলেছেন এবং সেসবের ওপর নির্ভর করেই রামকথা রচনা করেছেন, সেইসব অকপট স্বীকারোক্তি থেকেই রামায়ণের কাহিনির উৎসে যে লৌকিক উপাদান রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

রামায়ণ মহাকাব্য: লোককথার উপাদান

রামায়ণের মধ্যে এমন অনেক কাহিনি রয়েছে যা লোককথার আদলে বর্ণিত হয়েছে। লৌকিক উপাদানগুলো সরাসরি কাব্যের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপাদানগুলো কোনোভাবেই উচ্চতর সাহিত্যের বিষয় নয়। কিন্তু লৌকিক রামকথাকে আশ্রয় করে মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে মহাকবি কিছু লোক-ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য কাঠামোতে লৌকিক ধারণা থাকলেও কবিকল্পনার জাদুস্পর্শে সে কাহিনিও কিছুটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উৎস-রূপটি খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টকর নয়।

রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের জন্ম-বৃত্তান্তের মধ্যে লোককথার একটি অতি-পরিচিত বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পাপহর স্বর্গপ্রদ অন্যের অসাধ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ, পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, যজ্ঞীয় হুতাশন থেকে মহাবীর্য মহাবল এক মহাপুরুষের আবির্ভাব, ভগবান বিষ্ণুর দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার প্রভৃতি পুরাণকথা উচ্চতর কাব্যের বিষয়। কিন্তু এইসব গুরুগম্ভীর বিষয়ের আড়ালে লৌকিক বিষয়টি কিন্তু একেবারে হারিয়ে যায়নি।

তখন সেই পুরুষ দশরথকে বললেন, মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করে আজ এই পায়েস পেলেন। এখন এই পায়েস স্ত্রীদের খেতে দিন। রাজা দশরথ সেই পাত্র প্রীতমনে গ্রহণ করলেন এবং দরিদ্রের অর্থ লাভের মতো এই দৈব পায়েস পেয়ে খুব খুশি হলেন। পুরুষটি তাঁর কাজ শেষ করে আবার আগুনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

শরৎকালে চাঁদের আলোয় আকাশ যেমন আলোকিত হয়ে ওঠে, রাজা দশরথের স্ত্রীদের মুখকমলও তেমনি সুশোভিত হতে লাগল। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে কৌশল্যাকে বললেন, প্রিয়ে! তুমি সন্তান কামনায় এই পায়েস নাও। এই বলে দশরথ তাকে অমৃততুল্য সেই পায়েসের অর্ধেকটা দিলেন। তারপর কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে তার পায়েসের অর্ধেকটা দিলেন, তারপর যে অর্ধাংশ অবশিষ্ট থাকল, রাজা তা কৈকেয়ীকে দিয়ে সুমিত্রাকে তারও অর্ধাংশ দিতে অনুরোধ করলেন। তারপর সেই পায়েস খেয়ে তারা অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হলেন। তারপর ছয় ঋতু অতীত ও বারো মাস পূর্ণ হলে তিন রানির খুব সুন্দর চারটে ছেলে হল।

পায়েস, গাছের শেকড় খেয়ে রানিদের ছেলে হওয়ার অসংখ্য লোককথা ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে। বিশেষ করে ভারতে এই লৌকিক মোটিফটি খুবই জনপ্রিয়। ভারতীয় আদিবাসীদের অনেক লোককথায় গাছের শেকড়-বাটা খেয়ে গর্ভবতী হওয়ার কথা রয়েছে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'কলাবতী রাজকন্যা' রূপকথার কথা মনে পড়বে।

"একদিন রাণীরা নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে, বড়রাণীর হাতে একটি গাছের শিকড় দিয়া বলিলেন,— এইটি বাটিয়া সাত রাণীতে খাইও, সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।

পাঁচ রাণী পাকশালে রহিলেন, ন-রাণী কুয়োর পাড়ে গেলেন, ছোটরাণী পাঁশগাদার পাশে মাছ কুটিতে বসিলেন।

সন্ন্যাসীর শিকড়টি বড়রাণীর কাছে। বড়রাণী দুয়োরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, বোন, তুই বাটনা বাটবি, শিকড়টি আগে বাটিয়া দে না, সকলে একটু একটু খাই।

দুয়োরাণী শিকড় বাটিতে বাটিতে কতটুকু নিজে খাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর, রূপার থালে সোনার বাটি দিয়া ঢাকিয়া, বড়রাণীর কাছে দিলেন।

বড়রাণী ঢাকনা খুলিতেই আর কতকটা খাইয়া মেজরাণীর হাতে দিলেন। মেজরাণী খনিকটা খাইয়া, সেজরাণীকে দিলেন। সেজরাণী কিছু খাইয়া, কনেরাণীকে দিলেন। কনেরাণী বাকীটুকু খাইয়া ফেলিলেন। ন-রাণী এসে দেখেন, বাটিতে একটু তলানী পড়িয়া আছে! তিনি তাহাই খাইলেন। ছোটরাণীর জন্য আর কিছুই রহিল না।

দশ মাস দশ দিন যায়, পাঁচ রাণীর পাঁচ ছেলে হইল। এক এক ছেলে যেন সোনার চাঁদ।"

ভারতীয় লোককথায় একটি মোটিফের দেখা মিলেছে অসংখ্যবার। কোনো রাজা বা সর্দার না জেনে কোনো অপরাধ করে বসেন। এই অপরাধের জন্য তিনি শাপগ্রস্ত হন। কিন্তু যে বিষয়ে তাকে শাপ দেওয়া হল, সেটাই তার জীবনে অনুপস্থিত। কিন্তু যিনি শাপ দিলেন, তার কথা তো ব্যর্থ হবার নয়! তাই এসব ক্ষেত্রে সেই শাপগ্রস্ত মানুষটি আপাতত লাভবান হন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকেও দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই মোটিফটির সন্ধান মিলেছে রামায়ণের অন্ধমুনির উপাখ্যানে। এই উপাখ্যানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, লোককথার সমস্ত রূপরীতি নিয়েই এটি রামায়ণে সংকলিত হয়েছে এবং নিপুণভাবে মূল কাহিনির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছে। এখানেই আদিকবির বিশিষ্টতা।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্রিষষ্টিতম সর্গে দশরথ এই অভিশাপের কথা ব্যক্ত করেন। রাম বনবাসে চলে গিয়েছেন, তিনি শোকে মৃতপ্রায়। সেই মুহূর্তে যৌবনকালের সেই অপরাধের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি শোকাকুলা কৌশল্যাকে বললেন:

আমি তখন কুমার, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করি। সেই সময় শব্দমাত্র শুনে লক্ষ্যভেদ করতে পারতাম। এই জন্য লোকে আমাকে শব্দবেধী বলত। সেই সময়ে আমি এই পাপের কাজ করি। আমার এই যে দুঃখ, তা নিজের কর্মদোষে। যেমন কেউ না জেনে পলাশ ফুলে মোহিত হয়, আমি তেমনি না জেনেই শব্দ শুনে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে শিখেছিলাম। আমি তখন যুবরাজ। বর্ষাকাল এল। চলে গেলাম সরযূতীরে। চারিদিকে অন্ধকার। ওই অদৃশ্য সরযূর জলের মধ্যে হাতির গলার আওয়াজের মতো কলসিতে জল ভরার শব্দ শুনলাম। সেই শব্দ শুনে আমার মনে হল, এটা নিশ্চয়ই হাতি। তাকে বধ করতে আমি শব্দ লক্ষ্য করে তির ছুড়লাম। তির ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে

একজন বনবাসীর হাহাকার স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তিনি আমার তিরে আহত হয়ে জলে পড়ে গিয়ে বললেন, আমি একজন তাপস, আমার দিকে কে তির ছুড়ল? আমি রাতে নদীতে জল নিতে এসেছিলাম, এ সময় কে আমাকে আঘাত করল? আমি তার কী অপকার করেছি? আমি বনের মধ্যে ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করি, অন্যের কষ্ট হয় এমন কোনো কাজ আমি করি না। আমার মাথায় জটা, পরনে বল্কল আর চামড়া। আমাকে বধ করতে কার ইচ্ছে হল? আমি কী ক্ষতি করেছিলাম? প্রাণনাশ হল বলে আমি অনুতাপ করি না, কিন্তু আমার প্রাণ গেলে বুড়ো বাবা-মায়ের কী দুর্দশা হবে সেই কথা চিন্তা করেই দুঃখ হচ্ছে।

রাত্রে মুনিকুমারের সেই করুণ কথা শুনে আমার হাত থেকে তিরধনুক পড়ে গেল। আমি শোকে ও ভয়ে বিমোহিত হলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তাপস তিরের আঘাতে মাটিতে শুয়ে রয়েছেন। পাশে জলের কলসি।

তাপস বললেন, আমি তোমার কোনো অপকার করিনি। তুমি আমাকে তিরে বিদ্ধ করে আমার অন্ধ বাবা-মাকেও হত্যা করলে। তারা দুর্বল অন্ধ। পিপাসায় কাতর হয়ে তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। যাই হোক, তুমি গিয়ে সব কথা আমার বাবাকে বলবে। এখন তুমি আমার বুক থেকে তিরটা তুলে নাও।

আমি তির বের করলাম। তিনি ভীত হয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপরে তার দেহ নিথর হয়ে গেল। আমি জলভরা কলসি নিয়ে আশ্রমে গেলাম। আমার পায়ের শব্দ শুনে মুনি বললেন, বৎস! তোমার এত দেরি হল কেন? তাড়াতাড়ি জল দাও। তোমার মা খুব চিন্তা করছেন। এত দেরি হল।

আমি ভয়ে ভয়ে কোনোরকমে বললাম, তপোধন! আমি আপনার পুত্র নই, আমি ক্ষত্রিয়বংশীয় দশরথ। আমি অতি ঘৃণ্য একটা কাজ করে ফেলেছি। নদীর জলে হাতি নেমেছে ভেবে আমি তির ছুড়েছিলাম। পরে নদীতীরে গিয়ে দেখলাম, একজন তাপসের বুকে সেই তির বিঁধেছে। আমি না জেনে আপনার পুত্রের প্রাণনাশ করেছি। যা হবার হয়েছে, আপনি এখন আমাকে আদেশ করুন।

অন্ধমুনির কথায় তাদের দুজনকে আমি সরযূতীরে নিয়ে গেলাম। মৃতদেহ স্পর্শ করে তার ওপরে তারা আছড়ে পড়লেন। তারপরে পুত্রের

উদ্দেশে বললেন, তুমি আমার সত্যের বলে বীরলোক লাভ কর। যে তোমাকে বিনাশ করল, তারও ওই রকম গতি হবে।

পরে দশরথকে বললেন, তুমিও পুত্রশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তুমি না জেনে আমার এই পুত্রকে নষ্ট করেছ, এই কারণে আমি নিদারুণভাবে তোমায় এই অভিশাপ দিচ্ছি যে, এইমাত্র আমার যেমন পুত্রশোক হয়েছে, এইরকম পুত্রশোকে তোমাকেও দেহপাত করতে হবে।

বহুকাল দশরথ অপুত্রক ছিলেন। কিন্তু এই অভিশাপ তো বৃথা হবার নয়। তাই তিনি পুত্রের পিতা হলেন। আপাতত অভিশাপটি আশীর্বাদ, কিন্তু পরিণতিতে অভিশাপ নেমে এলই। লোককথার এই পরিচিত মোটিফটি মহাকাব্যে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন বাল্মীকি।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আবহমান কাল থেকে লোকসমাজে অসংখ্য রামকথা লিখিত আকারে গ্রথিত হয়েছে। যাঁরা লিখিত রূপ দিলেন তারা সাধারণত লোককবি, তাদের কাব্যরীতিতে এক ধরনের অশিক্ষিতপটুত্ব রয়েছে। ভারতের আদিবাসীদের মধ্যেও এই ধরনের লৌকিক রামায়ণ প্রচলিত রয়েছে। এইসব রামকথায় বাল্মীকির মূল কাহিনিটি অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ চার ভাই, সীতা, বনবাস, রাবণের সীতাহরণ, রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সীতা উদ্ধার— এই মূল কাহিনি অংশটি প্রায় অবিকৃতই রয়েছে। কিন্তু যেসব উপকাহিনি মূল অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেগুলো বাল্মীকি রামায়ণে নেই। এর কারণ, লৌকিক কিংবদন্তিগুলো এইসব রামায়ণে স্বাভাবিকভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। স্থানীয়ভাবে যেসব কাহিনি লোকসমাজে জনপ্রিয় ছিল, লোককবি কিংবা কথক সেগুলোকেই গ্রহণ করেছিলেন। যে এলাকার রামায়ণ, সেই এলাকায় সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে লোকসমাজের মধ্যে রামসীতাকে কেন্দ্র করে বিচিত্র সব লোককথা প্রচলিত আছে। সেগুলোই তাদের রামায়ণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কিছু লোককবি ছিলেন যারা সংস্কৃত জানতেন, বাল্মীকি রামায়ণ পড়ে আঞ্চলিক ভাষায় রামকথা লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু এইসব রামায়ণও কোনোভাবেই বাল্মীকি রামায়ণের অনূদিত রূপ নয়। রামকথা লেখবার সময় তারা লৌকিক উপাদানকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাদের লিখিত রামকথা সেই লোকসমাজে জনপ্রিয় হোক।

তাই সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনি ভালোভাবে পড়লেও জনপ্রিয় প্রচলিত কাহিনিকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেননি।

বাল্মীকির রামায়ণ রচনার প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহের বিষয়টি আমরা তাঁর রামায়ণের মধ্যে থেকেই জানতে পারি। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার রামায়ণে যেসব বিচিত্র কাহিনি অংশ ছড়িয়ে আছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে সংস্কৃত রামায়ণের 'বিদিত' বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। কথক অনেক সময়েই সামনে বাল্মীকি রামায়ণের পুথি রেখে রামায়ণ গান করতেন। সেক্ষেত্রে মূল সংস্কৃতের কাহিনির বিকৃতি ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু কথক রামকথা শোনাবার সময় এলাকার প্রচলিত কাহিনিটিই বলে যেতেন। নইলে শ্রোতারা অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হতেন। লোকসমাজের কাছে 'বিদিত' বিষয় না বললে কথক অপ্রিয় হতেন। আজও বিহার-উত্তরপ্রদেশের গ্রামীণ এলাকায় এই দৃশ্য চোখে পড়বে। সামনে খোলা রয়েছে সংস্কৃত কিংবা তুলসীদাসী রামায়ণ, কিন্তু কথক বলে চলেছেন লৌকিক রামায়ণের কাহিনি। ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার বেনিয়াডি গ্রামে ও উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বারের কনখলে এই ধরনের কথকতা শুনেছি। কথককে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অকপটে বলেছেন, গাঁওগঞ্জের মানুষেরা তাদের বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে এই রামকাহিনিই জেনে এসেছে, অন্যরকম বললে তারা প্রণামী পর্যন্ত দিতে চায় না, মাঝেমধ্যে প্রতিবাদ করেও বসে, বলে, রামকথা ঠিক হচ্ছে না। এই মানসিকতা স্বাভাবিক বলেই কথক কোনো ঝুঁকি নেন না, তারও জীবিকা এর সঙ্গে যুক্ত।

যদি বাল্মীকি রামায়ণ থেকেই সরাসরি লোকসমাজে রামকথার প্রচার হত, তবে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কাহিনি গড়ে উঠত না। সাঁওতাল আদিবাসী রামায়ণ, বিরহড় আদিবাসী রামায়ণ, বঙ্গদেশ, গুজরাট, মধ্যভারত, দক্ষিণভারতের রামায়ণ কাহিনি এক নয়। ইন্দোনেশীয় রামকথাও অন্যরকম। আবার আরও ছোট ছোট জনগোষ্ঠীতে অন্যরকম কাহিনি রয়েছে। রামকথার মূল উৎস লোকসমাজে, তাই কাহিনির এত বৈচিত্র্য। লোকসমাজ তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন ও রক্ষণশীল, নিজস্ব মানসিক ও মানবিক সম্পদ তারা সহজে ভুলে যায় না, পরিত্যাগও করে না। আবার বাইরের কোনো কিছুকেই সহজে গ্রহণ করে না। তাদের মধ্যে রামকথা প্রচলিত না থাকলে এই কাহিনিকে তারা কোনোভাবেই এমন আপন করে লালন করত না। আরোপিত

কাহিনি লোকসমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 'প্রচারিত ও বিদিত' রামকথা, লোকসমাজের লোককথার অনন্য কাব্যিক রূপ দিলেন মহাকবি বাল্মীকি।

বাল্মীকির রামায়ণে অনেক উপকাহিনি রয়েছে। সেগুলোও এক একটি স্বতন্ত্র লোককথা। ভারতজুড়ে এই ধরনের অসংখ্য লোককথার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বাল্মীকির হাতে তার রূপ হয়েছে পরিশীলিত, পাত্রপাত্রীরাও বিশুদ্ধ সংস্কৃত নামে পরিচিত হয়েছে।

পৃথিবীজোড়া লোককথায় একটি অতি জনপ্রিয় মোটিফ পাওয়া যায়, শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন। অবশ্য লোকসমাজ এই ভাষায় বলে না, তারা বলে লোভের শাস্তি, পাপের পরিণতি, অত্যাচারের শাস্তি--- সঙ্গে এও বলে ভালো মানুষকে রক্ষা করেন দেবতা।

বাল্মীকি রামায়ণে 'ইল্বল ও বাতাপি' দুই দুষ্টু ভাইয়ের একটি গল্প রয়েছে। খুবই পরিবর্তিত, কিন্তু লৌকিক সমাজের লোককথার সংকেত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে রয়ে গিয়েছে। দুই ভাইকে ঘিরে সংস্কৃত পুরাণে কিছু উল্লেখ রয়েছে।

সিংহিকার গর্ভজাত বিপ্রচিত্তির পুত্রদ্বয় ইল্বল ও বাতাপি। ইল্বল কোনো ব্রাহ্মণের কাছে ইন্দ্রতুল্য একটি পুত্র প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা পূর্ণ না করায়, ইল্বল তখন থেকে ব্রহ্মঘাতক হয়।

এসব পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেওয়া হলেও এই কাহিনি যে লোকসমাজের লোককথা থেকেই নেওয়া হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, অন্য নামে, অন্য পরিবেশে, অন্য মানসিকতায় এই ধরনের অনেক লোককথা আমরা পেয়েছি। বিষয়ে ভাবনায় ও পরিণতিতে কোনো অভিন্নতা নেই।

প্রথমে বাল্মীকির কাহিনিটি বলে লৌকিক উপাদানের বিষয়টি বলব। কাহিনিটি আরণ্যকাণ্ডের একাদশ সর্গে রয়েছে।

রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে মহর্ষি অগস্ত্যের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। প্রাকৃতিক চিহ্নসমূহ দেখে রাম বললেন, লক্ষ্মণ, মহর্ষি সুতীক্ষ্ম যেমন বলেছিলেন, তা দেখে মনে হচ্ছে এটাই ইধ্মবাহের আশ্রম। এঁর ভাই অগস্ত্য লোকহিতার্থ কৃতান্ততুল্য এক দৈত্যকে বিনাশ করে এই দক্ষিণ দিক লোকের বাসযোগ্য করে রেখেছেন। অনেক আগে ইল্বল ও বাতাপি নামে ভীষণ দুই অসুর এই স্থান অধিকার করেছিল। দুই ভাই ব্রহ্মহত্যা করত। নির্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণপূর্বক শ্রাদ্ধের উদ্দেশে

ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে আসত এবং মেষরূপী বাতাপিকে রান্না করে যথানিয়মে ওঁদের আহার করাত। ব্রাহ্মণদের আহার শেষ করে ইল্বল উচ্চৈস্বরে বলত, বাতাপি বেরিয়ে এসো। বাতাপি তখন ওদের দেহ ভেদ করে মেষবৎ রবে বের হয়ে আসত। ব্রাহ্মণরা মারা যেত।

একদিন অগস্ত্যদেব সুরগণের অনুরোধে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে বাতাপিকে ভক্ষণ করে। ইল্বল শ্রাদ্ধশেষে বাতাপিকে আহ্বান করল। কিন্তু বাতাপি ডাকে সাড়া দিল না। তখন ধীমান অগস্ত্য হেসে বললেন, ইল্বল, তোমার মেষরূপী ভাই আমার জঠরানলে জীর্ণ হয়ে যমালয়ে প্রস্থান করেছে। সে আর দেখা দেবে না।

সংস্কৃত রামায়ণের ভাষা, মেজাজ, উদ্দেশ্য অন্যবিধ হলেও ভারতের অসংখ্য লোকসমাজে, এমনকী দূরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের লোককথার সঙ্গে এই কাহিনির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে পাত্রপাত্রীর নাম নেই, সুর-অসুর নেই— লোকসমাজের ঐতিহ্যলালিত লোককথার পরম্পরা রয়েছে সেইসব কাহিনিতে। মোটিফ একই ধরনের। মোটিফ বিশ্লেষণই চিনিয়ে দেয় কীভাবে লোককথা উচ্চতর লিখিত সাহিত্যে পরিবর্তিত চেহারায় অনুপ্রবেশ করে, এবং নিঃসন্দেহে সচেতনভাবে।

এই কাহিনির মোটিফগুলি হল: রূপ পরিবর্তন: দৈত্য থেকে পশু। দৈত্য থেকে ভেড়া। ভেড়া থেকে দৈত্য। মানুষকে হত্যা করে দৈত্য পশুরূপে ফিরে আসে। প্রতারণময় আহার-পরিবেশন। দুজন দুষ্টু ভাই দৈত্য। প্রতিশোধ। শত্রুকে হত্যার জন্য রূপ পরিবর্তন। প্রতারণাময় আমন্ত্রণ। দৈত্য মহাশক্তিধর মানুষের পেটে হজম হয়ে যায়। লোককথায় আমরা এইসব মোটিফ পেয়েছি, বাল্মীকির কাহিনিতেও তাই রয়েছে।

বাল্মীকি রামায়ণের সীতাহরণ এক অতি করুণ কাহিনি। এই ঘটনাটি রামায়ণ কাহিনির গতি পরিবর্তিত করে দিয়েছিল।

এই কাহিনির একটি লৌকিক ঐতিহ্যের পরিচয় দিচ্ছি। বছর সাতেক আগে কাহিনিটি শুনেছিলাম। হিমাচল প্রদেশের মানালি শহর থেকে অল্প দূরে বিপাশা নদীর তীরে কয়েকটি গ্রাম রয়েছে। এই প্রদেশেই মনু ঋষি, বিশ্বামিত্র, হাড়িম্বা দেবী, ঘটোৎকচ দেবের মন্দির রয়েছে। রামায়ণের-মহাভারতের কাহিনিও শোনা যায়।

বিপাশার তীরের এক গাঁয়ে একজন সুবৃদ্ধার কাছে এই লোককথাটি শুনেছিলাম। হিমাচলী ভাষা আমার অজানা। সঙ্গের গাইড পুরো লোককথাটি আমাকে বলেন।

এক গাঁয়ে এক রাজা ছিল। সে খুব দয়ালু। সেই গ্রাম ও পাশের গ্রামগুলোর সব মানুষের খোঁজখবর নিত, সবাইকে ভালোবাসত।

তার ছিল এক বউ আর এক ভাই। ভাই দাদাকে খুব মেনে চলত। ভাইয়ের তখনও বিয়ে হয়নি। বউ ছিল খুব সুন্দরী আর ভালো। রাজার বউ হলেও গাঁয়ের সবার খবর নিত। সকলের উপকার করত।

অল্প দূরের ঘন বনে থাকত এক দানো। সে খুব হিংসুটে। সে অনেকগুলো বিয়ে করেছিল। কিন্তু বিয়ে করার পরেই বউকে তাড়িয়ে দিত। আবার বিয়ে করত। দানো যখন বনের বাড়িতে থাকত তখন দানো হয়েই থাকত। বনের বাইরে এলে সে দেহকে পালটে নিত। কখনও হরিণ, কখনও ইয়াক, কখনও ভিখারি মানুষ— যে কোনো রূপ সে নিতে পারত।

একদিন হরিণ হয়ে সে গাঁয়ের পাশ দিয়ে ঘুরছে। রাজার বউ চান করে একটা পাথরের ওপরে বসে রোদে চুল শুকোচ্ছে।

তখন বউকে আরও সুন্দরী লাগছে। দানো-হরিণ বউকে দেখে চোখ ফেরাতে পারছে না। বউ হরিণকে দেখে খুব আনন্দ পেল, মুখে হাসি। দানো আরও পাগল হয়ে গেল। এই মেয়েকে আমার বউ করতেই হবে।

পরের দিন দানো ছোট্ট পাখি হয়ে বউয়ের আরও কাছে গেল। উড়ে উড়ে বউকে দেখল। আরও ভালো লেগে গেল। এই বউকে তার বউ করতেই হবে।

দিন কয়েক পরে দানো এক পড়শিকে বলল, একটা কাজ করতে হবে। আমি রাজার বাড়ির সামনে হরিণ হয়ে ঘুরব। বউ একদিন আমাকে দেখে হেসেছে, মনে হয় সে হরিণ খুব ভালোবাসে। আমাকে পুষতে চাইবে। তুই ভিখারি সেজে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবি। বউ একা হলেই ধরে আমার বাড়িতে নিয়ে আসবি।

সেদিন রাজার বাড়ির সামনে সুন্দর একটা হরিণ ঘুরছে। বউ রান্নাঘর থেকে রান্না করতে করতে হরিণকে দেখছে। রাজাকে বলল, ওই হরিণকে ধরে দাও, আমি পুষব। ওকে আমি নিজের ছেলের মতো আমার কাছে রাখব, খুব ভালোবাসব।

রাজা হরিণকে ধরতে গেল। হরিণ বনের পথে দৌড় দিল। রাজা ছুটছে তার পেছনে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল রাজা ফিরছে না। ভাই বলল, আমি দেখছি। ভাইও বেরিয়ে গেল। বাড়িতে বউ একা।

তখন দানোর পড়শি ভিখারি সেজে বউয়ের কাছে এসে বউকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটল। পড়শির গায়ে খুব জোর, বউ অনেক চেষ্টা করল। তার হাত ছাড়াতে পারল না।

রাজার বাড়ি গাঁয়ের একপাশে। কেউ দেখতে পেল না। কিন্তু গাছের ডালে বসে দেখে ফেলল একটা মোনাল পাখি (মোনাল পাখি থেকেই নাম হয়েছে মানালি, মোনাল হিমাচল প্রদেশের জাতীয় পাখি)। সে আর কী করবে? শুধুই কষ্ট পেল, চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

অনেকক্ষণ পরে রাজা আর ভাই ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল। বনের হরিণকে তারা ধরতে পারেনি। কিন্তু রাজবাড়িতে এসে দেখে বউ নেই।

মোনাল পাখি উড়ে এসে রাজাকে সব বলে দিল। রাজা মাথায় হাত দিয়ে বসল, সঙ্গে ভাই।

গাঁয়ে রটে গেল এই কথা। সবাই এল রাজবাড়িতে। সকলের মন খারাপ। হঠাৎ গাঁওবুড়ো বলল, আমি বুঝতে পেরেছি এ হল বনের দানোর কাণ্ড। সে খুব পাজি। আমরা সবাই দানোকে মেরে বউকে ফিরিয়ে আনব, আমাদের রাজার বউকে, আমাদের মাকে।

গাঁয়ের সব মানুষ যার কাছে যা হাতিয়ার ছিল তাই নিয়ে দানোর বনে গেল। খুব লড়াই হল। রাজার তিরে দানো মারা পড়ল, রাজার ভাইয়ের তিরে দানোর পড়শি মারা গেল।

গাঁয়ে ফিরে এল রাজার বউ, রাজার ভাই। আনন্দ, আনন্দ। সবার মনে আনন্দ।

বাল্মীকি রামায়ণে সীতাহরণ ও সীতাউদ্ধারের কাহিনিটি কীভাবে বর্ণিত হয়েছে?

অনন্তর রাবণ ও মারীচ দণ্ডকারণ্যে উত্তীর্ণ হল। মারীচকে রামের আশ্রমপদ কদলীপরিবৃত কুটিরকে দেখিয়ে দিলেন।

তখন মারীচ ক্ষণমধ্যে এক মনোহর মৃগ হল। অনন্তর সে সীতাকে লোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগল। মৃদুপদে সঞ্চরণ করতে লাগল।

এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হয়ে কর্ণিকার অশোক ও আম্র বৃক্ষের সন্নিহিত হলেন, এবং পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন। এই অবসরে ওই মুক্তামণিখচিত রত্নময় মৃগ তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ল। তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব মায়াময় মৃগকে বিস্ময়ে সস্নেহে দেখতে লাগলেন।

স্বর্ণবর্ণা জানকী ওই অদ্ভুত মৃগ দর্শন করে হৃষ্টমনে রামকে বললেন, আর্যপুত্র, তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণকে নিয়ে এখানে এসো। এই সুন্দর মৃগ আমার মনোহরণ করেছে, তুমি মৃগকে নিয়ে এসো, আমরা ওকে নিয়ে খেলা করব। আমাদের আশ্রমে বহু সংখ্যক পশুপাখি আছে, কিন্তু এই মৃগের মতো আর কেউ নেই। তুমি ওকে জীবন্ত ধরে আনো।

রামচন্দ্র স্বর্ণবর্ণ হরিণ ধরতে ধাবমান হলেন। হরিণ পালাতে থাকে। কখনও রামচন্দ্রকে দেখা দেয়, আবার অদৃশ্য হয়। এইভাবে অনেক সময় অতিক্রান্ত হল। মৃগ রামের হস্তগত হল না। পরে রামের তির মৃগরূপী মারীচের বক্ষস্থল বিদ্ধ করল। মারীচ হঠাৎ কৃত্রিম মৃগদেহ বিসর্জন দিল। তৎক্ষণাৎ রামের অনুরূপ স্বরে হা লক্ষ্মণ হা সীতা বলে চিৎকার করতে লাগল।

আতঙ্কিত হয়ে সীতা রামচন্দ্রকে উদ্ধারের জন্য লক্ষ্মণকে পাঠালেন। কুটির থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লক্ষ্মণ গেলেন। ইত্যবসরে রাবণ পরিব্রাজকের রূপ ধারণপূর্বক জানকীর কুটিরে গিয়ে তাকে অপহরণ করলেন।

জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন, শব্দ শুনে জাগ্রত হয়ে রাবণ ও সীতাকে দেখতে পেলেন। আহত হলেন রাবণের অস্ত্রে। অনেক স্থান পরিভ্রমণ করে রাম-লক্ষ্মণ শেষপর্যন্ত আহত জটায়ুর কাছে সীতাসংক্রান্ত সংবাদ পেলেন।

হিমাচল প্রদেশের গ্রাম্য কৃষক পরিবারের নিরক্ষর বৃদ্ধার লোককথার সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে রামায়ণের কাহিনির। বাল্মীকি যে ভারতব্যাপী রামকথার বিদিত কাহিনির কথা বলেছেন, এইসব সাদৃশ্য দেখেই তা প্রমাণিত হয়।

রামায়ণে দৈত্য-রাক্ষস-অসুরকে কেন্দ্র করে যেসব উপকাহিনি রয়েছে তার সঙ্গেই লোককথা-মিথকথার বেশি মিল পাওয়া যাচ্ছে। এবং এসব সদৃশ লোককথা-মিথকথা পাওয়া গিয়েছে উত্তর ও মধ্যভারতে। আর সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য রয়েছে রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডের উপকাহিনির সঙ্গে। অনেক অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

মহাভারত মহাকাব্য

মহাভারত রচনার সঠিক কাল-নির্ণয় আজও করা যায়নি, করা সহজও নয়। প্রাচীনপন্থী অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাভারত রচিত হয়েছিল। কিন্তু এর সপক্ষে ইতিহাস-সম্মত কোনো প্রমাণ নেই। ইউরোপীয় গবেষকরা বলেছেন, মহাভারত খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল। আসলে মহাভারত এক সময়ে রচিত হয়নি, এক কবিরও রচনা নয়। সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ গবেষকের সিদ্ধান্ত, এই মহাকাব্য আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল, অন্তত মূল কাঠামোটি। খ্রিস্টজন্মের সময়কালেও মহাভারতে নতুন নতুন রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নানা কবির রচনা এর মধ্যে থাকলেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নামেই সমগ্র মহাকাব্যটি প্রচারিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য পাওয়া গিয়েছে, একটি ভাষ্যের সঙ্গে অন্য ভাষ্যের বিচিত্র পাঠভেদ লক্ষ করা যায়। সাদৃশ্যই বেশি, কিন্তু অমিলও রয়েছে।

মহাভারতকে বলা হয়েছে সংহিতা। সংহিতা শব্দের অর্থ সংগ্রহ, একত্রীকৃত, একত্রীভূত। অর্থাৎ একে সংগ্রহগ্রন্থ বলে প্রাচীনকাল থেকেই অভিহিত করা হয়েছে। এইসূত্রে বলা হয়েছে যেসব খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও ঐতিহ্য সেই কালে প্রচলিত ছিল তাই মহাভারতে সংকলিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে রামায়ণ রচনার সঙ্গে মহাভারত রচনার আশ্চর্য মিল রয়েছে। লৌকিক উপাদানই দুই মহাকাব্যের আদি উৎস। রামায়ণ মহাকাব্যের মধ্যেই যেমন রয়েছে এর নিদর্শন, তেমনি রয়েছে মহাভারতের মধ্যেও।

মহাভারত কাব্য ও ইতিহাস। মহাভারতকার নিজেই সেকথা বলেছেন। সত্যবতীসুত ব্যাসদেব প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বলেছেন, ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছি। ব্রহ্মা বললেন, তুমি জন্মাবধি সত্য ছাড়া মিথ্যা কথা ব্যবহার করনি, তুমি সবসময় ব্রহ্মবাদিনী বাণী মুখে উচ্চারণ করে থাক, এখন যখন নিজের রচিত মহাভারতকে কাব্য বলে নির্দেশ করলে, তখন এই গ্রন্থ কাব্য বলে পরিগণিত ও প্রখ্যাত হবে। তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হবে সন্দেহ নেই।

বেদব্যাস আবার নিজেই একে ইতিহাস বলেছেন। তিনি ইতিহাস রচনা করেছেন, ইতিহাস ও পূরাণের অনুসরণ করেছেন। আদিপর্বে মহাভারত-প্রশংসায় বলা হয়েছে, দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, চারবেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু যেরকম শ্রেষ্ঠ, ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস রচিত মহাভারত সেরকম শ্রেষ্ঠ। তাই মহাভারত কবি-কল্পনায় সৃষ্ট শুধু মহাকাব্য নয়, সেকালের ইতিহাসও। এই ইতিহাসে লোকমানসের প্রতিচ্ছবিও রয়েছে।

সেকালের অনেক প্রচলিত আখ্যান সংকলন করলেন বেদব্যাস। এই আখ্যান বেদব্যাসের আগেও অনেক কবি শুনিয়ে গিয়েছেন। সেসব পুথি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তবে মহাভারতের কাহিনিও যে আগে থেকেই জনসমাজে প্রচারিত ও বিদিত ছিল তার প্রমাণ মহাভারতেই রয়েছে। মহাভারতের অসংখ্য কাহিনির উৎসস্থল লোকসমাজ।

আদিপর্বে 'নৈমিষারণ্যে সূতের আগমন' অংশে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। লোমহর্ষণ-পুত্র পৌরাণিক সৌতি ছিলেন মহাভারতকথক। তিনি একদিন এলেন নৈমিষারণ্যে। ঋষিরা বললেন, হে কমললোচন সূতনন্দন! এখন কোথা থেকে আসছেন? এতদিন কোথায় কোথায় ভ্রমণ করলেন? সবকিছু বিস্তারিত বলুন।

সৌতি বললেন, আমি মহাত্মা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে গিয়েছিলাম। সেখানে বৈশম্পায়নের মুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কথিত মহাভারতীয় কথা শুনলাম। সেখান থেকে অনেক তীর্থ দর্শন করে অনেক আশ্রমে ভ্রমণ করে শেষকালে সমন্তপঞ্চক তীর্থে গেলাম, এখানে আগে কুরু ও পাণ্ডব এবং উভয়পক্ষের রাজাদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হয়েছিল। সেখান থেকে এই আপনাদের পবিত্র আশ্রমে এলাম।

ঋষিরা বেদব্যাস কথিত ইতিহাস শুনতে চাইলেন। কেননা, এই ইতিহাস সমস্ত উপাখ্যান থেকে শ্রেষ্ঠ ও নানা শাস্ত্রের সার-সংকলন করে রচিত।

সৌতি বললেন, আমি বেদব্যাস কথিত অতি পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণনা করব। এই বিশাল পৃথিবীতে কত শত মহাত্মা ওই ইতিহাস বলে গিয়েছেন, অনেকেই বলছেন এবং ভবিষ্যতেও বলবেন।

স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, মহাভারতের কাহিনি বেদব্যাসের কবি-কল্পনা নয়, সমাজে আগে থেকেই যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। লোকসমাজের লোককথা-গাথা-কিংবদন্তি-পুরাবৃত্ত একত্রিত করে বেদব্যাস নিজের কবিমন ও বৈদগ্ধ্য যুক্ত করে অনন্য কাব্য-ইতিহাস মহাভারত রচনা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।' লৌকিক উপাদানের বিষয়টি চিন্তা করেই রবীন্দ্রনাথ মহাভারত সম্পর্কে ইতিহাস-সম্মত মন্তব্য করেছেন, "আর্যসমাজে যতকিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। জনশ্রুতি নহে,আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত।"

মহাভারতের অসংখ্য আখ্যান তৎকালীন ভারতবর্ষের ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল আর সেসবের সংকলিত রূপই মহাভারত। তাই মহাভারত সংহিতা।

মহাভারতে সৃষ্টি বিষয়ক লোকপুরাণ

মহাভারতের কাহিনি-গঠন অত্যন্ত জটিল। এর মধ্যে যেসব ধর্মনীতি ব্যবহারনীতি ও দর্শন আলোচনা করা হয়েছে তা উচ্চাঙ্গের চিন্তা-চেতনা-মননের ফসল। সামাজিক সভ্যতার একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছলে এসব চিন্তার প্রকাশ সম্ভব নয়। অথচ সৃষ্টি বিষয়ক এমন একটি লোকপুরাণের সন্ধান আদিপর্বে রয়েছে যা প্রায় আদিম সমাজের চিন্তার প্রতিফলন বলে মনে হয়। লৌকিক এই ধারণাটি উচ্চতর সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে। লোকসমাজে প্রচলিত প্রাচীন ধারণাটি অবিকৃতভাবে মহাভারতকার গ্রহণ করেছেন।

দীর্ঘ বিবর্তনের ধারায় জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ যখন সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠল, তখন একটি প্রশ্ন তাকে বারবার ভাবিয়ে তুলেছিল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কীভাবে সৃষ্টি হল? মানুস-পশুপাখি কীভাবে সৃষ্টি হল? এই 'কেন' ও 'কীভাবে'-র উত্তর খুঁজতেই মানুষ লোকপুরাণ সৃষ্টি করেছিল। ডিম সম্পর্কিত লোকপুরাণ অত্যন্ত প্রাচীন। ডিমের বিবর্তনটি প্রাচীন

মানুষের কাছে ছিল পরম বিস্ময়। ডিম তো একটি জড় পদার্থ। সে নিজে নড়াচড়া করতে পারে না। ডিমকে ভেঙে ফেললেও তার মধ্যে থেকে কোনো প্রাণী বেরিয়ে আসে না, বের হয় কিছু সাদা ও রঙিন তরল পদার্থ। অথচ কিছুকাল মায়ের বুকের তলায় থাকার পর তার মধ্যে থেকে একটি সজীব প্রাণ ফুটে বেরোয়। অথচ খোলসের মধ্যে দিয়ে কোনোকিছুই তো প্রবেশ করানো হয়নি! নারী-পুরুষের মিলনেই প্রাণের জন্ম হয়, এক্ষেত্রে প্রাণ জন্মাচ্ছে অন্যভাবে। জীবতত্ত্বের বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল বলেই এই ঘটনা মানুষকে বিস্মিত করেছে। আর এই বিস্ময় থেকে ডিমকে কেন্দ্র করে প্রাচীন লোকপুরাণের জন্ম হল।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলিতে ডিমকে কেন্দ্র করে অসংখ্য লোকপুরাণ সৃষ্টি হয়েছে। যেখানেই লোকপুরাণ পাওয়া যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে এই সব সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন। মহাভারতে যে লোকপুরাণটি সংকলিত হয়েছে সেটিও খুব প্রাচীন চিন্তার পরিচয় বহন করছে। আর লৌকিক লোকপুরাণের ভাণ্ডার থেকেই এটি মহাকাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

একেবারে আদিতে ছিল ঘোর অন্ধকার— এই ধারণাটিও এই লোকপুরাণে রয়েছে। এটিও খুব প্রাচীন বিশ্বাস এবং নিঃসন্দেহে লৌকিক ঐতিহ্যমণ্ডিত। ঋগ্‌বেদে আছে, আদিতে দিন ও রাত্রির কোনো যবনিকা ছিল না, ছিল একমাত্র তমসা, অন্ধকারের গভীরে অন্ধকার, অস্থিরতার অবিচ্ছেদ্য তমিস্রা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ের পলিনেশীয় আদিবাসী লোকপুরাণে আছে, আদিতে কোনো কিছুই ছিল না, চারিদিকে ছিল মহাশূন্য। আর সেই মহাশূন্যের মধ্যে ছিল ঘোর অন্ধকার। এক শক্তিধর নিয়ন্তা সেই মহাশূন্যের অন্ধকারের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি করলেন জড় পদার্থকে। তারপর গাছপালা, পশুপাখি এবং শেষকালে মানুষের আদি পিতা ও আদি মাতাকে। উত্তর আমেরিকার পুয়েবলো ইন্ডিয়ান আদিবাসী লোকপুরাণে আছে, আদিতে জলরাশি, ভূমি, হরিণ, ভালুক, চিতা, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ, তারা, মেঘ, কুয়াশা কিছুই ছিল না, ছিল গভীর অন্ধকার। গ্রিক লোকপুরাণে আছে, সৃষ্টির আদিতে পাতালপুরীর গভীরে অন্ধকার বিরাজ করত। প্রাচীন ব্যাবিলন-সুমের-মেসোপটেমিয়ার লোকপুরাণেও অন্ধকার ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করা হয়েছে। সব চিন্তাই লৌকিক ঐতিহ্য থেকে রূপ পেয়েছে।

মহাভারতের সৃষ্টিবর্ণনও এই লৌকিক চিন্তা থেকে জন্ম নিয়েছে : প্রথমত এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হল। ওই অণ্ডে অনাদি, অনন্ত, অচিন্তনীয়, অনির্বচনীয়, সত্যস্বরূপ, নিরাকার, নির্বিকার, জ্যোতির্ময় ব্রহ্মা প্রবিষ্ট হলেন। অনন্তর ওই অণ্ডে ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করলেন। তারপরে স্থাণু, স্বায়ম্ভুব মনু, দশ প্রচেতা, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, সপ্তর্ষি, চতুর্দশ মনু জন্মলাভ করেন। তারপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশ সঞ্জাত হল।

অণ্ড বা ডিম মানুষের লৌকিক বিশ্বাসকে কতদূর প্রভাবিত করতে পেরেছিল যার ফলে সে বলতে পারে যে অণ্ডই সমস্ত বস্তুর বীজভূত একটি বস্তু।

সারা বিশ্বের লোকসমাজে সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণে প্রথম অবস্থায় অন্ধকার, শূন্য, কোনো কিছু ছিল না— আকাশ দেবতা সব সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীর আদি ধর্মগুলোতেও এই ধারণার কথা জানতে পারা যায়! আর ডিমকে ঘিরে বিস্ময়কর সব লোকপুরাণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ভারতবর্ষ আফ্রিকা আস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আমেরিকা পলিনেশিয়া মেলানেশিয়া মাইক্রোনেশীয় আদিবাসীদের মধ্যে। ভারতীয় বলয়ে লোকসমাজে ডিমকে কেন্দ্র করে যেসব বিস্ময়কর লোককথা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে, মহাভারতে সেই মানসিকতার প্রভাব রয়েছে।

মহাভারতে রূপকথা-পশুকথা

মহাভারত সংকলন করবার সময় মহাভারতকার সেই কালের অনেক লোককথাকে মহাকাব্যের প্রয়োজনে লিপিবদ্ধ করেন। যেগুলো ছিল লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্যে, তিনি তার লিখিত রূপ দিলেন। এইসব লোককথার রূপরীতি ও মোটিফ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, এগুলো নির্ভেজাল লোককথা। মহাভারতে হয়তো একটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করা হল, সেই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বক্তা লোককথাটি বললেন। অন্য কোনোভাবে জটিল সমস্যার সমাধান না করে লোককথার

আশ্রয় গ্রহণ করা হল। যেন নীতিশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে নীতিকথার মাধ্যমে। এইসব লোককথা বলবার সময় এগুলোকে পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, অপূর্ব ইতিহাস, পুরাতন ইতিহাস, বৃত্তান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি লোককথা, এগুলো যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন পিতামহ ভীষ্ম। এই লোককথাগুলি তিন হাজার বছর থেকে দু-হাজার বছরের পুরনো। লিখিত রূপ পেলেও এদের লৌকিক রূপটি কিন্তু খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি।

মহাভারতের শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে শরণাগত-বাৎসল্য বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি সমুদয় শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হয়েছেন। অতএব, শরণাগত ব্যক্তিকে প্রতিপালন করলে যে মহান ধর্মলাভ হয়, তা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম সরাসরি কোনো উপদেশ না দিয়ে একটি পশুকথা শোনান। এই পশুকথাকে ভীষ্ম বলেছেন 'পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস'। কেননা, বহু পূর্ব থেকেই এটি প্রচলিত আছে। ভার্গব মহারাজা মুচুকুন্দের কাছে এই বিচিত্র কথা বলেছিলেন। ভীষ্ম সেই 'অপূর্ব ইতিহাস' যুধিষ্ঠিরকে শোনালেন।

পশুকথার মাধ্যমে পিতামহ বলতে চেয়েছেন, শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া প্রধান ধর্ম। যে ব্যক্তি শরণাগতকে আশ্রয় দেয় না, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। যে শরণাগতকে বিনাশ করে, তার মুক্তি নেই। পশুকথার মধ্যে আরও রয়েছে, যে পতিব্রতা নারী স্বামীর অনুগমন করে, সে স্বর্গসুখ অনুভব করতে সমর্থ হয়।

পৌরাণিক ভারতবর্ষের সামাজিক ধ্যান ধারণার চিত্র ফুটে উঠেছে এই 'পায়রা ও ব্যাধের' কথার মধ্যে।

অনেক কাল আগে এক বনে থাকত এক ব্যাধ। সে ছিল খুব নিষ্ঠুর পাখিদের লোভ দেখিয়ে যখন-তখন সে তাদের হত্যা করত। তার দেহ কাকের মতো কালো, চোখ দুটো লাল টকটকে, পা-দুটো ছোট, বিরাট মুখ। তার নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্য তার বউ ছাড়া অন্য আপনজন ও বন্ধুবান্ধব তাকে ত্যাগ করেছিল।

ওই ব্যাধ জাল নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াত। পাখি ধরে তাদের মেরে ফেলত আর পাখির সেই মাংস বিক্রি করত। এমনি করে অনেক কাল কেটে গেল। কিন্তু ব্যাধ নিজের দোষ বুঝতে পারল না।

একদিন ব্যাধ বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় আরম্ভ হল প্রচণ্ড ঝড়। একের পর এক গাছ উপড়ে পড়ছে, আকাশের রঙ কালো হয়ে উঠল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। প্রবল বেগে বৃষ্টি নামল। জল আর থামে না। মাটির ওপরে জল জমে গেল।

ব্যাধ ভয় পেয়ে বনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। তার খুব শীত করছে, মনে প্রচণ্ড ভয়। কিন্তু বনের সব জায়গা জলে ডুবে গিয়েছে, দাঁড়াবার উঁচু কোনো জায়গা নেই। যে দু-একটা উঁচু জায়গা রয়েছে, সেখানে আশ্রয় নিয়েছে সিংহ, শুয়োর ও অন্য বন্য জন্তু। প্রবল বৃষ্টিতে অনেক পাখি মরে গাছের নীচে পড়ে রয়েছে। ব্যাধ তখনও ঘোরাঘুরি করছে।

এমন সময় সেই ব্যাধ এক মেয়ে পায়রাকে দেখতে পেল। সে বৃষ্টির জলে গাছের নীচে পড়ে রয়েছে। ব্যাধের অবস্থাও কাহিল। তবু স্বভাব যাবে কোথায়? ব্যাধ পায়রাকে ধরে নিজের খাঁচার মধ্যে পুরে ফেলল। ব্যাধ সেই বনে হঠাৎ মেঘের মতো নীলরঙের একটা গাছ দেখতে পেল। বিশাল গাছ। ওই গাছে থাকে অনেক পাখি।

আস্তে আস্তে বৃষ্টি ধরে এল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, ঠিক যেন টলটলে জলের পুকুর। সাদা আকাশে তারা ফুটল। তখন ব্যাধ মনে মনে বলল, রাত হয়ে গেল। আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে। এই গাছের নীচেই বরং রাত কাটাই। ব্যাধ পাতা দিয়ে বিছানা তৈরি করল, একটা পাথরে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। তার আজ মনে বড় দুঃখ।

ওই মেঘের মতো নীলরঙের বিশাল গাছে অনেক বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাস করত এক পায়রা। অনেক দিন ধরে সে ওই গাছে বাস করছে। ওই দিন সকালে তার বউ খাবারের খোঁজে বেরিয়েছিল। রাত হয়ে গেল তবু বউ ফিরছে না, তার খুব চিন্তা হল। শেষে বলল, আমার বউ এখনও কেন ফিরছে না? দিনের বেলা যা ঝড় জল হল! বউ-এর কিছু হয়নি তো? সে যদি আর না ফেরে? তার মতো পতিপরায়ণা কে আছে? এখন আমি কী করি?

এদিকে হয়েছে কী, ব্যাধ যে মেয়ে পায়রাকে খাঁচায় ধরে রেখেছিল, সেই হল পায়রার বউ। বউ খাঁচার মধ্যে থেকে স্বামীর সব কথা শুনতে পেল। সে তখন মনে মনে বলল, আমার কোনো গুণ থাক বা নাই থাক, আমার স্বামী যখন আমার গুণের কথা বলছে তখন আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর সেই বন্দি বউ স্বামীকে ডেকে বলল, ওগো আমি এখন তোমাকে যে কাজ করতে বলব, তা ভালোভাবে শুনে তুমি সেইমতো কাজ করবে। এই ব্যাধের খুব খিদে পেয়েছে, তার খুব শীতও করছে। এই অবস্থায় ব্যাধ এসেছে তোমার বাড়িতে। এ এখন তোমার শরণাগত, ওকে ভালোভাবে দেখাশোনা করা উচিত। আমরা পায়রার বংশে জন্মেছি, আমাদের দেহে শক্তি কম। তবু সাধ্যমতো শরণাগতকে পালন করা উচিত। তোমার ছেলেমেয়ে হয়ে গিয়েছে, তুমি তাদের মুখ দেখেছ। তাই এখন দেহের মায়া ত্যাগ করে ব্যাধকে সন্তুষ্ট কর। আমার জন্য শোক কোরো না। তুমি বেঁচে থাকলে অন্য বউ গ্রহণ করতে পারবে।

বউ-এর এই উপদেশে পায়রা খুব আনন্দ পেল। সে ব্যাধকে বলল, এখানে তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি মনে করবে তোমার বাড়িতেই তুমি আছ। তুমি কী চাও বল। তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছ, তুমি আমাদের অতিথি। তুমি যা চাইবে আমি সাধ্যমতো তা করব।

ব্যাধ বলল, পায়রা, আমার ভীষণ শীত করছে। কী করলে আমার শীত লাগবে না তাই করো।

পায়রা গাছ থেকে নেমে এল। অনেক শুকনো পাতা কুড়িয়ে এক জায়গায় রাখল। তারপরে আগুন আনতে গেল। আগুন নিয়ে এসে পাতায় আগুন ধরিয়ে দিল। সুন্দর আগুন জ্বলে উঠল। ব্যাধ আগুন পোয়াতে লাগল। আস্তে আস্তে দেহ গরম হল, শীত কমে এল।

তখন ব্যাধ পায়রাকে বলল, আমার খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও।

পায়রা বলল, আমার বাসায় তো কোনো জমানো খাবার নেই! কী দিয়ে তোমার খিদে মেটাই? আমরা এই বনে বাস করে দিনের খাবার দিনে জোগাড় করে খাই। আমাদের কিছু জমানো থাকে না।

পায়রা এই কথা বললেও মনে মনে তার খুব কষ্ট হল। আহা! ব্যাধের খিদে পেয়েছে। অথচ আমরা কোনো কিছুই জমিয়ে রাখতে জানি না! সে তখন ঠিক করল— নিজের মাংস দিয়েই ব্যাধের খিদে মেটাবে। ব্যাধকে বলল, তুমি একটু দেরি কর, আমি খাবার দিচ্ছি।

এই কথা বলে পায়রা আবার শুকনো পাতা জড়ো করল। পাতায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে ব্যাধকে বলল, আমি শুনেছি, অতিথির সেবা অতি প্রধান ধর্ম। তোমার সেবা করতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।

পায়রা এই কথা বলে সেই আগুনকে ঘিরে তিনবার ঘুরল, তারপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আগুনে।

পায়রা আগুনের মধ্যে ঢোকা মাত্রই ব্যাধের মন পালটে গেল। সে মনে মনে বলল, হায়! এ আমি কী করলাম! আমি এত নিষ্ঠুর! আমি পাখি মেরে বেড়াই, তাই আমাকে সবাই নিন্দে করে। আর এখন যা হল তাতে আমার আর পাপের শেষ নেই। হায়! এমন অধর্ম করলাম?

আগুনের মধ্যে সেই পায়রাকে দেখে ব্যাধ আবার মনে মনে বলে উঠল, আমার মতো নিষ্ঠুর পাপী আর কেউ নেই। পায়রা নিজের দেহ আগুনে পুড়িয়ে আমায় শিক্ষা দিয়ে গেল। আজ থেকে ঘর-সংসার স্ত্রীপুত্র ছেড়ে আমি মরবার জন্য তৈরি হলাম। আজ থেকে আর কিছু খাব না। গরমকালে পুকুর যেমন শুকিয়ে যায়, আমার শরীরও তেমনি শুকিয়ে যাবে। খিদে পেলেও কিছু খাব না। উপবাস করে জীবন দেব।

এই কথা ভেবে ব্যাধ পাখি ধরার লাঠি-শলা-খাঁচা-জাল সব ফেলে পায়রা-বউকে মুক্ত করে সেখান থেকে চলে গেল।

খাঁচা থেকে বেরিয়ে বউ কাঁদতে লাগল, হায়! আমি এখন কেমন করে বাঁচব? স্বামী ছাড়া বউয়ের এমন আপনজন কে আছে? তুমি নেই, আমারও আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই।

পায়রা-বউ এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে পাতার আগুনে ঝাঁপ দিল। অবাক কাণ্ড! আগুনের মধ্যে ঢুকে দেখে, তার স্বামী নানারঙের মালা, সুন্দর পোশাক ও গয়না পরে পুষ্পকরথে বসে রয়েছে। পায়রা সেই রথে বউকে তুলে নিয়ে স্বর্গে চলে গেল। পরম সুখে তাদের দিন কাটতে লাগল।

যখন পায়রা আর পায়রা-বউ রথে করে স্বর্গের পথে উড়ে যাচ্ছিল, তখন ব্যাধ হঠাৎ ওপর দিকে চেয়ে দেখল। দেখল, ওরা দুজন সুন্দর পোশাকে স্বর্গের দিকে চলেছে। ব্যাধের মনে খুব দুঃখ হল। সে অনাহারে থেকে প্রাণত্যাগ করবেই— একথা ভেবে এগিয়ে চলল।

কিছুদূর গিয়েই সে একটা বিরাট সরোবর দেখতে পেল। পদ্মফুলে ভরা সেই সরোবর। চারিদিকে অনেক পাখ-পাখালি। ব্যাধের খুব তেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু সে জলের দিকে ফিরেও তাকিয়ে দেখল না। সরোবর পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেই ঘন বনে ঢোকার সময় গাছ-গাছালির কাঁটায় তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। রক্ত ঝরতে লাগল। তবু সে থামল

না, বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ জোরে হাওয়া বইতে শুরু করল। হাওয়ার দাপটে ডালে ডালে ঘষা লেগে আগুন জ্বলে উঠল। সাংঘাতিক দাবানল। বন জ্বলে উঠল। গাছ পুড়ছে, লতা পুড়ছে, পশুপাখি পুড়ছে। সমস্ত বনই যেন আগুন হয়ে গেল।

ব্যাধের কিন্তু একটুও ভয় নেই। বনের চারিদিকে আগুন দেখে তার খুব আনন্দ হল। যেখানে বেশি আগুন সে তার মধ্যে এগিয়ে গেল। সে চায় প্রাণ দিতে। প্রচণ্ড আগুনে ব্যাধের শরীর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শরীর পুড়ে যাওয়াতে ব্যাধের আর পাপের একটুও বাকি থাকল না। সে স্বর্গে চলে গেল। অন্য দেবতাদের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে থাকতে লাগল।

যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের কাছে জানতে চাইলেন— রাজা যদি শত্রু পরিবৃত হন, অনেক রাজা এক রাজাকে আক্রমণ করে তবে তিনি কীভাবে আচরণ করবেন? একাকী সহায়হীন হয়েও রাজা কীভাবে শত্রুদের মধ্যে অবস্থান করবে? প্রকৃত ও কৃত্রিম মিত্রকে রাজা কীভাবে চিনবেন? কার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবেন? কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন?

পিতামহ বললেন, কোনো কোনো সময় শত্রুও মিত্র হয়, এবং মিত্রও শত্রু হয়ে ওঠে। কাজের গতি সর্বদা সমান হয় না। দেশকাল বিবেচনা করে বিশ্বাস ও সন্ধি করা উচিত। প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুদের সঙ্গেও সন্ধি করতে হয়। যে মূর্খ শত্রুদের সঙ্গে কখনও সন্ধি করতে চায় না, সে সুখভোগ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি সময়ে মিত্রদের সঙ্গে বিরোধ ও শত্রুদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে, তার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফললাভ হয়। আমি এই উপলক্ষে 'বেড়াল ও ইঁদুরের কথা' নামে একটি 'পুরাতন ইতিহাস' বলছি।

পিতামহ জটিল একটি বিষয় বোঝাতে লোককথার আশ্রয় নিলেন। এই লোককথাটি রয়েছে মহাভারতের শান্তিপর্বে। ভীষ্ম নিজেই বলছেন, এই বৃত্তান্তটি পুরাতন ইতিহাস, অর্থাৎ অনেক কাল আগের শোনা লোককথা। লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত লোককথাটি ব্যাসদেব মহাকাব্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করলেন। মৌখিক ঐতিহ্য স্থায়ী লিখিত রূপ পেল। লোককথাটি বিশ্লেষণ করলে ভীষ্মের উপদেশের মর্মার্থ অনুধাবন করা যাবে। সন্ধি-বিগ্রহের সময়, বিপদকালে কৃত উপকারের উপযোগিতা ও মিত্রনীতি এই লোককথার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

এক ঘন জঙ্গলে এক বিরাট বটগাছ ছিল। লতা জড়িয়ে উঠেছে বটগাছকে ঘিরে। সেই বটগাছে ছিল অনেক পাখির বাসা। গাছের গোড়ায়

বাস করত এক ইঁদুর। তার নাম পলিত। সে খুব চালাক। গাছের গুঁড়িতে একশোটা গর্ত করে রেখেছিল। গাছের ডালে বাস করত এক বেড়াল। তার নাম লোমশ। সে ছিল পাখিদের যম।

এইভাবে দিন কেটে যায়। কিছুদিন পরে সেই বনে এল এক চণ্ডাল। সে সেই বনে কুটির তৈরি করে বাস করতে লাগল। সে ওই বটগাছের কাছে প্রতিদিন সন্ধেবেলা ফাঁদ পেতে রাখত। রাত পোহালে সকালে আসত গাছের কাছে। ফাঁদে যেসব জীবজন্তু ধরা পড়ত তাদের নিজের কুটিরে নিয়ে যেত। একদিন হয়েছে কী, সেই বেড়াল হঠাৎ ফাঁদে ধরা পড়েছে। ইঁদুর তার শত্রুকে ফাঁদে পড়তে দেখেই ফোকর থেকে বেরিয়ে পড়ল। আর কোনো ভয় নেই। বেড়ালের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে আর মাঝে মধ্যে আড় চোখে বেড়ালকে দেখছে। হঠাৎ ইঁদুর দেখতে পেল, বেড়ালের খুব কাছে খাবার জিনিস রয়েছে। বেড়ালকে তো কোনো ভয় নেই! সে লাফিয়ে তার পিঠের ওপর চড়ে হাসতে হাসতে খেতে লাগল। বেড়াল আষ্টেপৃষ্ঠে ফাঁদে বাঁধা রয়েছে।

এমন সময় অল্প দূরে খাবার খুঁজছিল এক বেজি। তার নাম হরিত। হঠাৎ ইঁদুরের গায়ের গন্ধ পেয়ে ইঁদুরের দিকে এগোতে লাগল। সেই সময় গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এক প্যাঁচা গাছের ডালে এল। সেই প্যাঁচার নাম চন্দ্রক। ইঁদুর খেতে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ পাশে ও ওপরে দুই শত্রুকে দেখতে পেল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সে। ভাবতে লাগল, এখন প্রাণে বাঁচি কেমন করে? ভীষণ বিপদে পড়েছি। ফাঁদ থেকে নীচে নামলেই বেজি ধরবে, আর এই ফাঁদের ওপরে বসে থাকলে প্যাঁচা ধরবে। দুদিকেই মৃত্যু। আর এর মধ্যে যদি কোনোভাবে ফাঁদ থেকে বেড়াল বেরোতে পারে, তবে তার হাত থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। কিন্তু বাঁচতে আমাকে হবেই। বিপদে ভয় পেলে তো চলবে না। বুদ্ধি খাটাতে হবে। এই বেড়াল মহা বিপদে পড়েছে। ফাঁদে আটকে আছে। এই বেড়াল ছাড়া আমার বাঁচার অন্য কোনো পথ নেই। আমার শত্রু বেড়ালও বিপদে পড়েছে। আমি ওর উপকার করতে পারি। আমার প্রাণ বাঁচাতে বেড়ালের সাহায্যই এখন একমাত্র কাজ। আমার এই শত্রু বেড়ালের উপকার করে অন্য দুই শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে হবে। এই বেড়াল এখন ঘোর বিপদে পড়েছে, তাই বাধ্য হয়ে সে আমার সঙ্গে সন্ধি করবেই। মূর্খ মিত্রের চেয়ে পণ্ডিত শত্রুর সাহায্য নেওয়াই ভালো। যদি এই বেড়াল পণ্ডিত হয়, তাহলে বেড়ালের সাহায্যেই আমার প্রাণ রক্ষা পাবে।

এইসব কথা ভেবে চালাক ইঁদুর বেশ নম্র হয়ে বলল, বন্ধু, তুমি তো এখনও বেঁচে আছ। আমি আমার ও তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য তোমাকে বাঁচাতে চাই। তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। যদি তুমি আমাকে হিংসা না কর, আমার শত্রুতা না কর, তবে তোমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাব। আমি একটা ফন্দি এঁটেছি, তাতে তুমিও ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবে আর আমিও বিপদ থেকে বাঁচব। তাকিয়ে দেখ, সামনে বেজি আর মাথার ওপরে প্যাঁচা। ওরা দুজন যাতে আমাকে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য তুমি চেষ্টা কর। এখন তুমি আমার পরম বন্ধু। যাই হোক, এখন তোমার প্রাণের কোনো ভয় নেই। আমি বন্ধুর মতোই কাজ করব। আমি ছাড়া কেউ তোমাকে এই ফাঁদ থেকে বাঁচাতে পারবে না। আমি তুমি একই গাছের নীচে-ওপরে বাস করছি। তাই একে অন্যকে সাহায্য করা উচিত। আমি তোমাকে ফাঁদ থেকে বাঁচাব, কিন্তু তার আগে আমাকে তোমায় বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে।

বেড়ালও কম বুদ্ধিমান নয়। সে নিজের বিপদের কথা জানে। তাই ইঁদুরের দিকে মিটমিট করে চেয়ে বলল, বন্ধু, তুমি যে আমার প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছ, তাতে আমি তোমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। যদি মনে কর আমাদের দুজনের মধ্যে ভাব হয়েছে, তবে আর দেরি কর না। আমরা দুজনেই ঘোর বিপদে পড়েছি। এখন তাড়াতাড়ি ভাব করাই ভালো। যা হয় তাড়াতাড়ি কর। আমি বাঁধন থেকে মুক্ত হলে তোমার উপকারই করব। আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। তুমি আমাকে অধীন বলে জানবে।

ইঁদুর বেড়ালের মনের কথা বুঝে বলল, বন্ধু, কী করতে হবে তাই বলছি। বেজিকে দেখে আমার ভীষণ ভয় লাগছে আর প্যাঁচা আমার প্রাণ নিতে এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই আমি তোমার কোলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ব। তুমি আমাকে মেরে ফেল না। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার ফাঁদ কেটে তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচাব।

বেড়াল তাড়াতাড়ি বলল, তুমি আমার কোলের মধ্যে ঢুকে পড়ো। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার দয়াতে আমি ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে পারব। আবার জীবন ফিরে পাব। তুমি আমাকে যে আদেশ দেবে, আমি তাই মেনে চলব। দুজনে ভাব করি। তোমায়-আমায় আর কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি নেই। আমার কোলে ঢুকে পড়। দেরি করলে বিপদ বাড়বে।

বেড়ালের মনের ভাব বুঝতে পেরেই ইঁদুর বেড়ালের কোলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। ছোট্ট ছেলে যেমন বাবা-মায়ের কোলের মধ্যে শুয়ে থাকে।

তখন বেজি ও প্যাঁচা বেড়াল-ইঁদুরের বন্ধুত্ব দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন অবাক-করা বন্ধুত্ব তারা আগে দেখেনি। বুঝতে পারল, ওই ইঁদুরকে আর খাওয়া যাবে না। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল। মন খারাপ করে তারা দুজনে দুদিকে চলে গেল।

এদিকে বেড়ালের কোলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে ইঁদুর ফাঁদের দড়ি কাটতে লাগল। শিকারি চণ্ডাল পশুর নাড়ি দিয়ে ফাঁদের দড়ি তৈরি করেছিল। তবু ফাঁদ কাটতে অনেক দেরি হচ্ছে। তখন বেড়াল বলল, ভাই, তোমার বিপদ তো কেটে গিয়েছে। তবে ফাঁদ কাটতে তোমার এত দেরি হচ্ছে কেন? ব্যাধ হয়তো এক্ষুনি এখানে চলে আসবে। ভাই, তাড়াতাড়ি ফাঁদ কেটে দাও।

বেড়ালের কোলের মধ্যে থেকেই ইঁদুর বলল, বন্ধু, তুমি শান্ত হও, ব্যস্ত হয়ো না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কোনটা ঠিক সময় তা আমি খুব ভালোভাবে জানি। সে সময় কখনই পার হয়ে যাবে না। অসময়ে কাজ শুরু করলে তাতে ফল পাওয়া যায় না। ঠিক সময়ে কাজ শুরু করলেই সবার উপকার হয়। আমি যদি অসময়ে তোমার মুক্ত করে দি, তবে তোমার কাছ থেকে আমার বিপদ ঘটতে পারে। তাই তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে, শুধু শুধু ব্যস্ত হয়ো না। ব্যাধ অস্ত্র নিয়ে এখানে এলে আমাদের দুজনেরই ভয় লাগবে। ঠিক সেই সময়ে আমি তোমার ফাঁদ কেটে দেব। তখন তুমি ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে গাছে চড়বে, আমিও গাছের গর্তে ঢুকে পড়ব।

তখন বেড়াল বলল, বন্ধু, আমি যেমন তাড়াতাড়ি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, তুমিও সেইরকম আমাকে এখুনি মুক্ত কর। বেশি দেরি হলে আমাদের দুজনেরই ঘোর বিপদ ঘটতে পারে। ফাঁদ কেটে দাও বন্ধু। আর তুমি যদি আমাদের আগের শত্রুতা ভেবে দেরি কর, তবে আয়ু শেষ হবে। আমি যদি না বুঝে কোনোদিন তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকি, তবে এখন ক্ষমা চাইছি। তুমি আমায় মুক্ত করে দাও।

ইঁদুর বলল, বন্ধু, নিজেদের স্বার্থের জন্যই আমরা একে অপরের কথায় বিশ্বাস করেছি। আমাদের দুজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তাতে ভয়ের সম্ভাবনা আছে। বলবান ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে খুব সাবধানে নিজেকে না বাঁচাতে পারলে ভয়ের ব্যাপার হতে পারে। তাই পৃথিবীতে কেউ কারও

স্বাভাবিক শত্রু বা বন্ধু নেই। কেবল কাজের খাতিরেই একজনের সঙ্গে অন্যজনের বন্ধুত্ব বা শত্রুতা গড়ে ওঠে। হাতি দিয়েই বনের হাতি ধরা হয়, সেরকম অর্থ দিয়ে অর্থ সঞ্চিত হয়। কাজ শেষ হয়ে গেলে কেউ আর তার সম্মান করে না। তাই সব কাজেরই কিছুটা বাকি রেখে শেষ করা উচিত। ব্যাধ এখানে এলে তুমি আমাকে আক্রমণ না করে ভয়ে পালাতে চেষ্টা করবে। আর ঠিক সেই সময়েই আমি তোমাকে ফাঁদ থেকে মুক্ত করে দেব। সব দড়ি আমি কেটে ফেলেছি, আর মাত্র একটা বাকি আছে। খুব তাড়াতাড়ি আমি সেটাও কেটে দেব। তুমি শান্ত হয়ে বসে থাকো।

বেড়াল আর ইঁদুর এইভাবে কথাবার্তা বলছে। এমন সময় রাত শেষ হয়ে প্রভাত হল। রাত শেষ হয়ে আলো ফুটলে বেড়াল ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। অল্প পরেই পরিঘ নামে এক কালো লম্বা-চওড়া ব্যাধ ফাঁদের দিকে এগোতে লাগল। তার সঙ্গে অনেকগুলো কুকুর।

বেড়াল সেই ব্যাধকে দেখেই ভয়ে ইঁদুরকে বলল, বন্ধু, এখন কী করবে? বেড়ালের একথা শেষ না হতেই ইঁদুর ফাঁদের শেষ দড়ি কেটে দিল। বেড়াল ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়েই দৌড় দিল, লাফিয়ে গাছে উঠে পড়ল। ইঁদুরও দৌড়ে গাছের কোটরে ঢুকে পড়ল। ব্যাধ ফাঁদের কাছে এসে অবাক হল, চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। শেষকালে হতাশ হয়ে ফাঁদ তুলে নিয়ে বনের পথে চলে গেল।

ঘোর বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে গাছের ডালে বসে বেড়াল গর্তের ইঁদুরকে বলল, বন্ধু, তুমি আমার উপকার করেছ। তুমি আমার পরম বন্ধু। এখন তো আর কোনো বিপদ নেই। এই সুখের সময়ে তুমি কেন দূরে আছ বন্ধু? আমার সব বন্ধুবান্ধব এখন থেকে তোমায় পুজো করবে। তুমি আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছ, তোমাকে পুজো করব না? তুমি আমার সব কিছুর মালিক হও। তুমি মন্ত্রী হয়ে আমাকে তোমার ছেলের মতো শাসন কর। আমি নিজের জীবন দিয়ে পণ করছি, আমার কাছ থেকে তোমার কোনো বিপদ ঘটবে না। আমি চিরকাল তোমার অধীন হয়ে থাকব।

বেড়ালের এই কথা শুনে ইঁদুর মধুর গলায় বলল, বন্ধু লোমশ, আমি তোমার সব কথা শুনেছি। তুমি যা বললে তা সবই ঠিক। এখন আমি যা বলব তা মন দিয়ে শোন। শত্রু মিত্র দুজনকেই ভালোভাবে পরখ করা দরকার। কিন্তু সেটা বড়ই কঠিন। অনেক সময় শত্রুরা মিত্র আর মিত্ররা শত্রু হয়ে

যায়। এই জগতে কেউ কারও বন্ধু নেই। শুধু স্বার্থের জন্যই কেউ কারও বন্ধু হয়, কখনও শত্রু হয়। চিরকালের জন্য মিত্রতা কিংবা শত্রুতা প্রায়ই দেখা যায় না। এই জগতে সব লোকই নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। বন্ধু, তুমি ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়েই স্বার্থপর হয়ে উঠলে? তুমি এখন যে মধুর ভাষায় আমাকে ডাকছ, তা শুধুমাত্র তোমার স্বার্থের জন্য। তোমার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তার বিশেষ কারণ ছিল। কিন্তু এখন অমন ভাব জমাবার কী দরকার? তোমার খাদ্য হওয়া ছাড়া অমি তো আর কোনো কারণ দেখি না। কিন্তু তুমি যাতে আমাকে খেতে না পার, সেদিকেও আমি খেয়াল রাখব। মেঘ যেমন সব সময় নিজের আকার পালটে ফেলে, তোমার ভাবও সেইরকম। আজকেই ফাঁদে পড়বার আগে তুমি আমার শত্রু ছিলে, আবার আজই তুমি আমার বন্ধু হয়েছ। যতক্ষণ আমাদের দরকার ছিল, ততক্ষণ আমরা বন্ধু ছিলাম। দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে, ভাবও মিলিয়ে গিয়েছে। তুমি আমার স্বাভাবিক শত্রু, কাজের খাতিরে বন্ধু হয়েছিলে। তাহলে তুমিই বল বন্ধু, এত কথা জেনেও আমি কেন তোমার ফাঁদে পা দেব? তোমার শক্তিতে আমি মুক্ত হয়েছি, তুমিও আমার শক্তিতে মুক্ত হয়েছ। আর তো কোনো দরকার নেই। আমাকে খাওয়া ছাড়া তোমার আর কোনো অভিসন্ধি নেই। আমি খাদ্য, তুমি খাদক। আমি দুর্বল, তুমি সবল। আমাকে খাওয়ার জন্যই এখন আমার এত প্রশংসা করছ। তোমার খুব খিদে পেয়েছিল বলেই খাবারের খোঁজে বেরিয়েছিলে, হঠাৎ ফাঁদে আটকে পড়েছিলে। সেই তখন থেকে কিছু খাওনি। তাই ফাঁদ থেকে ছাড়া পেয়ে তোমার আরও খিদে পেয়েছে। তাই খিদের জ্বালায় তুমি কৌশল করে আমাকে খেতে চাও। আর যদি আমাকে খেতে না চাও, তবু তোমার কাছে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা, তোমাব ছেলে-বউ আছে। তারা কেন আমাকে খাবে না? তাই তোমার সঙ্গে আর ভাব করব না। ভাব করার কারণ এখন আর নেই। তোমার ভালো হোক। আমি চললাম। তোমাকে দূর থেকে দেখেও ভয় করছে। তবে তুমি যদি আমার উপকারের কথা মনে রাখ, তবে আমি অসাবধানে থাকলেও আমাকে মেরো না। কিন্তু মেলামেশা আমি কখনই করব না। বলবান লোকের কাছ থেকে সবসময় দূরে থাকাই ঠিক।

বেড়াল ইঁদুরের কথায় বেজায় লজ্জা পেল। তবুও বলল, ভাই ইঁদুর, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি তোমার কোনো অনিষ্ট চিন্তা করিনি। বন্ধুর

অনিষ্ট কখনও করতে নেই। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ বলেই তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। তুমি কী করে ভাবলে আমি তোমার ক্ষতি করব? তুমি যদি আদেশ কর, তবে আমি-ছেলে-মেয়ে-বউ সবাই প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর বন্ধু।

ইঁদুর গম্ভীর হয়ে বলল, লোমশ, তুমি সাধু, তুমি যা বললে আমি সব শুনলাম। কিন্তু আমি জানি, যে খুব প্রিয় তাকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাই তুমি আমাকে পুজোই কর আর ধনদৌলতই দাও, আমি তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করব না। ওগো বেড়াল, তুমি আমাদের চিরকালের শত্রু, তোমার থাবা থেকে বাঁচাই আমাদের একমাত্র কাজ। তোমাকে কেনো কালে বিশ্বাস করব না। তুমিও নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে।

ইঁদুরের এই কথায় বেড়াল ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ব্যাধের কথা তার মনে পড়ল। চণ্ডালের ভয়ে বেড়াল মহাবেগে পালিয়ে গেল। ইঁদুর গর্তে লুকিয়ে পড়ল।

যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতামহ! আপনি কি কখনও কোনো মানুষকে প্রাণত্যাগের পর পুনরুজ্জীবিত হতে দেখেছেন কিংবা শুনেছেন? অত্যন্ত কঠিন ও জটিল প্রশ্ন। তখন পিতামহ নাতির এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে 'শকুন ও শেয়ালের কথা' বললেন। লোককথার মাধ্যমে ভীষ্ম বলতে চেয়েছেন, একদিকে দৈববল ও অন্যদিকে অধ্যবসায় থাকলে আশ্চর্য ফল লাভ করা যায়। পৌরাণিক ভারতীয় দর্শনের প্রভাবে ভীষ্ম শুধুই দৈববলের কথা বলেননি, অধ্যবসায়ের মতো একটি বাস্তব বিষয়কেও দৈববলের মতোই গুরুত্ব দিয়েছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে এই লোককথাটি রয়েছে।

এই লোককথাটির শেষাংশে পার্বতী-মহাদেবের কথা এসেছে। অথচ প্রথমাংশে এটি লৌকিক জনজীবনের লোককথার সমস্ত গুণ নিয়ে উপস্থিত রয়েছে। লোককথার শেষাংশে থাকে, শেষকালে দেবতা এসে বর দিলেন। এখানে পৌরাণিক দেবদেবী এসেছে। উচ্চতর সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় এই পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তা ছাড়া, এটির প্রাণ ও গঠনরীতি নিঃসন্দেহে লৌকিক।

অনেক অনেক কাল আগে নৈমিষারণ্যে একজন লোক বাস করত। অনেক দিন পরে তার একটি ছেলে হল। কিন্তু ছেলেটি বেশিদিন বাঁচল না।

সে অল্প বয়সে মারা গেল। শুধু বাবা-মা নয়, পড়শিরাও খুব কাঁদতে লাগল। সবাই খুব ভালোবাসত ছোট্ট ছেলেটিকে।

কিন্তু কী আর করবে! শেষকালে তাকে কোলে নিয়ে শ্মশানে যেতেই হল। কিন্তু কোল থেকে কিছুতেই মাটিতে নামাতে মন চাইছে না। ছোট্ট ছেলেকে ফেলে রেখে কেউ বাড়ি ফিরতে চাইছে না। শুধুই কাঁদছে।

তাদের কান্না শুনে এক শকুন সেখানে উড়ে এল। বলল, সবাইকেই একদিন মরতে হবে। তাই এই ছেলেটিকে এখানে রেখে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। এখানে হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহকে ফেলে রেখে আত্মীয়রা বাড়ি ফিরে গিয়েছে। জগতে সুখ দুঃখ দুইই আছে। সবাই কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ করে। দুনিয়ার নিয়ম হল, সবাইকেই একদিন মরতে হবে। আর যে একবার মারা যায় তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। সে আর বেঁচে ওঠে না। সূর্য ডুবে যাচ্ছে, তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।

শকুনের কথা শুনে ছেলেকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির পথে ফিরে চলল।

ঠিক সেই সময় গর্ত থেকে বেরিয়ে এল একটা শেয়াল। তার রং কালো। সে তাদের বকাবকি করে বলে উঠল, তোমরা তো ভীষণ নির্দয়, একটুও দয়ামায়া নেই তোমাদের! এখনও সূর্য ডোবেনি, দিনের আলো রয়েছে। আর এই দিনের আলোতেই তোমরা ভয় পেয়ে গেলে? ছোট্ট ছেলের স্নেহ ভুলে তোমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছ? মুহূর্তের প্রভাব অতি চমৎকার। মুহূর্তের প্রভাবে এই ছেলে আবার বেঁচে উঠতে পারে। যার আধো আধো মিষ্টি কথা শুনে তোমাদের মন ভরে যেত, সেই ছোট্ট ছেলেকে কী বলে শ্মশানে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছ? এত তাড়াতাড়ি তার স্নেহের কথা ভুলে গেলে? হায়! এতদিন পরে আমি বুঝতে পারলাম মানুষদের একেবারে দয়া নেই, স্নেহ-মমতা নেই। দুর্বল, অভিযুক্ত ও শ্মশানে মৃত ব্যক্তির কাছে যদি আত্মীয়-স্বজন থাকে তবে কেউ তাদের আক্রমণ করতে সাহস করে না। তোমরা ওকে ছেড়ে বাড়ি ফিরে যেয়ো না।

কালো শেয়ালের কথা শুনে তারা আবার শ্মশানে ছেলেটির কাছে ফিরে এল। তখন শকুন বলল, তোমরা দেখছি বোকারও অধম। নইলে কোথাকার কোন শেয়ালের কথা শুনে ফিরে এলে? ওর না আছে বুদ্ধি, না আছে কিছু। আর তোমরাই বা কেমনধারা মানুষ? কাঠের মতো পড়ে আছে যে মরা

ছেলে, তার জন্য এমন শোক করছ? শোক করে লাভ নেই। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য জন্ম থেকেই থাকে। তোমাদের দুর্ভাগ্য, এই ছেলে তোমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। আগের জন্মের ফল। আগের জন্মে সুখদুঃখ সংগ্রহ করেই তবে মানুষ জন্মায়। তাই তোমরা খুব অধর্ম করছ। শোক-স্নেহ ছেড়ে দিয়ে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। বৃথাই কান্নাকাটি করছ।

শকুনের এই কথা শুনে একজন পড়শি বাড়ির পথে হাঁটা দিল। তখন তাকে যেতে দেখে শেয়াল বলল, এই লোকটি বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি, শকুনের কথায় এর স্নেহ চলে গিয়েছে। এই ছেলেটি মারা যাওয়ায় তোমাদের যে কত কষ্ট হয়েছে আমি তা বুঝতে পারছি। আমার চোখও জলে ভিজে উঠল। সব বিষয়েই চেষ্টা করা দরকার। খুব ভালোভাবে চেষ্টা করা দরকার। চেষ্টা করলে দৈববল পাওয়া যায়, দুটো মিললে কাজ সফল হয়। আর মনের বল ও নিজের ক্ষমতা দিয়ে দৈববল লাভ করা যায়। সবসময় শোক করা ঠিক না, আহা-উহু করে কোনো লাভ নেই। চেষ্টা করতে হবে। শোক করে কোনো কিছু পাওয়া যায় না, বরং চেষ্টা করলেই ফল পাওয়া যায়। তাই এই ছেলেকে বাঁচাবার জন্য তোমরা চেষ্টা কর। স্নেহ ভুলে নিষ্ঠুর হয়ে কেন এখান থেকে চলে যাবে? তোমরা অপেক্ষা কর। সূর্য ডুবে গেলে হয় তোমরা ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে কিংবা এখানেই বসে থাকবে।

তখন শকুন বলল, মানুষ, তোমরা শোন। আমার বয়েস এক হাজার বছর। কিন্তু কোনোদিন কাউকে বেঁচে উঠতে দেখিনি। একবার মারা গেলে তাকে আবার বাঁচতে দেখিনি। কেউ কেউ জন্মাবার আগেই মায়ের পেটে মরে যায়। কেউ জন্মাবার পরে অনেকদিন বেঁচে থাকার পর মরে। নানা বয়সে প্রাণী মারা যায়। সবই অনিত্য। পরমায়ু ফুরিয়ে গেলেই সে মারা যায়। অনেকের অনেক সাধ-আহ্লাদ থাকে, কিন্তু সে সব না মিটতেই তাদের চলে যেতে হয়। তাই ওই ছেলের জন্য স্নেহ দেখিয়ে আজ আর কোনো লাভ নেই। আমার কথাবার্তা খুব কঠোর বলে তোমাদের মনে হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। যে যায় সে আর ফেরে না। তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।

শকুনের এই উপদেশ শুনে তারা বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হল। উঠে পড়ল।

শেয়াল তাড়াতাড়ি তাদের খুব কাছে চলে এল। মৃত ছেলেকে দেখে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমরা শকুনের কথায় এমন আদরের

ছেলেকে ফেলে বাড়ি ফিরে যাচ্ছ? যে মারা গিয়েছে সে-ও আবার বেঁচে উঠতে পারে। একেবারে আজগুবি কথা নয়। তোমরা এখানে সবসময় কাঁদলে হয়তো কোনো দেবতা দয়া দেখিয়ে ওকে বাঁচিয়েও তুলতে পারে।

শেয়ালের কথায় তারা আবার মাটিতে বসে পড়ল। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আবার কাঁদতে লাগল।

তাদের কান্না শুনে শকুন আবার উড়ে এল তাদের কাছে। বলল, তোমরা অকারণে এই ছেলের দেহ চোখের জলে ভাসাচ্ছ, এর দেহকে নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করছ। কেউ ওর ঘুম ভাঙাতে পারবে না। ও শিশু আর বেঁচে উঠবে না। শত শত শেয়াল শত শত বছর ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করলেও ছেলে আর বেঁচে উঠবে না। বৃথা, বৃথা শোক করা। তবে দেবতা যদি বর দেন তবেই এই ছেলে বাঁচতে পারে। তোমরা হাজার কান্নাকাটি করলেও বাঁচবে না। কান্নাকাটি করে লাভ নেই।

শকুনের কথা শুনে ছেলের পড়শিরা বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠে পড়ল। ভাবল, সত্যি, এখানে থেকে আর কোনো লাভ নেই।

তখন শেয়াল বলল, এই পৃথিবী বড় ভয়ানক জায়গা, এখানে কারও নিস্তার নেই। আপনজনের মৃত্যু বড় কষ্টের। তোমাদের শরীরে কি একটুও দয়ামায়া নেই? এই শয়তান শকুনের কথায় তোমরা ফিরে যাচ্ছ? সুখের শেষে দুঃখ ও দুঃখের শেষে সুখ হয়। কেউ চিরকাল সুখ কিংবা চিরকাল দুঃখ ভোগ করতে পারে না। কোথায় যাচ্ছ তোমরা? দুঃখের শেষে সুখ আসতে পারে। এই ছেলে আবার বেঁচে উঠবে, তোমাদের দুঃখ ঘুচবে। এই শিশুকে ত্যাগ করে কোথাও যেয়ো না।

শকুন বলল, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। শ্মশানে ছেলেকে ফেলে রেখে তোমরা ফিরে যাও। শেয়ালেরা চিৎকার করছে। মাংসাশী প্রাণীরা চারিদিকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। আঁধার ঘনিয়ে এলেই হিংস্র জন্তুরা তোমাদের আক্রমণ করবে। এ এক ভয়ানক জায়গা। শেয়ালের কথা শুনো না। আর যদি বুদ্ধির দোষে শেয়ালের কথা শোন, তবে সবাইকেই এই শ্মশানে মরতে হবে।

শেয়ালও বলে উঠল, সূর্য এখনও ডোবেনি, চারিদিকে আঁধার হয়ে আসেনি। স্নেহের টানে অন্তত ততক্ষণ তোমরা অপেক্ষা করো! মোহের বশে শকুনের নিষ্ঠুর কথা শুনো না।

এইভাবে শেয়াল ও শকুন মৃত ছেলের পড়শিদের নানা যুক্তি দেখাতে লাগল। একসময় তারা শেয়ালের কথায় সেখানে বসে পড়ে, আবার অন্যসময় শকুনের কথায় বাড়ির পথে চলে। কার কথা শোনা উচিত তা তারা ঠিক করতে পারছে না। শেষকালে শ্মশানে ছেলেকে ঘিরে বসে থাকাই স্থির হল। তারা ছেলেকে নিয়ে কাঁদতে লাগল। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারা কাঁদছেই, কাঁদছেই...।

পার্বতীর মনে খুব দয়া হল। পার্বতী শিবকে পাঠিয়ে দিলেন। শিবের মনেও খুব কষ্ট। শিব এসে বললেন, আমি তোমাদের বর দিতে এসেছি। তোমরা যা চাও এখুনি তাই পাবে।

পড়শিরা বলল, দেবতা, এই শিশুর মৃত্যুতে আমারও মরার মতো হয়ে পড়েছি। একে জীবন দিয়ে আমাদেরও বাঁচান।

দেবতা তখন জলের ছিটে দিয়ে বললেন, শতায়ু হও। অমনি ছেলে বেঁচে উঠল, চোখ খুলল। তারা আনন্দ করতে করতে ছেলেকে নিয়ে ফিরে চলল। আনন্দ দেখে কে!

সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বিবরণ শোনাচ্ছেন। তাঁর বিবরণ থেকেই আমরা এই 'হাঁস ও কাকের' বৃত্তান্তটি জানতে পারি। এই পশুকথাটি রয়েছে মহাভারতের কর্ণপর্বে। দুর্যোধন অনেক চেষ্টার পর মদ্ররাজ শল্যকে কর্ণের রথের সারথি হতে রাজি করালেন। দুর্যোধন মনে করেছিলেন, কর্ণের মতো যোদ্ধার সারথি যদি মহাত্মা শল্য হন তবে পার্থগণ অবশ্যই সমরে পরাভূত হবেন। কেননা, মদ্ররাজ শল্য অর্জুনের সারথি কৃষ্ণের চেয়েও উৎকৃষ্ট। ইন্দ্রের সারথি মাতলির সঙ্গেই কেবল শল্যের তুলনা করা যায়। দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, হে মহাবীর, পূর্বে সুররাজ যেমন অসুর সংহার করেছিলেন, সে রকম তুমি এখন পাণ্ডববিনাশে প্রবৃত্ত হও। সেনাপতির পদ পেয়ে মহাধনুর্ধর কর্ণ অভিমান, দর্প ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে শল্যকে বললেন, আমি রথারোহণ ও অস্ত্র ধারণ করলে ক্রোধাবিষ্ট বজ্রপাণি পুরন্দরকে নিরীক্ষণ করেও ভীত হই না। আরও নানাবিধ আত্মশ্লাঘার কথা বললে শল্য বিরক্ত হলেন। তাঁর আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। তিনিও তো কম বড় বীর ছিলেন না। শল্য কর্ণের পরাজয় ও ভীরুতার অনেক কাহিনি বিবৃত করবার পরে এই লোককথাটি শোনালেন। হাঁস কাককে পরাজিত করেছিল, কাক ক্ষমাগুণ অবলম্বন করে উচ্ছিষ্টভোজী হয়েছিল। কর্ণও সেই

কাকের মতো দুর্যোধনের উচ্ছিষ্ট অন্নে প্রতিপালিত হয়ে সকলকেই অবজ্ঞা করতে শিখেছে। শল্য উদ্ধত কর্ণকে গল্পচ্ছলে উপদেশ দিলেন, সেই কাক যেমন বুদ্ধি করে হাঁসকে আশ্রয় করেছিল, সেরকম কর্ণ তুমিও কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আশ্রয় করো। ওই দুই বীরকে আর অবজ্ঞা করো না।

মানবচরিত্রের এই ত্রুটির বিষয়ে উপদেশ দিতে শল্যকে একটি লোককথার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্মই যুধিষ্ঠিরকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতে সবচেয়ে বেশি লোককথার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ভীষ্ম মহাপ্রাজ্ঞ, তাই তাঁর পক্ষে লোককথা ব্যবহার করা স্বাভাবিক। কিন্তু যোদ্ধা শল্যও লোককথা ব্যবহার করছেন, এটাই বিস্ময়ের। তৎকালীন মহাভারতীয় সমাজ-জীবনে লোককথার প্রভাব বিস্তৃত না থাকলে শল্যের মুখে মাহভারতকার এই 'বৃত্তান্ত' শোনাতেন না।

সমুদ্রপারে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। রাজার রাজ্যে বাস করতেন এক বৈশ্য। তিনি ছিলেন দাতা, ধার্মিক, সব প্রাণীকে তিনি ভালোবাসতেন। তার ছিল অনেকগুলো ছেলে। তারা একটা কাক পুষেছিল। ছেলেদের উচ্ছিষ্ট খেত সেই কাক। তারা ছিল বড়লোক। তারা খেত দই, ঘি, পায়েস, ক্ষীর, মধু। তাই এসব ভালো ভালো জিনিসের উচ্ছিষ্ট খেয়ে খেয়ে কাকেরও দেমাক গেল বেড়ে। সে নিজের জাতভাই কাকদের দেখতে পারত না। তার চেয়ে অনেক ভালো ভালো সুন্দর দেখতে পাখিদেরও দুচোখে দেখতে পারত না। সবাইকেই সে নিচু চোখে দেখে, হেয় মনে করে।

একদিন কয়েকটা হাঁস সেই সাগরতীরে এল। তাদের দেখতে সুন্দর, তারা চঞ্চল, তাদের প্রচণ্ড গতি। ছেলেরা সেই হাঁসদের দেখতে দেখতে কাককে বলল, ওহে কাক! তুমি সব পাখির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। উচ্ছিষ্ট-খাওয়া সেই কাক ছেলেদের কথার আসল অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। তাদের ঠাট্টা বুঝতে পারল না। উলটে কাক ভাবল, ছেলেরা সত্যি কথাই বলেছে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার দেমাক আরও বেড়ে গেল।

কাক মনে মনে ভাবল, এই হাঁসদের মধ্যে কে সর্দার সেটা জানা দরকার। এই মনে করে সে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। হাঁসদের কাছে এসে একটা হাঁসকে দেখে কেন যেন তার মনে হল, এই হাঁসই নিশ্চয়ই এদের সর্দার।

কাক সেই হাঁসকে বলল, এসো, আমরা দুজনে আকাশে উড়ি।

এই কথা শুনে আশেপাশের সব হাঁস হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তারা বলল, হায় কাক! কী দুর্মতি তোমার! আমরা হলাম মানসসরোবরের হাঁস, আমরা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই। বহু বহু দূরে আমরা উড়ে যেতে পারি, আমাদের ডানায় যে অসীম শক্তি। তাই দুনিয়ার সব পাখি আমাদের আদর করে, আমাদের ওড়ার শক্তি নিয়ে কখনও কেউ পাল্লা দিতে আসে না। আর তুমি কাক হয়ে কোন সাহসে আমাদের সঙ্গে আকাশে উড়তে চাইছ? আচ্ছা বল তো, তুমি কীভাবে আমাদের সঙ্গে আকাশে উড়বে?

তখন কাকের দেমাক আরও বেড়ে গেল। সে যে হাঁসের তুলনায় কিছুই নয় তা মনে থাকল না। সে হাঁসদের কোনোই পাত্তা না দিয়ে বলল, আমি একশো রকমের ওড়া জানি। আমি এক এক বার উড়ে একশো যোজন পথ ওপরে উঠতে পারি। আমি তোমাদের সামনে আকাশে ওপরে উঠব, নীচে নেমে আসব, সমান গতিতে সবদিকে যাব, সাধারণভাবে উড়ব, আস্তে উড়ব, সুন্দর গতিতে, এঁকেবেঁকে, কখনও জোরে, কখনও আস্তে, অল্পক্ষণের মধ্যে একবার ওপরে একবার নীচে, পেছনে পিছিয়ে গিয়ে, ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে, প্রচণ্ড বেগে, একেবারে পাথরের মতো থেমে গিয়ে ডানা না নড়িয়ে উড়তে পারি। আমি কাকদের সবরকম ওড়া জানি। এখন বল, আমি কীভাবে আকাশে উড়ব? তোমরা যেমনভাবে বলবে, আমি সেভাবেই আকাশে উড়ব। কিন্তু খুব ভেবেচিন্তে বলবে। কেননা, তোমাদেরও সেইভাবে আমার সঙ্গে উড়তে হবে। একইভাবে দুজনকে পাল্লা দিতে হবে। ভেবেচিন্তে বল।

এইসব কথাবার্তা যখন চলছে, তখন আরও কয়েকটা কাক সেখানে উড়ে এল। তারা সব শুনতে লাগল।

কাকের কথায় তখন একটা হাঁস বলল, হে কাক! তুমি একশো রকমের ওড়া জানো। কিন্তু আমারা একটা মাত্র ওড়ার কায়দা জানি। যেমন জানে অন্য সব পাখি। আমি ওই একটা ওড়া জেনেই তোমার সঙ্গে আকাশে উড়ব। এখন আগে তোমার ইচ্ছেমতন তুমি আকাশে উড়ে যাও।

অন্য সব কাক হেসে হেসে বলে উঠল, এই হাঁস জানে মাত্র একটা কায়দা, ও কীভাবে কাককে হারাবে? কাক তো জানে একশো কায়দা।

তখন কাক আর সেই হাঁস আকাশে উড়ল। কাক তার জানা অনেক কৌশল করে উড়তে লাগল। নীচে কাকেরা চিৎকার করে তাকে বাহবা দিতে

লাগল। হাঁসরাও গাছের ডালে চড়ে আবার কখনও বালুতীরে উড়ে গিয়ে ওপরের হাঁসকে উৎসাহ দিতে লাগল।

হাঁস শুধু আস্তে ডানা মেলে ওপরে উঠতে চাইছে। আর তখুনি কাক অনেক জোরে উড়ে ওপরে উঠে গেল। এই দেখে নীচের কাকরা চিৎকার করে বলল, ওহে হাঁসরা, তোমাদের মধ্যে যে হাঁস ওপরে উড়তে গিয়েছে, তার দশা দেখ। সে কাকের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে।

আকাশের হাঁস নীচের কাকদের এই কথা শুনতে পেল। শুনতে পেয়েই সে সাগরের ওপর দিয়ে মহাবেগে উড়তে লাগল। কাক হাঁসের ওড়া দেখে অবাক হয়ে গেল। একটু পরেই কাক ক্লান্ত হয়ে পড়ল। নীচে তাকিয়ে দেখে, কোনো ডাঙা নেই, কোনো গাছ নেই— শুধুই ঘন নীল জল। হায়! এখন সে নামবে কোথায়? শুধুই সাগরজল! এদিকে ডানা আর সোজা রাখতে পারছে না। কাক ভাবল, নীচে যদি পড়ি তবে সেখানে রয়েছে প্রচণ্ড ঢেউ ও সাংঘাতিক সব জলজন্তু। আকাশের মতোই বিশাল ওই সমুদ্র। এখন আমি এত দূরের সাগরতীরে যাব কেমন করে?

এদিকে সাগরের ওপর দিয়ে হাঁস বহু বহু দূরে চলে গিয়েছে। তারপর গতি থামিয়ে কাকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কাক ক্লান্ত হয়ে টল্‌তে টলতে সেই হাঁসের কাছে এল। হাঁস দেখল, কাক আর উড়তে পারছে না, এই বুঝি জলে পড়ে যাবে।

হাঁস কাককে বাঁচাবার জন্য আরও কাছে এসে বলল, হে কাক, তুমি একশো রকমের ওড়ার কায়দা জানিয়ে গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছ। তা তুমি এখন যেভাবে উড়ছ তার নাম কী? এই ওড়ার নাম তো আগে করনি? তুমি তোমার দুটো ঠোঁট আর দুটো ডানা দিয়ে বারবার সাগরের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছ— এই ধরনের ওড়ার নাম কী? আমি এখানে রয়েছি, তুমি তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসো।

কাক সাগরের তীর দেখতে না পেয়ে জলে ডুবতে ডুবতে কোনোরকমে বলল, হে হাঁস, আমরা হলাম কাক। কা কা শব্দ করে আমরা এখানে ওখানে উড়ে বেড়াই। এখন আমি এখানে মরতে বসেছি। তুমি আমাকে বাঁচাও। হাঁস, আমাকে সাগরতীরে নিয়ে যাও।

এই কথা বলতে বলতেই কাক ঠোঁট গুঁজে জলে পড়ে গেল। তার ডানা ছড়িয়ে পড়ল জলে। সে কোনোরকমে ডানা ঝাপটাতে লাগল।

কাকের এই দশা দেখে হাঁস বলল, হে কাক, তুমি বড্ড বড়াই করে বলেছিলে তুমি একশো রকমের ওড়ার কায়দা জানো। এখন সেই কথা মনে করো। তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো উড়তে জানো, তুমি একশো কায়দা জানো। তবে এখন আমার সাহায্য চাইছ কেন? এত কায়দা জেনেও সাগরজলে আছড়ে পড়লে কেন?

তখন কাক ওপরের দিকে তাকিয়ে হাঁসকে বলল, হাঁস, আমি অন্যের উচ্ছিষ্ট খেয়ে নিজেকে সোনার মতো মনে করতাম। ভাবতাম, আমি সব কাকের চেয়ে সেরা, সব পাখির চেয়ে সেরা। তাই সব কাক সব পাখিকে আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতাম। আমার ভীষণ গর্ব হয়ে গিয়েছিল। এখন জীবন বাঁচাবার জন্য তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি আমাকে বাঁচাও। আমাকে কোনো দ্বীপে নিয়ে চল। যদি প্রাণে বেঁচে কোনোরকমে নিজের দেশে যেতে পারি তাহলে আর কখনও কাউকে হেলাফেলা করব না, কাউকে অপমান করব না। তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর। বাঁচাও আমাকে।

তখন হাঁস কাকের করুণ অবস্থা দেখে নেমে এল। দুটো পা দিয়ে জল থেকে কাককে তুলে নিল। তারপরে নিজের পিঠের ওপর বসিয়ে নিল। উড়তে উড়তে সেই সাগরতীরের দ্বীপে এসে থামল। হাঁস দ্বীপে নামতে নামতে বলল, কাক, তোমার আর কোনো ভয় নেই।

যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের কাছে রাজ্যের উন্নতিকারক নীতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন ভীষ্ম জাতি পরিবর্তনে পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ, অকৃতজ্ঞের অধোগতি, নীচসম্পর্ক নিন্দা-উচ্চসম্পর্কের উৎকর্ষ এবং জাতিগুণের অনুরূপ কাজে নিয়োগ বিষয়ে জ্ঞান দিতে গিয়ে 'কুকুর ও শরভের কথা' লোককথাটি বলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে এই লোককথাটি রয়েছে। রাজ্যশাসনের মতো জটিল বিষয়ে উপদেশ দিতে পিতামহ লোককথার আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিষয়টি সহজে বোঝানো যাবে বলেই এই উদাহরণ প্রয়োগ করেছেন। এই লোককথাটি ভীষ্ম শুনেছিলেন তপোবনে। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম মুনিদের কাছে এই গল্প করেন। ভীষ্ম সেই 'পুরাতন ইতিহাস' নাতি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন। লোককথাটি অনন্যসাধারণ কবি-পণ্ডিত বেদব্যাসের হাতে পড়ে উন্নত লিখিত সাহিত্যের রূপ নিয়েছে, কিন্তু লোককথাটির প্রাণ যে লোকসমাজ থেকে আহরণ করা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লোককথার সমস্ত বিশেষত্বই রয়েছে এর মধ্যে।

তপোবনে অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজে যে এই লোককথাটির প্রচলন ছিল তা ভীষ্মের উক্তিতেই প্রমাণিত।

সংস্কৃত হিতোপদেশে 'পুনর্মুষিকো ভব' পশুকথাটির কথা মনে পড়বে। গল্পের পাত্রপাত্রী আলাদা হলেও মূল কাঠামো ও বক্তব্য এক।

অনেক অনেক কাল আগে এক বনে এক মুনি বাস করতেন। ওই বনে কোনো লোকজন ছিল না। গাছের ফলমূল খেয়ে মুনির দিন কাটত। বনের সব পশু মুনির আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। বাঘ, হাতি, চিতা, গণ্ডার, ভালুক খুব হিংস্র। কিন্তু শিষ্যের মতো শান্ত হয়ে তারা মুনির কাছে আসত, মুনি কেমন আছেন জেনে যেত।

মুনির আশ্রমে এক গেঁয়ো কুকুর ছিল। ওই কুকুর মুনির মতো ফলমূল খেত। সে প্রায়ই উপবাস করত। কুকুর খুব দুর্বল আর শান্ত ছিল। মুনিকে ছেড়ে সে অন্য কোথাও যেত না। মুনিও তাকে খুব স্নেহ করতেন।

একদিন একটা ছোট বাঘ খিদের জ্বালায় ছটফট করছিল। শিকারের আশায় সে আশ্রমের কাছে চলে এল। কুকুর সেই বাঘকে দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, মুনি, ওই দেখুন, কুকুরদের পরম শত্রু বাঘ আমাকে খেতে এগিয়ে আসছে। আমাকে বাঁচান।

মুনি সব বুঝলেন, কুকুরের ভয়ের কারণ বুঝলেন। বললেন, বাছা, ছোট বাঘকে আর তোমার ভয় পেতে হবে না। সে তোমাকে মারতে পারবে না। তুমি তোমার রূপ ছেড়ে দাও, তুমি বাঘের রূপ নাও।

মুনি এই কথা বলামাত্র কুকুর ছোট বাঘ হয়ে গেল। তার ভয় চলে গেল। তখন বন থেকে আসা সেই ছোট বাঘ তার সামনে আর একটা ছোট বাঘকে দেখতে পেল। একই পশু দুটি। তাই বনের ছোট বাঘের রাগ পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বনের এক বিরাট বাঘ সেই ছোট বাঘের সামনে লাফিয়ে পড়ল। বড় বাঘের ভীষণ খিদে পেয়েছে। ছোট বাঘ ভয়ে মুনির কাছে দৌড় দিল। মুনি দেখলেন, ছোট বাঘ বড় বাঘকে দেখে ভয়ে কাঁপছে। তখন তিনি ছোট বাঘকে সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বাঘ করে দিলেন। তখন বনের বড় বাঘ তার সামনে তারই মতো বিরাট বাঘ দেখতে পেয়ে শান্ত হল।

এখন হয়েছে কী, আগে কুকুর বনের ফলমূল খেত। কিন্তু বড় বাঘ হবার পরে সে ফলমূল খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিল। তখন থেকে সে

পশুরাজ সিংহের মতো বনের জন্তুদের শিকার করতে লাগল। সে মাংস খেতে শুরু করল।

একদিন সেই বাঘ একটা হরিণ শিকার করেছে। মাংস খাওয়া হয়ে গিয়েছে। সে আরামে বিশ্রাম করছে। এমন সময়ে এক বিশাল হাতি তার সামনে এল। হাতির গায়ের রঙ কালো মেঘের মতো। বাঘ সেই বিশাল কালো হাতিকে দেখে ভয়ে মুনির কাছে দৌড় দিল। মুনি তক্ষুনি বাঘকে বিশাল হাতি করে দিলেন। বনের হাতি তার সামনে তারই মতো আর একটা হাতিকে দেখে শান্ত হল। বনের হাতি বনের পথে চলে গেল। তখন থেকে মুনির সেই হাতি বাবলা আর পদ্মবনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এইভাবে অনেক অনেক দিন কেটে গেল।

এমন সময় একদিন পাহাড়ি গুহার এক বিরাট সিংহ হঠাৎ সেই হাতির সামনে এল। সেই হাতি বলবান সিংহকে দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মুনির কাছে গেল। মুনি সব বুঝলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতিকে সিংহ করে দিলেন। পাহাড়ি গুহার সিংহ তার সামনে দাঁড়ানো সিংহকে দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল। সে বনে পালিয়ে গেল।

এখন সেই সিংহ মুনির আশ্রমেই থাকতে লাগল। ছোট ছোট যেসব পশু আশেপাশে ছিল, তারা প্রাণের ভয়ে বন ছেড়ে পালাতে লাগল। এমনি করে আরও কিছুকাল কেটে গেল।

এমন সময় একদিন মুনির আশ্রমে এল এক শরভ। এই পশুর আটটি পা, তার গায়ে অসীম শক্তি, সমস্ত পশুপাখিকে সে মেরে ফেলতে পারে। সে এসেছে মুনির সিংহকে মেরে ফেলতে। শরভকে দেখেই সিংহ ভয়ে কাঁপতে লাগল। তখন মুনি সিংহকে শরভ করে দিলেন। তখন বন থেকে আসা শরভ আরও বলবান এক শরভকে দেখে ভয় পেয়ে সেখান থেকে বনে পালিয়ে গেল।

এইভাবে সেই শান্ত দুর্বল কুকুর মুনির দয়ায় শরভ হল। শরভ পরম সুখে মুনির কাছে থাকতে লাগল। সব পশু তার ভয়ে বন ছেড়ে পালিয়ে গেল। আগে তো প্রাণ বাঁচানো চাই। শরভ ফলমূল খেত না, খেত পশু শিকারের মাংস। তাই বনের পশুরা পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চাইল।

শরভের রক্তের পিপাসা খুব বেড়ে গেল। তার লোভ বেড়ে গেল। তার বুদ্ধি লোপ পেল। তার চিন্তা অন্য রকম হয়ে গেল। শরভ ঠিক

করল, এবার মুনিকে মেরে তার মাংস খাবে। মুনির উপকারের কথা একেবারেই ভুলে গেল।

এদিকে মুনি শরভের মনের কথা সব বুঝতে পারলেন। যাকে তিনি কুকুর থেকে শরভ করে দিলেন তার মনে এত পাপ? তাকে এত দয়া দেখালেন, আর তার পরিণাম এই? মুনি তখন শরভকে বললেন, তুই ছিলি একটা তুচ্ছ কুকুরের বাচ্চা। আমি তোকে দয়া করে কুকুর থেকে ছোট বাঘ, ছোট বাঘ থেকে বড় বাঘ, বড় বাঘ থেকে হাতি, হাতি থেকে সিংহ ও শেষকালে সিংহ থেকে শরভ করে দিলাম। আমি স্নেহ করে তোকে ধীরে ধীরে সবচেয়ে বলবান পশু করে দিলাম। আর এখন তুই আমাকে মেরে ফেলতে ফন্দি করেছিস? তুই আবার কুকুর হয়ে যা।

মুনির কথা শেষ হতেই সেই বিশাল শরভ আবার কুকুর হয়ে গেল। কুকুর হয়েই তার মন খারাপ হয়ে গেল। হায়! কী ছিলাম, আবার কী হলাম! ছিলাম শরভ, আবার হলাম কুকুর। মুনি তখন সেই কুকুরকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অত সুখের আশ্রয় থেকে কুকুর পথে নামল।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কোন কোন কাজ রাজাদের কর্তব্য? তারা কী করলে সুখলাভ করতে পারেন?

ভীষ্ম তখন 'উট ও শেয়ালের কথা' পশুকথাটি বলেন। অলসতা যে মানবজীবনের সমস্ত অধঃপতনের কারণ একথাই ভীষ্ম বোঝাতে চেয়েছেন। যারা আলস্য পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়দমনে সচেষ্ট হয়, বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেয় তারাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বুদ্ধিবলে সমস্ত কাজ করতে উপদেশ দেন। এই পশুকথাটির মধ্যে সত্যযুগ ও ব্রহ্মার প্রসঙ্গ এসেছে। এই ধারণা উচ্চতর সাহিত্যের। মহাভারতকার লৌকিক পশুকথাটি লিখবার সময় সত্যযুগ ও ব্রহ্মার নাম ঢুকিয়ে দেন। এটা কোনোভাবেই লোকসমাজের মানসজাত নয়। পশুকথাটি রয়েছে মহাভারতের শান্তিপর্বে। ভীষ্ম এই আখ্যানকে 'ইতিহাস' বলেছেন।

সত্যযুগে এক গভীর বনে বাস করত এক উট। সে ছিল জাতিস্মর। সেই বনে সে এক সময় কঠোর তপস্যা করেছিল। তার তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে একদিন ব্রহ্মা উটের সামনে এলেন এবং তাকে বর দিতে চাইলেন। উট বলল, আপনার বরে আমার এই গলা শত শত যোজন লম্বা হোক। তিনি উটকে এই বর দিলেন।

উট বর পেয়ে সেই বনে নিশ্চিন্তে বাস করতে লাগল। সে খুব কুঁড়ে হয়ে পড়ল। বর পাওয়ার পর থেকেই সে খাবারের জন্য অন্য কোথাও যেত না, কুঁড়েমি করে এক জায়গাতেই বসে থাকত। লম্বা গলা বাড়িয়ে গাছের ডালপালা খেত, কোথাও যাওয়ার দরকার পড়ত না।

একদিন সেই উট লম্বা গলা বাড়িয়ে ডালপালা খাচ্ছে, এমন সময় ভীষণ ঝড় উঠল। বোকা উট তখন তার মাথা আর গলা একটা গুহার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এমন সময় আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল, একটু পরেই বৃষ্টি নামল। একভাবে বৃষ্টি পড়ছে, থামার নাম নেই। সমস্ত জায়গা জলে ভেসে গেল। জল থইথই করতে লাগল।

সেই বৃষ্টির মধ্যে এক শেয়াল আর তার বউ শিকার করতে বেরিয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আবার খুব শীতও করছে। এমন সময় সামনে এক গুহা দেখে তারা তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। বৃষ্টি থেকে তো এখনকার মতো বাঁচা যাবে।

গুহাতে ঢুকেই দেখতে পেল উটের গলা। খুব খিদে পেয়েছে। দুজনে উটের গলায় কামড় বসাল। গলার নরম মাংস খেতে লাগল।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে বাঁচতে চেষ্টা করল। গলা একবার ওপরে তোলার চেষ্টা করে, একবার নামাবার চেষ্টা করে, এপাশে-ওপাশে ঘোরাতে চায়। কিন্তু অত বড় গলা, কিছুতেই সামলে উঠতে পারল না। ছটফট করছে, শেয়াল-শেয়াল বউ মাংস খুবলে খেয়ে চলেছে। শেষকালে উট মরে গেল। মাংস খেয়ে খিদে মিটিয়ে শেয়াল-শেয়াল বউ বৃষ্টি থামলে গুহা থেকে চলে গেল।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, কোনো সহায়হীন রাজা যদি কোনো দুর্লভ রাজ্য লাভ করেন, তবে প্রবল শত্রুর সঙ্গে তিনি কীভাবে ব্যবহার করবেন?

ভীষ্ম তখন 'বেতগাছ নদী ও সাগরের কথা' লোককথাটি শোনালেন। তিনি বললেন, আমি এই উপলক্ষে 'পুরাতন ইতিহাস' কীর্তন করছি। যে ব্যক্তি প্রবল শত্রুর তেজকে অসহ্য মনে করে, রাজার শক্তি কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না, তার সর্বনাশ হয়। প্রাজ্ঞ লোকেরা নিজেদের ও শত্রুদের সার, অসার ও বলবীর্য বিবেচনা করে কাজ করেন বলেই তাদের অবসন্ন হতে হয় না। অভিজ্ঞ পণ্ডিতজন শত্রুকে পরাক্রান্ত দেখলেই তার

কাছে বেতগাছের মতো নম্র হন। 'বিনয়-নম্রের নিরাপত্তা' বিষয়ে ভীষ্ম তাই উপদেশ দেন। লোককথাটি রয়েছে মহাভারতের শান্তিপর্বে।

অনেক কাল আগে একদিন সমুদ্র অনেক চিন্তা করে নদীদের বলল, আচ্ছা তোমরা তোমাদের প্রবল স্রোতে কত বড় বড় গাছকে শেকড় সমেত উপড়ে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে যাও। ডালপালা-শেকড় সমেত অত বড় বড় গাছকে ভাসাও, কিন্তু তোমাদের স্রোতে কোনোদিন তো কোনো বেতগাছকে ভেসে যেতে দেখলাম না? কারণ কী ? বেত গাছ খুব ছোট, অসার, সেই জন্য কি ওদের অবহেলা কর? কিংবা বেতগাছ তোমাদের কি খুব উপকার করে, যার জন্য ওদের উপড়ে আনো না? যাই হোক, একবারও কেন তোমাদের স্রোতে ভেসে-যাওয়া বেতগাছ দেখতে পাই না? এর কারণ কী? খুলে বলো তো?

তখন ভাগীরথী বলল, অন্য সব গাছ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের গতি রোধ করে, আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু বেতগাছ কখনও তা করে না। তারা স্রোত দেখামাত্র নত হয়ে পড়ে, স্রোত চলে গেলে আবার নিজের জায়গায় ঠিক হয়ে থাকে। ওরা নম্র, বিনীত, বশ্য, ওরা উদ্ধত নয়। তাই আমরাও ওদের উপড়ে ফেলি না। শুধু বেতগাছ নয়, যেসব গাছ-গুল্ম হাওয়া ও জলের বেগে অবনত হয়, তাদের কাউকেই আমরা স্রোতে ভাসিয়ে আনি না।

যুধিষ্ঠির বললেন যে, সকলের প্রতি বিশেষ করে শত্রুর প্রতি বিশ্বাস করা কোনো মতেই কর্তব্য নয়। যদি কারও প্রতি বিশ্বাস না করা যায় এবং বিশ্বাস করলেই যদি মহাভয় দেখা দেয়, তবে রাজা কীভাবে রাজ্য রক্ষা করবেন কিংবা শত্রুকে পরাজিত করবেন? আপনার মুখে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করবার কথা শুনে আমার মহাসংশয় উপস্থিত হয়েছে, আপনি আমার সংশয় দূর করুন।

ভীষ্ম তখন 'অবিশ্বাসের পাত্র— ব্রহ্মদত্ত-পূজনী বৃত্তান্ত' শোনালেন। এই লোককথাটির মাধ্যমে রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অত্যন্ত গূঢ় বিষয়ে শিক্ষা দিতে লোককথার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতির সুবিধাবাদী স্বভাবের উল্লেখ রয়েছে, মহাভারতে লিখিত রূপের সময়ে এই পরিবর্তন হয়েছে। ভীষ্ম নিজের প্রয়োজনে উপদেশ দিচ্ছেন, তাই লৌকিক ঐতিহ্যকেও তিনি নিজস্ব মত প্রকাশের অনুকূল করে

নিয়েছেন। কিন্তু লোককথার মূল মোটিফ উপলব্ধি করা কষ্টকর নয়। শান্তিপর্বে লোককথাটি রয়েছে।

অনেক কাল আগে কাম্পিল্যনগরে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ব্রহ্মদত্ত। তাঁর অন্তঃপুরে একটা পাখি অনেক কাল থেকে বাস করত। পাখিটার নাম পূজনী। ওই পাখি ব্যাধের মতো সব প্রাণীর স্বর বুঝতে পারত। পূজনী পাখি হয়েও সর্বজ্ঞ ছিল।

কিছুদিন পরে সেই পাখির একটা ছানা হল। যেদিন পাখির বাচ্চা হল, সেদিনই রানিরও একটি ছেলে জন্মাল। পাখি রানির ছেলেকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করত। পাখি প্রতিদিন সমুদ্রের তীরে উড়ে যেত, দুটো সুস্বাদু পুষ্টিকর ফল নিয়ে ঘরে ফিরত। একটা দিত রাজকুমারকে, অন্যটা দিত নিজের ছানাকে। রাজকুমার সেই ফল খেয়ে দিনে দিনে স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠল।

একদিন ধাই-মা রাজকুমারকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় সে পাখির ছানাকে দেখতে পেল। ছানার কাছে গিয়ে সে খেলা করতে লাগল। একবার ওপরে তোলে আবার নীচে নামায়। এমনি খেলতে খেলতে হঠাৎ পাখির ছানা ওপর থেকে পড়ে গেল। ছোট্ট ছানা মরে গেল। রাজকুমার তখন ধাই-মার কাছে ফিরে গেল।

এমন সময় পাখি দুটো ফল নিয়ে ফিরে এল সেখানে। এসে দেখল, রাজকুমার তার ছেলেকে মেরে ফেলেছে। পাখি কাঁদতে লাগল, এমন দুঃখ সে জীবনে পায়নি।

পাখি কাঁদতে কাঁদতে বলল, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করা কারও উচিত নয়। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে কখনও বন্ধুত্ব করতে নেই। ওরা কাজের সময় লোককে ভালোবাসে, কাজ ফুরিয়ে গেলেই তাকে ত্যাগ করে। যারা যুদ্ধবিগ্রহ করে তাদের কখনও বিশ্বাস করতে নেই। ওরা সবসময় অপকার করে আবার অপকার করে সান্ত্বনা দেয়। অপকার করে সান্ত্বনা দেবার কোনো মানে হয়? আমিও ছাড়ব না। আমিও আজ প্রতিশোধ নেব। আমার ছেলে একসঙ্গে জন্মেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে, আর তাকেই কিনা সে মেরে ফেলল? রাজকুমার মহাপাপ করেছে। তাকে পাপের শাস্তি পেতেই হবে। আমি এর প্রতিশোধ নেবই।

এই কথা বলেই পাখি কাঁদতে কাঁদতে রাজকুমারের কাছে গেল। দুই পা দিয়ে তার দুটো চোখ উপড়ে ফেলল। রাজকুমার অন্ধ হয়ে গেল। পাখি

বলল, যে লোক ইচ্ছে করে পাপ করে, পাপ তাকে রেহাই দেয় না। আর অনিষ্ট করার পরে যে প্রতিশোধ নেয়, পাপ তাকে স্পর্শ করে না। লোকে পাপ করে যদি তার শাস্তি ভোগ না করে, তবে তাব ছেলে-নাতিকে তার ফল ভোগ করতে হয়।

রাজা ব্রহ্মদত্ত সব দেখলেন। তার ছেলে অন্ধ হয়ে গেল। তবু তিনি বললেন, পূজনী, আগে আমার ছেলে পাপ করেছে, তারপরে তুমি সেই পাপের শাস্তি দিয়েছ। তোমার কোনো দোষ নেই, দোষ আমার ছেলের। তাই তোমাকে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে হবে না, তুমি এখানেই থাকো।

পাখি তখন বলল, মহারাজ, যে লোক একবার একজনের কাছে অপরাধ করে, তার কাছে থেকে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই আপনার কাছ থেকে চলে যাওয়াই ভালো। আপনি আর আমাকে কখনও আগের মতো বিশ্বাস করতে পারবেন না। বিশ্বাস করাও ঠিক নয়। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করা অন্যায়। এমনকী বিশ্বাসী লোককেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নেই। পিতামাতা ছাড়া আর কেউ পরম বন্ধু হতে পারে না। আমি যে কারণে এখানে থাকতাম, এখন আর সে কারণ নেই। একবার অপরাধ করে ফেলেছি, আর কখনও তেমন বিশ্বাসী হতে পারব না। আপনার সঙ্গে আমার শত্রুতা হয়ে গেল, তাই আমি আর এখানে থাকব না।

রাজা বললেন, যে অপরাধীকে শাস্তি দেয়, পাপের প্রতিশোধ নেয়, সে কখনও অপরাধী নয়। সে ঋণ শোধ করেছে। তাই তুমি অন্য কোথাও না গিয়ে এখানেই থাকো।

পাখি বলল, পাপের প্রতিশোধ নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আর কখনও আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে না। আপনার মনে অবিশ্বাস জাগবেই।

রাজা বললেন, অনেক সময় বিরোধের পরেও তো বন্ধুত্ব হয়! সন্ধি হয়। সন্ধির পরে আর তো অপকার হবার কথা নয়!

পাখি বলল, একবার শত্রুতা জন্মালে কখনও তা আর যায় না। তাকে কখনও বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করলেই আপনার সর্বনাশ হবে। তাই আমাদের দুজনের মধ্যে আর দেখাশোনা না হওয়াই ভালো।

রাজা বললেন, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকলে শত্রুর সঙ্গেও স্নেহ-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পদ্মপাতায় জলের মতো শত্রুতাও বেশি দিন থাকে না।

পাখি বলল, কোনোভাবে বন্ধুর সঙ্গেও যদি শত্রুতা ঘটে যায়, তবে তাকেও বিশ্বাস করতে নেই। কাঠের মধ্যে যেমন আগুন লুকিয়ে থাকে, সাগরের নীচে যেমন আগুন থাকে, শত্রুতাও তেমনি মনের কোনায় লুকিয়ে থাকে। কখন সে বেরিয়ে পড়বে কেউ বলতে পারে না। একবার শত্রুতা দেখা দিলে একজনকে না পুড়িয়ে সে শান্ত হয় না। বিশ্বাস নিয়ে একদিন আপনার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, আজ আর সে বিশ্বাস রাখতে পারছি না।

রাজা বললেন, পূজনী, তুমি আমার বন্ধু। ভালোবেসে তুমি এখানেই থাকো। আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করব না। তুমি যে অপরাধ করেছ, তার জন্য আমি তোমায় ক্ষমা করলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

পাখি বলল, মহারাজ, আমরা একে অপরের যে ক্ষতি করেছি, যে অপকার করেছি, তা একশো বছরেও ভুলে যাবার নয়। তাই বন্ধুত্ব করা আর সম্ভব নয়। ছেলেকে মনে পড়লেই আমার সঙ্গে আপনার নতুন করে শত্রুতা জন্মাবে। তাই কোনোভাবেই আমি আর এখানে থাকতে পারি না।

এই কথা বলে পাখি বনের পথে কোথায় উড়ে গেল।

ভীষ্ম এই লোককথাটি বলবার সময় জটিল দার্শনিক যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। লৌকিক ঐতিহ্যে এ ধরনের দার্শনিক কূট তর্ক থাকতে পারে না। লোককথায় অনেক জ্ঞানের কথা থাকে, কিন্তু অত্যন্ত সরলভাবে সেগুলো বলা হয়। কেননা বিচিত্র অভিজ্ঞতা জন্মালেও লোকসমাজ জটিল নয়। লোকসমাজের লোককথা উচ্চতর সাহিত্যে লিখিত রূপ পাওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। যিনি লোককথাটি ব্যবহার করছেন তার মানসিকতাই এই পরিবর্তন ঘটায়। লোককথা বলবার জন্যই তিনি লোককথা বলছেন না, এর পেছনে একটি উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করতেই জটিলতার সৃষ্টি হয়। এর নিদর্শন সবচেয়ে বেশি রয়েছে মহাভারতে। বিশেষ করে ভীষ্মের উপদেশ দেবার সময়। প্রাজ্ঞ মানুষ দার্শনিক ভাবনায় লোককথাকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দার্শনিক ব্যাখ্যা করতে গিয়েও তিনি সঙ্গত কারণেই লোককথাকে বেছে নিয়েছেন।

দার্শনিক ব্যাখ্যা ছাড়া এই একই ধরনের পশুকথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়ালি লোককথায়। সেখানে রাজা হলেন বাজ পাখি আর সাধাবণ পাখি হল টিয়া।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, মিত্রদ্রোহী ও অকৃতজ্ঞ কাকে বলে?

ভীষ্ম তখন বললেন, এই উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশ নিবাসী ম্লেচ্ছদের দেশে যা ঘটেছিল সেই পুরাতন বৃত্তান্ত কীর্তন করছি।

ভীষ্ম একটি রূপকথা শোনালেন। 'সংসর্গের দোষ— গৌতমের অধোগতি।' এই রূপকথার মধ্যে বেদজ্ঞান, ঋষি, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। ম্লেচ্ছ শব্দটি ব্যবহার করে অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। লৌকিক ঐতিহ্যে এই ধরনের মানসিকতা থাকে না। উচ্চতর সাহিত্যে লিখিত রূপ দেওয়ার সময় এই পরিবর্তন ঘটেছে। রূপকথাটি আছে শান্তিপর্বে।

একদিন মধ্যদেশের অধিবাসী গৌতম ভিক্ষা করতে করতে এক গ্রামে এসে পৌঁছলেন। বেশ বড় গ্রাম, গ্রামের লোকজনের অবস্থাও ভালো। কিন্তু সেই গ্রামে কোনো ব্রাহ্মণের বাস ছিল না।

ওই গ্রামে থাকত এক দস্যু। সে খুব বড়লোক, দানধ্যানও করত। গৌতম সেই দস্যুর বাড়িতে গেলেন। গিয়ে বললেন, আমাকে এক বছরের জন্য থাকতে দিতে হবে, সেই এক বছরে খাওয়াতেও হবে।

দস্যু তক্ষুনি তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। তাকে নতুন কাপড় দিল আর তার সেবার জন্য একজন যুবতী দাসী দিল। গৌতম মহা আনন্দে সেই দস্যুর বাড়িতে থাকতে লাগলেন।

কিছুদিন সেখানে থাকার পরে গৌতমের তির-ধনুক ছোড়া শিখতে খুব ইচ্ছে হল। দস্যুর কাছে শিখলেন। তারপরে প্রত্যেক দিন গভীর বনে চলে যেতেন। আর বুনো মানুষদের মতো হাঁস মারতেন। দস্যুর সঙ্গে থাকতে থাকতে তার মনেও হিংসা জাগল। দস্যুর মতো আচরণ করতে লাগলেন গৌতম। পাখি মেরে তার মাংস খেয়ে তিনি সেই গ্রামে দিন কাটাতে লাগলেন।

এমনি করে অনেক দিন কেটে গেল। এক দিন সেই গ্রামে এলেন এক জটাজিনধারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। অনেক কাল আগে ইনি গৌতমের প্রাণের বন্ধু ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে ব্রাহ্মণের বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে তিনি এলেন গৌতমের বাড়িতে। ওই সময় গৌতম ফিরছেন বন থেকে। পিঠে মরা হাঁস, তির-ধনুক। দেহে কাঁচা রক্ত লেগে রয়েছে। তাকে দেখেই ব্রাহ্মণ চিনতে পারলেন।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি মধ্যদেশে ভালো বংশে জন্মেছ। এ কী দশা? তুমি দস্যুর মতো জীবন কাটাচ্ছ? তুমি তোমার বংশের কলঙ্ক। যাই হোক এক্ষুনি এই জায়গা ছেড়ে চল। আবার সুন্দর জীবন শুরু কর।

ব্রহ্মচারী গৌতম কাতরভাবে বললেন, আমি বড় গরিব ছিলাম, আমার বেদজ্ঞান ছিল না। তাই আমি সুখের জন্য, ধনের জন্য এখানে এসেছিলাম। আজ তোমাকে দেখে আমি সব বুঝতে পারছি। তুমি আজ রাতের মতো এখানে থাক। কাল খুব সকালেই দুজনে এখান থেকে চলে যাব।

গৌতমের করুণ কথায় ব্রাহ্মণ সেই রাতে সেখানে থাকতে রাজি হলেন। কিন্তু খুব খিদে পেলেও গৌতমের বাড়িতে কিছুই খেলেন না।

পরদিন সকালেই ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। তার যাওয়ার একটু পরেই গৌতম গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেলেন। চললেন সমুদ্রের দিকে। পথে দেখা হল একদল বণিকের সঙ্গে। তিনি তখন বণিকদের সঙ্গে চলতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে সেই বণিকের দল এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকল। হঠাৎ গুহা থেকে বেরিয়ে এল এক পাগলা হাতি। সে বণিকদের মেরে ফেলতে লাগল। এই কাণ্ড দেখে গৌতম ভীষণ ভয় পেয়ে দৌড় দিলেন। চললেন উত্তর দিকে। একা একা অসহায়ের মতো বনে বনে ঘুরতে লাগলেন।

শেষকালে সমুদ্রে যাওয়ার পথ খুঁজে পেলেন। সেই পথে যেতে যেতে তিনি নন্দনকাননের মতো একটি সুন্দর কানন দেখতে পেলেন। সেখানে গাছে গাছে ফলফুল, সেখানে আমগাছে সারাবছর আম ফলে থাকে। শাল তাল তমাল চন্দন ও কালো অগুরু গাছে কানন ভর্তি। অপরূপ শোভা। যক্ষ ও কিন্নররা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের মুখের মতো দেখতে পাখিরা মধুর সুরে গান গাইছে। এরা সমুদ্র ও পাহাড়ের পাখি। পাখির গান শুনতে শুনতে গৌতম কিছুদূর এগিয়ে একটা বটগাছ দেখতে পেলেন। তার তলায় সোনার বালি। গাছের ডালপালা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তলায় শীতল ছায়া। ফুলেফলে ডালপালা ভর্তি। গৌতম সেই সুন্দর বটের ছায়ায় বসে পড়লেন। হাওয়া বইছে, হাওয়ায় চন্দনের গন্ধ। গৌতম গাছের নীচে শুয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরে দিন শেষ হল, সূর্য অস্ত গেল। এমন সময় ব্রহ্মলোক থেকে নেমে এল এক বক। দেবকন্যার গর্ভে তার জন্ম হয়েছে।

পাখিকে দেখে গৌতম অবাক হলেন। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। তিনি ঠিক করলেন, এই পাখিকে মেরে তার মাংস খেয়ে খিদে মেটাবেন।

এমন সময় সেই পাখি বলে উঠল, আজ আমার পরম সৌভাগ্য, আপনি আমার অতিথি হয়েছেন। এইটিই আমার বাসা। আজ রাতে আপনি এখানেই থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, বিশ্রাম নিন। সন্ধ্যা হয়ে এল, আর কোথাও যাবেন না। কাল সকালে ইচ্ছেমতন কোথাও যাবেন।

গৌতম বকের মধুর কথায় বিস্মিত হয়ে অবাক চোখে তাকে দেখতে লাগলেন। পাখি বলল, আমার বাবা কাশ্যপ, মা দাক্ষায়ণী। আপনি আমার অতিথি হোন।

আগুন জ্বালিয়ে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে বক সব ব্যবস্থা করে দিল। গৌতম খাওয়া-দাওয়া সেরে বসলেন। পাখি তার দুটো ডানা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। গৌতমের ক্লান্তি দূর হল। এখন পাখি তার পরিচয় জানতে চাইল।

গৌতম বললেন, আমার নাম গৌতম, আমি ব্রাহ্মণ।

পাখি তখন সুন্দর বিছানা করে দিল। গৌতম শুয়ে পড়লেন।

বক বলল, আপনি এখানে কী জন্য এসেছেন?

গৌতম বললেন, আমি নিতান্ত দীনহীন। সামান্য অর্থের জন্য সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে যেতে যেতে এখানে এসে পড়েছি।

পাখি বলল, আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনি শিগগিরই অর্থ নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরতে পারবেন। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। আপনি যাতে ধনবান হন, আমি সেই চেষ্টাই করব।

গৌতম পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল হল। বক গৌতমকে দূরের একটা পথ দেখিয়ে বলল, আপনি এই পথে যান। এই পথে গেলেই আপনি যা চান তাই পাবেন। এখান থেকে তিন যোজন দূরে এক রাক্ষসরাজ বাস করে। সে মহা শক্তিশালী। তার নাম বিরূপাক্ষ। সে আমার পরম বন্ধু। আপনি তার কাছে গেলেই আপনার আশা পূর্ণ হবে।

গৌতম চললেন সেই পথে। পৌঁছলেন রাক্ষসের রাজ্যে। সেখানকার সব বাড়ি-ঘর-দোর-প্রাচীর পাথরের তৈরি। গৌতম সেখানে পৌঁছলেই এক রাক্ষস রাজার কাছে গিয়ে সেই খবর জানাল। রাক্ষসরাজ বুঝতে পারল তার পরমবন্ধু এই গৌতমকে পাঠিয়েছে। তাকে তার কাছে নিয়ে আসতে

আদেশ দিল। গৌতম অবাক হয়ে নগরের শোভা দেখতে দেখতে রাক্ষসরাজের কাছে চললেন।

রাজভবনে ঢোকামাত্রই রাজা গৌতমকে খাতির করে বসালেন। গৌতমের পরিচয় নিয়ে তাকে সমাদর করলেন। রাজা সেদিনই এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন বলে আগে থেকেই ঠিক হয়ে ছিল। তাদের যেসব ধন দেবার কথা ছিল, রাজা ঠিক করলেন গৌতমকেও তাই দেবেন।

এমন সময় সেই হাজার ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হল। ভৃত্যেরা তাদের কুশাসনে বসিয়ে দিতে লাগল। রাজা তিল-কুশ-জল দিয়ে তাদের পুজো করল। তারপরে চলল দানধ্যানের পালা। মণি-মুক্তো-হিরে-প্রবাল-সোনা-রূপা দান করা হল। তারপরে রাক্ষসরাজ বলল, শুধুমাত্র আজকের দিনের জন্য আপনাদের কোনো ভয় নেই, আজকে রাক্ষসরা আপনাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় চলে যান।

ব্রাহ্মণরা ধনসম্পত্তি নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। চারদিকে হাঁটা দিল। গৌতমও সেইসব অমূল্য ধন নিয়ে রওনা দিল বটগাছের দিকে। অনেক পথ, ক্লান্ত হয়ে শেষকালে পৌঁছল বটগাছের তলায়। তখন গৌতমের খুব খিদে পেয়েছে।

একটু পরেই বক ফিরে এল। গৌতমকে দেখে বুঝল তিনি খুব ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি ডানা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল। তারপর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। খাওয়ার পর বিশ্রাম নিতে গৌতম মনে মনে ভাবলেন আমাকে অনেক দূরের পথ যেতে হবে। সঙ্গে অনেক ধনরত্ন রয়েছে, কিন্তু খাবার মতো তো কিছুই নেই। এত দূরের পথ চলতে চলতে খাব কী? এক কাজ করি। এই বককে মেরে ফেলি। অনেকটা মাংস হবে। তাই খেয়ে দূরের পথ চলব। তাহলে আর কষ্ট পেতে হবে না।

এই কথা চিন্তা করে গৌতম উঠে বসলেন। গৌতম যেখানে শুয়ে ছিলেন তার একটু দূরেই বক আগুন জ্বালিয়ে পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে ছিল। গৌতম দেখলেন, বক ঘুমিয়ে আছে। আস্তে আস্তে আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে বকের গায়ে আঘাত করলেন। বক মরে গেল। গৌতম যে কত খারাপ কাজ করলেন সে সময় তা তিনি বুঝতেই পারলেন না। এসব কথা তার মনেই এল না। তার খুব আনন্দ হল। পাখির পালক ছাড়িয়ে

আগুনে ভালো করে ঝলসে নিলেন। তারপরে ধনরত্ন সমেত পাখির দেহ নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

পরের দিন। রাক্ষসরাজ প্রাণের বন্ধুকে দেখতে না পেয়ে ছেলেকে বলল, আজকে বককে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে প্রতিদিন সকালে ব্রহ্মাকে প্রণাম করতে তার কাছে যায়। ফেবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। দেখা না করে কোনোদিন সে যায় না। কিন্তু আজ দু-রাত কেটে গেল, সে তো এল না? আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। এক্ষুনি তুমি তার খোঁজ নিয়ে এসো। আমার মনে হচ্ছে সেই গৌতম নিশ্চয়ই তাকে মেরে ফেলেছে। গৌতমের ভাবভঙ্গি দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সে বড় নির্দয় নিষ্ঠুর, তার আচার-আচরণ দস্যুর মতো। সে আবার বটগাছের দিকেই গিয়েছে। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। তুমি দেখে এসো আমার বন্ধু বেঁচে আছে কি না।

কয়েকজন রাক্ষস নিয়ে রাজপুত্র তক্ষুনি গেল বকের বাসায়। গিয়ে দেখে, গাছের নীচে বকের পালক পড়ে রয়েছে। বকের এমন দশা দেখে রাজপুত্র কেঁদে ফেলল। তারপর প্রচণ্ড রেগে গিয়ে রাক্ষসদের নিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল। যে পথে গৌতম গিয়েছিলেন সে পথে ছুটতে লাগল। অনেক দূর গিয়ে গৌতমকে ধরে ফেলল। তার অনুমানই ঠিক, গৌতমের সঙ্গে রয়েছে বকের মাংস। ধরে নিয়ে গেল রাক্ষসরাজের কাছে।

পরম বন্ধুর মৃতদেহ দেখে রাজা খুব দুঃখ পেল। রাজার সঙ্গে মন্ত্রী, পুরোহিত সবাই কাঁদতে লাগল। খবর পৌঁছলে বাড়ির মধ্যেও সবাই কাঁদতে লাগল। এমন শোক তারা আগে পায়নি।

তারপরে রাজা ভীষণ রেগে গেল। রাজপুত্রকে ডেকে বলল, বৎস, অন্যান্য কয়েকজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এক্ষুনি এই নিষ্ঠুর গৌতমকে হত্যা করো। এর মাংস খেয়ে রাক্ষসরা তৃপ্তি পাক। এ ভয়ানক পাপী, এর মৃত্যু হওয়াই ভালো।

তখন কয়েকজন রাক্ষস রাজার পায়ে প্রণাম করে বলল, মহারাজ, এই পাপী ব্রাহ্মণের মাংস খেতে আমাদের একটুও ইচ্ছে করছে না। আপনি একে দস্যুদের হাতে দিয়ে দিন। এমন পাপীকে আমাদের খাওয়ার জন্য দেওয়া আপনার উচিত নয়।

তাদের অনুরোধ শুনে রাজা নরম হল। তাদের কথায় রাজি হয়ে রাজা বলল, আজই এই পাপীর দেহকে দস্যুদের হাতে দিয়ে দাও।

তখন রাক্ষসরা খড়্গ দিয়ে গৌতমের দেহ টুকরোটুকরো করে কেটে ফেলল। তারপর খণ্ড খণ্ড দেহ দস্যুদের দিয়ে দিল। কিন্তু দস্যুরাও সেই পাপীর মাংস খেতে চাইল না। অনেক পাপের নিস্তার আছে, কিন্তু যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না, যে অকৃতজ্ঞ তার পাপের নিস্তার নেই। তার মাংস রাক্ষস, দস্যু এমনকী পোকারাও খায় না।

তারপর রাক্ষসরাজ সুগন্ধময় চিতা সাজিয়ে তাতে আগুন দিয়ে বকের মৃতদেহ দাহ করতে লাগল। এমন সময় চিতার ওপরে নেমে এল বকের মা দাক্ষায়ণী। মায়ের মুখ থেকে অনবরত ক্ষীরমেশানো ফেনা বেরিয়ে চিতায় পড়তে লাগল। সেই ফেনা গিয়ে লাগল বকের দেহে। বক বেঁচে উঠল তার স্পর্শে। বক চিতা থেকে বেরিয়ে এসে রাক্ষসরাজের কাছে গেল।

এমন সময় ইন্দ্র সেই রাক্ষসরাজের কাছে এলেন। তাকে দেখে বক বলল, যদি আমার প্রতি আপনার দয়া থাকে, তবে আপনি আমার পরম বন্ধু গৌতমকে বাঁচিয়ে দিন। ইন্দ্র বকের কথায় গৌতমকে বাঁচিয়ে দিলেন।

তখন বক গৌতমের ধনসম্পত্তি নিয়ে তাকে তার ইচ্ছেমতো যেতে বলল। গৌতম ফিরে চললেন সেই দস্যুর গ্রামে। ব্যাধের জীবনে তিনি ফিরে গেলেন। সেখানে গৌতম বিয়ে করেছিলেন এক কিরাতীকে। সেই বউয়ের কাছেই গেলেন তিনি। পরে তার অনেক ছেলেমেয়ে হল।

এই রূপকথাটি বলার পর ভীষ্ম এটি বিশ্লেষণও করেছেন। অর্থাৎ রূপকথাটির অভিপ্রায় কী? যে অকৃতজ্ঞ তার কোথাও যশ আশ্রয় বা সুখ নেই। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়, কোনোভাবেই তার নিষ্কৃতি নেই। বন্ধুর অনিষ্ট করা কারও উচিত নয়, মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি যন্ত্রণা ভোগ করে। সুপণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেই পাপী অকৃতজ্ঞকে পরিত্যাগ করে।

এই সময়েই ভীষ্ম বলেছিলেন, যুধিষ্ঠির, পূর্বে মহর্ষি নারদ আমার কাছে এই উপাখ্যান কীর্তন করেছিলেন। আগে থেকেই এই উপাখ্যান প্রচারিত ছিল। ভীষ্ম পুরানো ঐতিহ্যকেই আবার বিবৃত করেছেন।

অনেক কাল আগে কোনো এক বনে শেয়াল বাঘ ইঁদুর নেকড়ে একসঙ্গে বাস করত। এই চার বন্ধুর সঙ্গে ছিল একটা বেজি। শেয়াল ছিল বেজায় চালাক, স্বার্থপর আর বুদ্ধিমান।

একদিন সেই বনের মধ্যে তারা একটা বিশাল হরিণকে দেখতে পেল। সে ছিল হরিণদের সর্দার। তারা হরিণকে মারার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল

না। তার গায়ে ছিল খুব জোর, ছুটতে পারত খুব জোরে। তাকে ঘায়েল করতে না পেরে শেয়াল বলল, এভাবে হবে না, এই হরিণ খুব বুদ্ধিমান, যুবক বয়স, ছুটতেও পারে খুব, এভাবে ধরা যাবে না। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, ওকে সহজে শিকার করতে পারব না। তাই বুদ্ধি করে ওকে মারতে হবে। হরিণ যখন গা এলিয়ে শুয়ে থাকবে, সেই সময় ইঁদুর গিয়ে ওর পায়ে কামড় বসাক। তখন বাঘ লাফিয়ে গিয়ে ওকে সহজেই কাবু করতে পারবে। তারপর আমরা সবাই ওর মাংস আনন্দ করে খাব।

অন্য চারবন্ধু শেয়ালের কথায় রাজি হল। শেয়াল ঠিক পরামর্শ দিয়েছে। শেয়ালের কী বুদ্ধি।

তখন ইঁদুর গুটি গুটি এগিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ঘাস-পাতা খেয়ে হরিণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এক গাছের ছায়ায় ঘন ঘাসের মধ্যে হরিণ গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘাসের ফাঁকে এগিয়ে হরিণের পায়ে কামড় বসাল ইঁদুর। যন্ত্রণায় যেই কাত্‌রে উঠেছে হরিণ, সেই সুযোগে প্রচণ্ড লাফ মারল বাঘ। ঠিক হরিণের পিঠের ওপরে। হরিণ একটু ছটফট করেই মরে গেল।

হরিণের দেহ পাথরের মতো পড়ে রয়েছে। অন্য সকলে সেখানে এল। হঠাৎ শেয়াল বলল, বন্ধু, তোমরা সবাই চান করে এসো, আমি একে পাহারা দিচ্ছি।

অন্য চারজন চান করতে নদীর দিকে গেল। শেয়াল চিন্তা-চিন্তা ভাব করে সেখানে চুপ করে বসে রইল। সবার আগে চান সেরে বাঘ ফিরে এল। এসে দেখে শেয়াল কেমন আনমনা হয়ে বসে রয়েছে।

শেয়ালকে এমনভাবে বসে থাকতে দেখে বাঘ বলল, ভাই শেয়াল, আমাদের মধ্যে তুমিই শুধু বুদ্ধিমান, তুমি শোক করছ কেন? শিকার পড়ে রয়েছে, এসো আমরা সবাই আনন্দ করে মাংস খাই।

শেয়াল বলল, বন্ধু, ইঁদুর যা বলেছে আমি তোমাকে তাই বলছি। তুমি চান করতে গেলে ইঁদুর অহংকার করে বলল, আজ আমিই এই হরিণকে মেরেছি। বাঘের আর কী বলবিক্রম আছে? আজ আমারই বলে হরিণ মরেছে, তার মাংস তোমাদের সবাইকে খাওয়াব, আনন্দ দেব। ইঁদুর অহংকার করে এমন হম্বিতম্বি করছিল যে হরিণের মাংস খেতে আর আমার একটুও ইচ্ছে নেই।

বাঘ রেগে গিয়ে গর্জন করে বলল, শেয়াল, তাই যদি বলে থাকে ইঁদুর, তবে তুমি ঠিক সময়ে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছ। আজ নিজের শক্তি দেখাব, বনের পশুদের মেরে শেষ করে দেব। আমি চললাম, কত মাংস তুমি খেতে পার দেখব। এই বলে বাঘ বনের গভীরে মিলিয়ে গেল।

এমন সময় চান সেরে সেখানে এল ইঁদুর। তাকে দেখে শেয়াল বলল, ইঁদুর, তুমি ভালো আছ তো? নেকড়ে কী বলেছে শোনো। তুমি চান করতে গেলে সে আমাকে বলল, এই হরিণের মাংস খেতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না। এই মাংসকে আমার বিষ বলে মনে হচ্ছে। তাই তোমার যদি মত থাকে, তাহলে আমি এক্ষুনি গিয়ে ইঁদুরকে খাই।

এই কথা শুনেই ইঁদুর ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাছের এক গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এমন সময় নেকড়ে চান করে সেখানে এল। শেয়াল তাকে বলল, ভাই, বাঘ তোমার ওপরে খুব রেগে গিয়েছে, তোমার অনিষ্ট ঘটতে পারে। বাঘ তার বউকে নিয়ে এক্ষুনি ফিরে আসবে। এখন যা ভালো বোঝ তাই কর।

এই কথা শুনেই নেকড়ে ভয় পেয়ে গভীর বনে পালিয়ে গেল। পালিয়ে যাওয়াই ভালো, কী থেকে কী যে হয় কে বলতে পারে?

এমন সময় চান করে সেখানে এল বেজি। তাকে আসতে দেখেই শেয়াল বলল, বেজি, নিজের শক্তিবলে আমি সবাইকে হারিয়ে দিয়েছি। পরাজিত হয়ে তারা যার যার জায়গায় পালিয়ে গিয়েছে। এখন তুমি শেষকালে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, যদি আমাকে হারিয়ে দিতে পার, তাহলে তুমি ইচ্ছেমতো হরিণের এই মাংস খেতে পারবে।

তখন বেজি আস্তে আস্তে বলল, ভাই শেয়াল, বাঘ নেকড়ে আর বুদ্ধিমান ইঁদুর যখন যুদ্ধে তোমার কাছে হেরে গিয়েছে, তখন বোঝাই যাচ্ছে, তুমি এদের মধ্যে সবচেয়ে বলবান। তাই আমি আর কী তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব! তোমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। আমি চললাম। এই কথা বলেই বেজি পালিয়ে গেল।

চারজন চলে গেলে বুদ্ধিমান শেয়াল মহা আনন্দে একাই সেই হরিণের মাংস খেতে লাগল।

এটি একটি অতি সরল লৌকিক পশুকথা। পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ-ঈশপ কিংবা পিলপের নীতিকথার সঙ্গে এর কোনো তফাত নেই। এইসব

সংকলনের কাহিনির সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, এই পশুকথাটি রয়েছে মহাভারতের আদিপর্বে। মহাভারতের বিশেষত্ব হল, এই মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হবার পরেই সাধারণ উপাখ্যানও তত্ত্বকথায় অসাধারণ হয়ে ওঠে। প্রাজ্ঞ মহাভারতকার অকারণে কোনো কাহিনিকে বিবৃত করেননি। নিজস্ব তত্ত্ব ও দর্শনকে সুস্পষ্ট করবার জন্যই তিনি কাহিনিকে মহাকাব্যের মধ্যে গ্রহণ করেন। বিশেষ করে এইসব কাহিনি যখন বলেন ভীষ্ম, বৈশম্পায়ন, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর। লৌকিক এই পশুকথাটি যখন মন্ত্রিবর কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে আহ্বান করে বলছেন তখন আপাতত মনে হবে একটি সাধারণ কাহিনি তিনি বলছেন। কিন্তু কাহিনিটি বলবার পরে তিনি যখন এর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়টি বিশ্লেষণ করছেন তখন বিস্মিত হতে হয়। একটি সাধারণ কাহিনির মধ্যে কত তত্ত্বকথা লুকিয়ে রয়েছে। লোকসমাজ নিশ্চয়ই এত গভীরভাবে এইসব দার্শনিক তত্ত্ব তাদের গল্পের মধ্যে বলতে চাননি। কিন্তু উচ্চতর সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পশুকথাটির অভিপ্রায়-বিশ্লেষণে নতুন মাত্রা যুক্ত হল। মহাভারতকারের হাতে এর নতুন ব্যাখ্যা শুনে পাঠক আলোকিত হবেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এই তত্ত্বকথা প্রকাশ করতে তিনি নিরক্ষর গ্রামীণ লোকসমাজের একটি সাধারণ পশুকথাকে ব্যবহার করলেন।

এই একই ধরনের লোককথা আমরা পেয়েছি পঞ্চতন্ত্রে, ঈশপে, ভারতের গোন্দ ও মারিয়া আদিবাসী, আফ্রিকার মাসাই ও ইফে আদিবাসী এবং পলিনেশীয় লোককথায়। শুধু পাত্র-পাত্রী অন্যান্য পশু-পাখি।

কণিক ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের একজন ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ও মন্ত্রণাদাতা। পাণ্ডবদের সর্বনাশ করবার জন্য ইনি সবসময় ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিতেন। এই পশুকথাটি বিশ্লেষণ করে কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে আরও উত্তেজিত করেন। ধৃতরাষ্ট্র যেন এই উপাখ্যান থেকে পাণ্ডবদের বিনাশের সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেন, হে কণিক! সন্ধি দান ভেদ ও দণ্ড দ্বারা কীভাবে শত্রুসংহার করা যেতে পারে, তুমি আমাকে তাই আনুপূর্বিক বল।

তখন কণিক বললেন, মহারাজ! পূর্বকালে নীতিশাস্ত্রবিশারদ অরণ্যবাসী জম্বুকের যেরূপ ঘটেছিল, তা আমি আনুপূর্বিক বর্ণনা করছি। কণিক তখন 'নকুল-ব্যাঘ্র-জম্বুক-বৃক-মূষিক কথা' শোনালেন। তারপরে পশুকথাটির অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করলেন।

কণিক বিশ্লেষণ করে বললেন, যে রাজা শেয়ালের মতো এই রকম আচরণ করেন, তিনি চিরকাল সুখভোগ করে থাকেন। ভীত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, বীরের কাছে বিনয়ভাব, লুব্ধকে অর্থদান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বল প্রকাশ করে বশীভূত করতে হয়। শত্রু, সখা, ভাই, পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর মতো বিদ্রোহ করে, তাহলে তক্ষুনি তাদের বিনষ্ট করা উচিত। শত্রুকে শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ বা মায়াপ্রকাশ করে বিনাশ করা বিধেয়। কখনও তাদের উপেক্ষা করতে নেই। কিন্তু যদি জিগীষাসম্পন্ন উভয়পক্ষই তুল্যবল ও তুল্য উপায়বশত সন্দিহান হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি তার মধ্যে গাঢ়তর অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়শ্রীলাভের প্রত্যাশা করেন, তারই অভ্যুদয় ঘটবে। আর যদি গুরুও গর্বিত, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হন, তাহলে সেই গুরুকেও শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নয়। ক্রোধের উদ্রেক হলেও কখনও ক্রুদ্ধ হবে না, সবসময় হাসিমুখে সকলকে সাদর সম্ভাষণ করবে। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কখনও বিশ্বাস করবে না, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করবে না। যেহেতু, বিশ্বাস থেকে ভয় উৎপন্ন হলে মূল পর্যন্ত উচ্ছিন্ন হতে পারে। হৃদয় ক্ষুরধার রেখেও সবসময় সহাস্যমুখে মিষ্টবাক্যে বিনীতভাবে সম্ভাষণ করবে। অসূয়া পরবশ না হয়ে যত্নপূর্বক নিজ মন্ত্রণা গোপন করে রাখবে। সহায় সংগ্রহ ও শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করতে চেষ্টা করবে। সম্পদলাভের ইচ্ছা ও সেই বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ দেখানো দরকার। এই ধরনের লোকের কাজ শত্রু-মিত্র কেউ কিছুমাত্র বুঝতে পারে না, কেবল কাজের উদ্‌যোগ ও কাজের সমাপ্তি প্রত্যক্ষ করে। যতক্ষণ ভয় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ ভয়কে ভয় পাবে। কিন্তু ভয় আগত হলে স্থিরচিত্তে প্রতিকার করতে চেষ্টা করবে। অনাগত কাজকেও অচিরাগত বিবেচনা করে বুদ্ধিবলে তার অনুসরণ করবে, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশবশত নিজের উদ্দেশ্য-সাধনে কখনও উপেক্ষা বা অনাদর প্রদর্শন করবে না। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হলেও কখনও উপেক্ষা করবে না, কারণ তারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করতে পারে।

কণিকের উদ্দেশ্য হল ধৃতরাষ্ট্রকে উত্তেজিত করা। এই উদ্দেশ্যকে তিনি গোপন করেননি। কিন্তু নীতিহীন কাজটির সমর্থনে কী নিপুণভাবে একটি পশুকথাকে কাজে লাগালেন। পশুকথাটির সৃষ্টির সময় লোকসমাজেরও নিশ্চিয়ই একটি বক্তব্য ছিল, শেয়ালের এই কুৎসিত কাজের প্রতি

একধরনের ঘৃণাই জন্মায়। গল্পটি শুনে সাধারণ মানুষ কোনোভাবেই শেয়ালের কাজকে সমর্থন করবে না। কিন্তু একজন প্রাজ্ঞ নীতিহীন মন্ত্রণাদাতা শেয়ালের কাজের সপক্ষে দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থিত করলেন। উচ্চতর সাহিত্যে যুক্ত হয়ে পশুকথাটির অভিপ্রায়ই বদলে গেল। পশুকথাটিকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করে কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, পাণ্ডব বা অন্য কেউ হোন না কেন, তাদের সঙ্গে ন্যায়ানুগত ব্যবহার করলে আপনি কখনই বিপদে পড়বেন না, এবং নির্বিবাদে আপনার কার্যসাধন করতে পারবেন।

পশুকথা ও তার অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করার পরে মহাভারতকার সেই সর্বনাশা জতুগৃহ পর্বের কথা শুনিয়েছেন। কণিক তো চলে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রও তখন থেকে নিতান্ত শোকাকুল হলেন। তারপর সুবলনন্দন শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ দুষ্টমন্ত্রণা করে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ করে কুন্তী ও তার পঞ্চপুত্রকে দগ্ধ করতে মনস্থ করলেন। আশ্চর্য, ধৃতরাষ্ট্রও এই অমানবিক বীভৎস কাজের সমর্থন জানিয়েছিলেন। যেন মনে হয়, পশুকথাটির বিশ্লেষণ ধৃতরাষ্ট্রের এই কাজে সমর্থন জানাতে উৎসাহ দিয়েছিল। উচ্চতর সাহিত্য নিজের প্রয়োজনেই লৌকিক ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছে।

যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন, অসার দুর্বল ব্যক্তি দীর্ঘকাল নিকটে থেকে উপকার ও অপকারে সক্ষম উদ্‌যোগশালী মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুকে কথায় অবমানিত করলে সেই শত্রু যদি রাগে তাকে উচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসে, তবে ওই দুর্বল ব্যক্তি কীভাবে আত্মরক্ষা করবে? ভীষ্ম এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটি 'ইতিহাস' বললেন, 'শিমুল গাছ ও হাওয়ার কথা'। এই লোককথাটির মধ্যেই যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে লোককথাটি রয়েছে।

ভীষ্ম লোককথার মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন, যে ব্যক্তি দুর্বল হয়েও দুষ্টুবুদ্ধির জন্য বলবানের সঙ্গে শত্রুতা করে তাকে শেষকালে অনুতাপ করতে হয়। তাই বলবানের সঙ্গে শত্রুতা করা দুর্বলদের উচিত নয়। তুল্য পরাক্রম ব্যক্তির সঙ্গেও সহসা শত্রুতা করতে নেই। ওইরূপ ব্যক্তির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে বলপ্রয়োগ করাই বিধেয়। এই পৃথিবীতে বুদ্ধি ও বলের মতো উৎকৃষ্ট আর কিছুই নেই।

এই লোককথায় নারদ চরিত্র রয়েছে। নারদ আসলে কথক ও চারণকবি। নারদ লোকসমাজে অসাধারণ জনপ্রিয় একটি লৌকিক চরিত্র। উচ্চতর সাহিত্যে প্রবেশ করে তিনি দেবর্ষির মর্যাদা পেয়েছেন। দেবর্ষি হলেও তার কার্যকলাপ লোকচরিত্রের মতোই, অন্যান্য ঋষি-চরিত্রের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। লোকসমাজের সৃষ্ট চরিত্র বলেই তার ধরন-ধারণ লৌকিক।

হিমালয় পাহাড়ে ছিল এক বিশাল শিমুল গাছ। গাছ ছিল চারশো হাত বিস্তৃত। অসংখ্য ডাল-ফুল-পাতায় ছড়ানো। গাছের অনেক বয়েস। গাছের ডালে বসে থাকত নানা ধরনের পাখি। বনের হাতি, হরিণ ও অন্যান্য অনেক জন্তু গরম কালে সূর্যের তেজে ক্লান্ত হয়ে ওই গাছের ছায়ায় দুদণ্ড বসে যেত, বিশ্রাম নিত।

এমনি একদিনের কথা। নারদ চলেছেন পথে। হঠাৎ ওই বিশাল সুন্দর শিমুল গাছ দেখে তিনি বললেন, বাঃ! তুমি তো সুন্দর দেখতে! তোমার ছায়ায় বসে থাকতে সবারই ভালো লাগবে। তোমার ছায়ায় পশুপাখি বিশ্রাম নেয়। তোমার ডালপালা অনেক বড় আর শক্ত। ওগুলো হাওয়ার দাপটে কখনই ভেঙে পড়ে না। হাওয়া যে তোমায় রক্ষা করে তার কারণ কী? হাওয়া তো দেখছি তোমার কোনোই ক্ষতি করেনি? সে কি তোমার আত্মীয়? না কি তোমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব? হাওয়া বড় বড় গাছকে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু তোমার তো কোনো ক্ষতি করেনি। বুঝতেই পারছি, বন্ধুত্বের জন্যই তোমাকে সে রক্ষা করছে। হাওয়ার দয়াতেই তোমার এমন সুন্দর ডালপাতা। নইলে, এই পৃথিবীতে হাওয়ার দাপটে ভেঙে পড়ে না এমন পাহাড়-বাড়িঘর-গাছগাছালি আমি দেখিনি। বন্ধুর মতো হাওয়া তোমায় রক্ষা করছে বলেই তুমি নিশ্চিন্ত রয়েছ।

শিমুল গাছ বলল, হাওয়া আমার বন্ধুও নয়, আমার দেবতাও নয়। সে কেন আমায় দয়া দেখাবে? তার চেয়ে আমার তেজ ও বল অনেক বেশি। আমার আঠারো ভাগের এক ভাগ বলও তার নেই। হাওয়া যদি সব গাছকে ভাঙতে ভাঙতেও আসে, তবু আমার কাছে এসে তাকে থমকে যেতে হবে। হাওয়া প্রবল বেগে অনেকবার আমার দিকে ধাওয়া করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। তাই হাওয়া যদি ভীষণ রেগেও যায়, তবু এখন আমার আর ভয় করে না।

নারদ বললেন, আরে, তুমি তো আচ্ছা বোকার মতো কথা বলছ! হাওয়ার মতো অত শক্তিশালী এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ পর্যন্ত হাওয়ার মতো বলবান নয়, তুমি তো কোন ছার! হাওয়া সকলের প্রাণ রক্ষা করছে। শান্তভাবে হাওয়া বয়ে যায়, তাই নিশ্বাস নিয়ে প্রাণী বেঁচে থাকে। হাওয়া যদি অশান্ত হয়, তবে সকলকেই জীবনের আশা ছাড়তে হবে। দেখছি, তুমিই কেবল হাওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছ। তুমি খুব বোকা, তুমি মহা বাচাল। তুমি খুব অসার। তুমি জেনেশুনে মিথ্যে কথা বলছ। তোমার তো খুব অহংকার। ঠিক আছে, তোমার এই দেমাকের কথা আমি হাওয়াকে গিয়ে বলছি। হাওয়ার নিন্দে আমি একেবারে শুনতে চাই না। চন্দন, তিনিশ, তাল, দেবদারু, বেতস ও বকুল গাছের মতো অমন শক্ত গাছও কখনও হওয়ার বিরুদ্ধে এসব কথা বলে না। তারা হাওয়ার শক্তি জানে বলেই চুপ করে থাকে। তুমিই দেখছি হাওয়ার শক্তি সম্পর্কে কিছুই জান না। ঠিক আছে, আমি হাওয়ার কাছে যাচ্ছি।

নারদ চললেন গাছ আর হাওয়ার মধ্যে ঝগড়া বাধাতে। হাওয়ার কাছে এসে নারদ বললেন, হাওয়া, হিমালয় পাহাড়ের ওপরে এক বিশাল শিমুল গাছ রয়েছে। সে তোমাকে মানতে চায় না। তার ওপরে তোমার বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা বলে। আমি সেসব খারাপ কথা বলতে পারব না। আমি শুধু জানি, তুমি সবচেয়ে বলবান, তোমার ভীষণ রাগ।

নারদের এই কথায় হাওয়া খুব রেগে গেল। এত বড় আস্পর্ধা! রেগে লাল হয়ে সে শিমুল গাছের কাছে গিয়ে বলল, তুমি নারদের কাছে আমার নিন্দে করেছ? আমার নাম হাওয়া। আমি কে, আমার শক্তি কেমন তা এক্ষুনি তোমায় দেখিয়ে দেব। তোমার শক্তি আমার জানা আছে। তোমায় দয়া করে আমি রক্ষা করি, কোনো ক্ষতি করি না। কিন্তু তুমি নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে আছ তা কিন্তু কখনও ভেবো না। যাক, তুমি যখন আমার নিন্দা করে অপমান করেছ, তখন আমার শক্তি দেখাচ্ছি।

হাওয়ার এই কথায় হাসতে হাসতে শিমুল গাছ বলল, তোমার সাধ্যমতো তোমার শক্তি দেখাও। তুমি রেগে গেলে আমার কী হবে? তোমাকে আমি একটুও ভয় করি না, কেননা আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান। যাদের বুদ্ধি থাকে তারাই সত্যিকার বলবান। শুধু দেহের বল থাকলেই সে শক্তিমান হয় না।

শিমুল গাছের এই বেপরোয়া ভাব দেখে হাওয়া ভীষণ রেগে বলল, আমি কালকেই দেখাব, আমার শক্তি কেমন। এই কথা বলে হাওয়া সেখান থেকে চলে গেল।

একটু পরেই আঁধার ঘনিয়ে এল। রাত্রি হল। তখন শিমুল গাছ মনে মনে বলল, অমি তো জানি আমি কত দুর্বল। আমি জানি হাওয়ার কী প্রচণ্ড শক্তি। নারদের কাছে আমি যা বলেছি সবই মিথ্যা। হাওয়ার দাপট আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। নারদ যা বলেছেন তা সবই ঠিক। হাওয়ার শক্তি সত্যি অসাধারণ। যাই হোক, আমি অনেক গাছ থেকে সত্যিই দুর্বল, কিন্তু আমার মতো বুদ্ধিমান আর কোনো গাছ নেই। তাই বুদ্ধি দিয়েই হাওয়াকে হারাতে হবে। এখন আমার যেরকম কৌশল করতে ইচ্ছে করছে.সব গাছ যদি তাই করত, তবে হাওয়ার দাপটে বনের গাছ উপড়ে পড়ত না।

মনে মনে এই কথা বলে শিমুল গাছ তার সব ডালপালা কেটে ফেলল। শিমুল গাছে এখন ডাল নেই, ফুল নেই, ফল নেই, পাতা নেই। সব কেটে ফেলে গাছ অপেক্ষা করতে লাগল।

আঁধার কেটে গেল। আলো ফুটল চারিদিকে। সকাল হল। এমন সময় হাওয়ার শন্‌শন্ শব্দ শোনা গেল। দূরে দেখা গেল, বিশাল বিশাল গাছ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। হাওয়া শিমুল গাছের কাছে এল। এসে দেখল শিমুল গাছ ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। নিজের ভয়ে ডালাপালা কেটে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শিমুল গাছের ভয় দেখে হাওয়ার আনন্দ দেখে কে!

তখন হাসতে হাসতে হাওয়া বলল, হায় গাছ! তুমি নিজেই তোমার যা অবস্থা করেছ, আমি তোমাকে এই রকমই করতাম। সেই দুরবস্থাই তোমার কপালে জুটত। যাক, আমার শক্তির কথা ভেবেই তুমি এই রকম হয়ে গিয়েছ। আমার নিন্দে করেছিলে, নিজের দোষেই আমার ভয়ে তোমার এই দশা। তোমার দেহে ডালপালা নেই, সুন্দর পাতা নেই, ফুল নেই।

হাওয়া এই কথা বলাতে শিমুল গাছ খুব লজ্জা পেল। সে অনুতাপ করতে লাগল।

মহাভারতের মধ্যে এই ধরনের অনেক পুরাণকথা-পশুকথা-রূপকথা-কিংবদন্তি স্থান পেয়েছে। কিছু লোককথা রয়েছে যেগুলি আজ আর লৌকিক ঐতিহ্য বলে চিনবার উপায় নেই। শাস্ত্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ মহাকবির লেখনীতে তাদের

রূপ আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। মোটিফ বিশ্লেষণ করে হয়তো তাদের লৌকিক রূপটির অস্পষ্ট আভাস মেলে, কিন্তু লিখিত রূপে তাদের এমনই বিবর্তন ঘটানো হয়েছে যে, লৌকিক ঐতিহ্য-রূপটি প্রায় হারিয়েই গিয়েছে। কিন্তু লোককথার অনেক উদাহরণ যে অবিকৃত আকারেই পাওয়া যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহাভারতীয় কাহিনির স্বরূপ

মহাভারতকে বলা হয়েছে সংহিতা, মহাভারতকে বলা হয়েছে পঞ্চম বেদ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারত নিবন্ধ করেন চব্বিশ হাজার শ্লোকে। অষ্টাদশ পর্বের অতিরিক্ত মহাভারতের পরিশিষ্ট খিলহরিবংশ পুরাণ ধরলে এর শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ। কিন্তু এই অংশ অর্বাচীন, বহু পরে রচিত। মহারাজ জনমেজয় ও শৌনকাদি ঋষিকে মহাভারত শোনাতে গিয়ে বৈশম্পায়ন, উগ্রশ্রবা ও সৌতি যে বিষয়গুলি যোগ করেছিলেন এই অংশেই তা যুক্ত হয়েছে। শুধু এই অংশই নয়, মূল অংশও একজন কবির রচনা নয়। হরিবংশ পুরাণ থেকে একটি সত্য প্রমাণিত হয়— মহাভারত কালে কালে আদি বীজ থেকে মহাদ্রুমে পরিণত হয়েছে। মহাভারতকে লোক-মহাকাব্য বললেই যেন এর সঠিক স্বরূপ ধরা পড়ে। এ যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাথমিক ভারত-সংহিতা, প্রথম সংকলিত মহাকাব্য। কেননা, লোকসমাজে মৌখিকভাবে প্রচলিত অসংখ্য কাহিনির সংকলন রয়েছে এই মহাকাব্যে, বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোককথার সমাবেশ ঘটেছে এখানে। পণ্ডিতেরা বলেন, আদিম কোনো লোককাহিনি কালে কালে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়ে মহাকাব্যের রূপ নেয়। মহাভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়তো ছিল লোককথার প্রাথমিক বীজ, তারপরে লৌকিক জনপদের অসংখ্য মৌখিক ঐতিহ্য এর কলেবর-বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। সংকলকের মুনশিয়ানা হল, এইসব বিচ্ছিন্ন কাহিনিকে মূল কাহিনির সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা রেখে যুক্ত করে দেওয়া। মহাভারতের সংকলকগণ এই কাজটি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে করেছেন।

মহাভারতের আমলে কিছু নগর থাকলেও মূল সাংস্কৃতিক ধারা ছিল গ্রামীণ ও আরণ্যক। যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা পাওয়া যায় তাও মোটামুটি

জাতি-উপজাতির মধ্যেকার বিরোধ, খাদ্য-সংগ্রাহক ও খাদ্য-উৎপাদকের মধ্যে যুদ্ধ— যুদ্ধ ঘটেছে গোধন কিংবা রাজ্য নিয়ে। গ্রামীণ ও আরণ্যক পরিবেশে নানা গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তরিকতার সম্পর্ক না থাকলেও নিবিড় যোগাযোগ ছিল— বিবাহ দাসদাসী গ্রহণ প্রভৃতি সম্পর্ক ছিল। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ছিল, মানসিক ব্যবধান তুলনামূলকভাবে কম ছিল— এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে মহাভারতে। তাই মহাভারত সংকলিত হবার সময় ও পরবর্তীকালে কলেবর বৃদ্ধির সময়কালে খুব স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ লৌকিক উপাদান এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পদ্ধতিতেই অনেক লোককথা মহাকাব্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

গিলগামেশ মহাকাব্য

গিলগামেশ মহাকাব্য পৃথিবীর আদি মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের পরিচয় দেওয়ার সূত্রে প্রাচীন ব্যাবিলন ও আসিরিয়া অর্থাৎ মেসোপটেমীয় ঐতিহ্যের কথা জানতে হবে।

প্রাচীন মিশরের মতো অত সুপ্রাচীন না হলেও ট্রাইগ্রিস ইউফ্রেটিসের তীরে যেসব লোককথা লিখিত আকারে পাওয়া গিয়েছে, তাও কম প্রাচীন নয়। আক্কাদীয়, সুমেরীয়, চাল্‌ডীয়, আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ যেসব কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা খোদিত ট্যাবলেট পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে লোককথার টুকরো টুকরো আভাস পাওয়া গিয়েছে। লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্যের পূর্ণ-বিবরণ পাওয়া যায়নি ঠিকই, কিন্তু কয়েকটি উজ্জ্বল নিদর্শন আমাদের হাতে এসেছে। আসলে কালের প্রভাবে অযত্নে, আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় অনেক ট্যাবলেট ভেঙে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে, অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবুও যে কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তাতে মানবসভ্যতায় লোককথার লিখিত ঐতিহ্যের ইতিহাস মিলেছে— প্রত্নবিজ্ঞানীরা তাতেই অত্যন্ত খুশি। তাঁরা গবেষণার রসদ পেয়েছেন।

প্রাচীন মধ্য ও নিকট প্রাচ্যে এক উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস নদীর তীরভূমি এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে জানা গিয়েছে, ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ে সেখানে ঘন জনবসতি ছিল সুমের ও আক্কাদ সংস্কৃতি বলয়ের মানুষদের। এই জনগোষ্ঠীকে ব্যাপক অর্থে বলা হত সুমেরীয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, এদের সংস্কৃতি আরও পুরনো কালের। প্রাচীন সভ্যতার সময়কাল বিষয়ে মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই সহমত পোষণ করেন যে, উর-এরেখ-কিশ এলাকায় যে সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তা সুমেরীয়দের সৃষ্টি। তাদের সংস্কৃতির বিচিত্র নিদর্শন থেকে জানা যায়, তারা মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্ব এলাকার পার্বত্য অঞ্চল থেকে এই ব-দ্বীপে এসেছিল। তাদের মিথকথা বা লোকপুরাণ থেকে জানা যায়, তারা এসেছিল ভিন্ন কোনো দেশ থেকে, তারপরে এখানে বসতি গড়ে তোলে। কিউনিফর্ম লিপি তাদেরই বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই উন্নত সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক— সেই সমাজে আর ছিল অবাক-করা মন্দির, পুরোহিত সম্প্রদায়, আইন, সাহিত্য ও সমৃদ্ধ লোকপুরাণ।

এই দুই নদীর ব-দ্বীপে সুমেরীয় বসতি স্থাপনের বেশ কিছুকাল পরে সুমের আক্কাদ এলাকায় প্রথম সেমিটিক আক্রমণ সংঘটিত হয়। এরা সুমেরীয়দের পরাজিত করে। বিস্ময়কর হলেও ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, নতুন বসতিতে এসে এরা সুমেরীয়দের সংস্কৃতিকে পুরোপুরি আত্মস্থ করে নেয়। কারণ অবশ্য জানা যায়না। বিজয়ী জাতি সহজে বিজিতের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে না। কিউনিফর্ম বর্ণমালাও অনুকরণ করতে থাকে। কিন্তু সুমেরীয় ভাষা গ্রহণ করেনি। মাতৃভাষা ছেড়ে অন্য ভাষা পুরোপুরি গ্রহণ করা কঠিন। হয়তো সম্ভব, কিন্তু তার জন্য দীর্ঘ সময়কালের সামাজিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন।

এই সেমিটিক আক্রমণকারীদের ভাষা আক্কাদীয় নামে প্রচলিত ছিল। এই এলাকায় আমুরু জনগোষ্ঠীর দ্বারা দ্বিতীয় সেমিটিক আক্রমণ ঘটে। এই সময়ে ব্যাবিলনে প্রথম আমুরু রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। হাম্মুরাবির অধীনে ব্যাবিলনের সমৃদ্ধি ঘটে, সুমের ও আক্কাদের ওপরে ব্যাবিলনের নেতৃত্ব ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। আমুরু রাজবংশের প্রথম রাজার সময়কাল আনুমানিক ২২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। এই সময়ের অর্ধ শতাব্দী পরে আর একটি সেমিটিক জনগোষ্ঠী টাইগ্রিস উপত্যকার ওপরের দিকে বসতি গড়ে তোলে। তারা

ব্যাবিলন অধিকার করে নেয় এবং মেসোপটেমীয় এলাকায় প্রথম আসিরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

এইসব ঘাত-প্রতিঘাত মিলন-মিশ্রণ ও সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে যেসব মেসোপটেমীয় লোকপুরাণ সৃষ্টি হল তা সুমেরীয় ব্যাবিলনীয় আসিরীয় রূপেই আমাদের কাছে পৌঁছল। তাই অধিকংশ সুমেরীয় ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় লোকপুরাণের রূপরীতিতে প্রায় কোনো ভিন্নতা নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র সৃষ্টি বিষয়ক লোকপুরাণের ক্ষেত্রে সুমেরীয় ও আসিরীয় ব্যাবিলনীয় রূপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তার কারণ, নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত যে লোকপুরাণ তার প্রতি বিশ্বাস এমনই সহজাত যে দেশান্তর কিংবা অন্যবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গোষ্ঠী সেই লোকপুরাণকে ঐতিহ্যে ধারণ করে রাখে। অন্য চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটলেও গোষ্ঠীর সৃষ্টি বিষয়ক পুরাণ প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

বিজেতা ও বিজিত এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক নিষ্ঠুরতা, রক্তপাত ও বিরোধিতা ঘটলেও একসময় সবাই মিলেমিশে গিয়েছিল। একের দেবতা-লোককথা-সংস্কৃতি-লিপি ও ভাষা অন্যেও গ্রহণ করেছে। আসিরিয়ার সব দেবতাই পূজিত হত ব্যাবিলনে, আসিরিয়ার সমস্ত ধর্মীয় উৎসবই একই সময়ে একই ভাবে পালিত হত ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতিতে। আসিরীয় সম্রাট আসুরবানিপলের গ্রন্থাগারে যে-সব লিখিত সম্পদ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে এই বিশ্বাসের সপক্ষে অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। সিডনি স্মিথ বলেছেন, It is certain that the Assyrian scribes were engaged in transforming the literature they borrowed from Babylonia from the style of the First Dynasty of Babylon to the form in which we find it in Ashurbanipal's library.

মেসোপটেমীয় ঐতিহ্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল সম্পদ হল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন মহাকাব্য গিলগামেশ। গিলগামেশের যে খোদিত লিপি আমাদের হাতে এসেছে, তা সম্ভবত ৬৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। পণ্ডিতদের ধারণা লৌকিক ঐতিহ্য থেকে এই মহাকাব্য প্রথম লিখিত আকার পেয়েছিল ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তাহলে বলা যায়, পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য হল গিলগামেশ। এই মহাকাব্য তাহলে লোকসমাজে আরও আগে থেকে নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। মহাকাব্যের প্রাণ বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, এটি

আদিতে ছিল সুমেরীয় ও আক্কাদীয় লোকপুরাণ। কিন্তু বিরাট এলাকার লোকঐতিহ্যের অংসখ্য সম্পদ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পুরনো নথিপত্র থেকে জানা যায়, এক সময় এর আয়তন বর্তমানে প্রাপ্ত আয়তনের দুগুণ ছিল। তিনটি ভাষায় লিখিত ৩০,০০০ ফলকে উৎকীর্ণ এই মহাকাব্যের মধ্যে লোকসমাজের লৌকিক ঐতিহ্যের কাহিনিই বেশি পাওয়া যায়। একসময় হয়তো টুকরো টুকরো কাহিনি ছিল, পরে এটিকে একটি মালায় গাঁথা হয়। অর্থাৎ স্বতন্ত্র স্বাধীন অনেক লোককথা একটি মূল কাহিনি-ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়।

গিলগামেশ মহাকাব্যের মধ্যে যে-সব লৌকিক গল্প স্থান পেয়েছে সেগুলো আলোচনা করলেই এর লৌকিক উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে।

মহাকাব্যের এগারো সংখ্যক ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে প্রলয়ের লোকপুরাণ। এটি অংশত লোকপুরাণ ও অংশত 'সাগা'। এতে বর্ণিত হয়েছে এরেখ-এর আধা-পৌরাণিক রাজার অভিযান-কাহিনি। এরেখ-এর এই রাজার আবার উল্লেখ রয়েছে সুমেরীয় প্রথম রাজবংশের পঞ্চম রাজা হিসেবে। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে এই প্রলয়ের কাহিনি ছিল অসাধারণ জনপ্রিয়। হিব্রু অনুবাদে, জেনেসিসে তো সুন্দরভাবে লিখিত রয়েছে এই কাহিনি। পরবর্তীকালের মিশরীয়-গ্রিক-হিব্রু-উগারিতীয় ও মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য লোকসংস্কৃতিতে এর হাজারো ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাওয়া গিয়েছে।

মহাকাব্যে গিলগামেশ ও তার বন্ধু এনকিডুর অভিযানের কাহিনি লোকঐতিহ্যের আদলে গড়ে উঠেছে। দেবতারা গিলগামেশকে সৃষ্টি করলেন, তার দৈহিক শক্তি ও মানসিক সাহস প্রায় অতিলৌকিক পর্যায়ের। তিনি ছিলেন দুই-তৃতীয়াংশ দেবতা ও এক তৃতীয়াংশ মানব। এরেখ-এর অভিজাতরা দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালেন, এই অতিমানব অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে উঠেছে, সে কাউকে গ্রাহ্য করে না। কোথায় সে সাধারণ মানুষের প্রতিপালক হবে, তা না হয়ে সে তাদের ওপর অবিচার-অত্যাচার চালাচ্ছে। দেবতা যেন গিলগামেশের মতোই আর একটি অতিমানব সৃষ্টি করেন যাতে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করে।

দেবী আরুরু মাটির তাল থেকে তৈরি করলেন একটি মানব মূর্তি, এক মানবাকৃতি বন্য প্রাণী। তার নাম হল এনকিডু। সে ঘাস খায়, বন্ধুর মতো থাকে বুনো জন্তুদের সঙ্গে, জল খায় পাহাড়ি ঝরনায়। গিলগামেশের

শিকারিদের সে উচ্ছেদ করতে লাগল। বুনো জন্তুরা তার আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হল। এ সংবাদ পৌঁছল গিলগামেশের কানে। গিলগামেশ একজন শিকারিকে আদেশ দিলেন, মন্দিরের এক দেবদাসীকে সেই পাহাড়ি ঝরনার কাছে নিয়ে যাও, যেখানে বুনো জন্তুদের নিয়ে এনকিডু জল খেতে আসে। দেবদাসী যেন তাকে ছলনায় ভুলিয়ে দেয়।

সুন্দরী দেবদাসী রয়েছে ঝরনার পাশে। অপেক্ষা করছে সে। এমন সময় সেখানে এল এনকিডু, সঙ্গে অসংখ্য বন্য জন্তু। সে তাকিয়ে রয়েছে দেবদাসীর দেহের দিকে, দেবদাসী তার মোহিনী রূপ মেলে ধরল, চোখের চাহনিতে ছলনার দীপ্তি। কী যেন অনুভব করল এনকিডু, তার দেহে তো এর আগে এমন অদ্ভুত শিহরন জাগেনি! নারীদেহের অপরূপ লাবণ্য তাকে দিশেহারা করে দিল। পেছনে পড়ে রইল তার সহচর বন্য প্রাণীরা, দেবদাসীকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠল বন্য মানুষ। এ এক নতুন আবিষ্কার! সাত দিন কেটে গেল মোহগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে। তারপর মোহ থেকে জেগে উঠে সে অনুভব করল, অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে তার। বন্য জন্তুরা তার দিকে চেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল, তার সঙ্গ ত্যাগ করল। নারী বলল, এনকিডু, তুমি আজ জ্ঞানের অধিকারী হলে, তুমি আজ দেবতার সমকক্ষ হলে। দেবদাসী তাকে বলল এরেখ-এর গৌরবের কথা, সেখানকার সুন্দর জীবনের কথা। আর বলল গিলগামেশের শক্তি ও খ্যাতির কথা। নারী বলল, পশুর চামড়ার পোশাক ফেলে দাও তুমি, দেহের লোমশ অংশ পরিষ্কার করো, দেহকে তৈলসিক্ত করো আর আমার সঙ্গে এরেখ-এ চলো।

এরেখ-এ দেখা হল এনকিডুর সঙ্গে গিলগামেশের। দুজন শক্তির পরীক্ষায় নামল। কিন্তু শক্তি পরীক্ষার পরিণতিতে গড়ে উঠল এক অনন্য বন্ধুত্ব। তারা ঘোষণা করল, এই বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য, এ বন্ধুত্ব চিরকালের।

এখানেই গিলগামেশ মহাকাব্যের প্রথম কাহিনি শেষ। এ কাহিনি আমরা পেয়েছি গ্রিসের হারকিউলিস উপাখ্যানে, জেনেসিসে, তুরস্ক ও মিশরের আদিবাসী লোককথায়। আর ভিন্ন রূপে কিন্তু একই বক্তব্যে এই কাহিনি ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের ব্যাপক জনগোষ্ঠীতে।

পরের কাহিনিটিও লোককথা। গিলগামেশ ও এনকিডু চলেছেন অভিযানে, অগ্নি-দৈত্য হুয়াওয়াকে হত্যার উদ্দেশে। এই দৈত্যের আসিরীয় নাম হল হুম্‌বাবা। তাদের অভিযানের লক্ষ্য— পৃথিবী থেকে

সমস্ত অবিচার অনাচারকে উচ্ছেদ করতে হবে। পরবর্তীকালের গ্রিক লোকপুরাণের নায়ক হারকিউলিসের অভিযানের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। গ্রিক বীরের উদ্দেশ্যও তাই ছিল, দ্যাট অল ইভিল ফ্রম দ্য ল্যান্ড উই মে ব্যানিশ। অশেষ বীরত্বে তারা দুজন হুয়াওয়াকে হত্যা করলেন, তার বনে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, দেবী ইরনিনি বা ইশটার-এর শান্তির লীলাভূমি হল এই বনাঞ্চল।

অভিযান থেকে ফিরে আসার পরে গিলগামেশের রূপে মুগ্ধ হলেন দেবী ইশটার। তাকে প্রেমিক হিসাবে পেতে চাইলেন দেবী, দেবী প্ররোচিত করতে লাগলেন। গিলগামেশ প্রত্যাখ্যান করলেন দেবীর মোহিনী আহ্বান, দেবীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, ইশটারের আগের আগের অসংখ্য প্রেমিকের ভাগ্যে যে লাঞ্ছনা ঘটেছে তা তিনি জানেন। প্রত্যাখ্যাতা হয়ে দেবী অন্য রূপ নিলেন। দেবী দেবরাজ আনুকে অনুরোধ করলেন, এই প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিতে হবে। সেই লন্ডভন্ড করে দিয়ে আসুক তার রাজ্য।

স্বর্গ থেকে নেমে এল ষাঁড়। এরেখ রাজ্যকে তছনছ করে দিল। কিন্তু বন্ধু এনকিডু ষাঁড়কে হত্যা করল। তখন দেবতারা মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, এনকিডুকে অবশ্যই মরতে হবে। এনকিডু রাতে স্বপ্ন দেখল, কারা যেন তাকে তুলে নিয়ে চলেছে পাতালের পথে, পাতালের অধীশ্বর নারগাল তাকে প্রেতাত্মা করে দিল। এই অংশে যে পাতাল-বর্ণনা রয়েছে তার সঙ্গে সেমিটিক ধারণার হুবহু মিল পাওয়া যাচ্ছে। তারপরে এনকিডু অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং মারা গেল। গিলগামেশ বন্ধুর বিরহে আর্তনাদ করে উঠলেন। গিলগামেশ বন্ধুর মৃত্যুতে যেসব আচার-আচরণ পালন করলেন তা মনে করিয়ে দেয় আর একটি মৃত্যুকে। গ্রিক পুরাণে রয়েছে, প্যাট্রোক্লাস যখন মারা যান তখন অ্যাকিলিসও ঠিক এইসব আচার পালন করেন।

গিলগামেশ বন্ধুর মৃত্যুতে বললেন, আমিও যখন মারা যাব, আমিও কি বন্ধুর মতো হয়ে যাব না? ভয় আমাকে গ্রাস করেছে, মৃত্যুভয় আমাকে আচ্ছন্ন করছে। অমরত্বের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন গিলগামেশ। শুরু হল মহাকাব্যের পরবর্তী অংশ। গিলগামেশ জানতেন, তার পূর্বপুরুষ উট্‌নাপিশ্‌টিম্‌ই একমাত্র মানুষ যিনি অমরত্ব লাভ করেছিলেন। জীবন ও মৃত্যুর রহস্য জানবার জন্যই গিলগামেশ তার পূর্বপুরুষের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। গিলগামেশ পৌঁছলেন মাশু পহাড়ের সানুদেশে। তার প্রবেশপথে

পাহারা দিচ্ছে একজন কাঁকড়াবিছে-মানুষ ও তার বউ। সে বলল, কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত এই পাহাড়ের ওপারে যেতে পারেনি, কারও সে সাহস হয়নি। কিন্তু গিলগামেশ যেহেতু তার যাত্রার উদ্দেশ্যের কথা খুলে বলেছে, তাই সে যেতে পারে। আমি তোমাকে যেতে আদেশ করছি।

সূর্যের পথ বেয়ে এগিয়ে চলল গিলগামেশ। অন্ধকারে বহু পথ অতিক্রম করে শেষকালে সে পৌঁছল সূর্যদেবতা শামাশ-এর কাছে। সূর্যদেবতা বললেন, বৃথাই পরিক্রমা করছ গিলগামেশ, যে অমর জীবনের সন্ধান তুমি করছ তা কোথাও নেই।

কিন্তু হতাশ হলেন না গিলগামেশ। তিনি এলেন সমুদ্রতীরে, মৃত্যুর জলধারার কাছে। সেখানে রয়েছে আর একজন দ্বারপাল, দেবী সিদুরি। এই মৃত্যুরূপী জলধারা পেরোতে তিনি নিষেধ করলেন, এই ভয়ানক সমুদ্র কেউ পেরোতে পারে না। একমাত্র সূর্যদেবতা শামাশই পারেন। ফিরে যাও, জীবনকে উপভোগ করো। তুমি যে অমর জীবনের সন্ধান করছ, তা কোথাও নেই। এখানে সিদুরি তাকে যে-কথা শোনালেন, তা রয়েছে হিব্রু লোকপুরাণে।

তবু গিলগামেশ এগিয়ে চললেন। এবার দেখা গল উর্‌শানাবি-র সঙ্গে যে তার পূর্বপুরুষ উট্‌নাপিশ্‌টিম্‌-এর নৌকো চালায়। উর্‌শানাবি-র সমস্ত উপদেশ মেনে চলে শেষকালে গিলগামেশ দেখা পেলেন তার পূর্বপুরুষের। বৃদ্ধ প্রপিতামহ শোনালেন প্রলয়ের লোকপুরাণ, তারপরে বললেন, কাঁকড়াবিছে-মানুষ, শামাশ ও সিদুরি তোমাকে যা বলেছেন তাই সত্যি, দেবতারা শুধুমাত্র তাদেরই জন্য অমরত্ব সংরক্ষিত করে রেখেছেন, আর মানুষের জন্য মৃত্যু।

হতাশ হয়ে ফিরে চলেছেন অমৃতের সন্ধানী। তখন উট্‌নাপিশ্‌টিম্‌ তাকে বললেন, সমুদ্রের গভীর তলদেশে রয়েছে একটি অদ্ভুত গাছ, সেই গাছ বৃদ্ধকে যুবা করে তোলে। তোমাকে সন্ধান দিলাম, তোমার রাজ্যে নিয়ে যাও সেই গাছ।

সমুদ্রের গভীর তলদেশে ডুব দিলেন তিনি। গাছ নিয়ে ফিরে চললেন। রাজ্যে ফিরে যাওয়ার পথে ক্লান্ত বীর থামলেন, একটি জলধারায় তিনি স্নান করবেন, পোশাকও পালটাবেন। পাশে রেখে দিয়েছেন সেই গাছ, এক সাপের নাকে পৌঁছল তার গন্ধ। সে গাছটিকে নিয়ে চলে গেল, তার দেহের

চামড়ায় ঘষে নিল। পারে উঠে গিলগামেশ পাগলের মতো খুঁজতে লাগলেন সেই সম্পদকে, কোথাও পেলেন না। দুঃখে-শ্রান্তিতে ফিরে চললেন তিনি। অমরত্বের সম্পদটি চিরকালের জন্য মানুষের হাতছাড়া হয়ে গেল। রাজ্যে ফিরে এলেন গিলগামেশ।

এখানেই মহাকাব্যের শেষ। কিন্তু অধ্যাপক গ্যাড ও ক্র্যামার আর একটি ফলক পেয়েছেন, দ্বাদশ ফলক। সুমেরীয় থেকে এই ফলকটি সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে। গিলগামেশের আর একটি ভিন্ন কাহিনি, একটি জটিল লোকপুরাণ। গিলগামেশ ও হুলুপ্পু-গাছের কাহিনি। কীভাবে পবিত্র ঢাকের জন্ম হল তারই কাহিনি। এই ঢাক আক্কাদীয় ধর্মীয় আচারে ব্যবহৃত হত।

দেবী ইনান্না বা ইশটার ইউফ্রেটিস নদীর তীর থেকে একটি হুলুপ্পু-গাছ নিয়ে এলেন। সেই গাছ লাগালেন তার বাগানে। এই গাছের কাঠ থেকে তিনি তৈরি করবেন তার শোয়ার খাট ও বসবার আসন। কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি তাকে এই কাজে প্রচণ্ড বাধা দিল। গিলগামেশ এলেন দেবীকে সাহায্য করতে। কৃতজ্ঞতায় দেবী তাকে দিলেন পুক্কু ও মিক্কু। এই পুক্কুজাদু ঢাক তৈরি হয়েছে গাছের অধোভাগ থেকে ও মিক্কুজাদু কাঠিটি তৈরি হয়েছে গাছের কাণ্ড থেকে। আক্কাদীয়দের কাছে বড় পবিত্র বস্তু।

দ্বাদশ ফলকের মহাকাব্য শুরু হয়েছে এইভাবে, পুক্কু ও মিক্কু হারিয়ে গিয়েছে, পাতালের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। শোকে আচ্ছন্ন গিলগামেশ, তিনি কাঁদছেন। বন্ধু এনকিড় চললেন পাতালে, খুঁজে নিয়ে আসবেন দুটি হারানো মানিক, পিক্কু ও মিক্কু। পাতালে যাওয়ার আগে গিলগামেশ বন্ধুকে কয়েকটি আচার পালন করতে বলেছিলেন। বন্ধু সে সব কিছুই মানলেন না, পাতালে আটকা পড়লেন। গিলগামেশ সাহায্যের আবেদন জানালেন এনলিল্-এর কাছে, ফল হল না। তারপরে সিন-এর কাছে, ফল হল না। শেষকালে ইয়া-র কাছে, ফল হল। ইয়া নারগালকে মাটিতে একটা গর্ত করতে বললেন, সেই গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এল এনকিডুর আত্মা। গিলগামেশ তার কাছে পাতাল ও পাতালবাসীদের কাহিনি শুনতে চাইল। এনকিডু বললেন, বন্ধু, তুমি যে দেহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে, যাকে সবসময় আলিঙ্গন করতে, সেই এনকিডুর দেহ পাতালের পোকামাকড় খেয়ে ফেলেছে। গিলগামেশ আছড়ে পড়লেন মাটিতে, ছোট ছেলের মতো কাঁদতে লাগলেন।

ফলকের শেষাংশ কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অস্পষ্টভাবে এটুকুই উদ্ধার করা গিয়েছে, মৃত্যুর পরে যাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভালোভাবে সম্পন্ন হয় ও যাদের হয় না, পাতালে তাদের ভাগ্য দুভাবে নির্ধারিত হয়।

এই মহাকাব্যের সেই অংশগুলি তুলে ধরেছি যেখানে লৌকিক উপাদান রয়েছে বেশিমাত্রায়। এই ধরনের অসংখ্য টুকরো কাহিনি প্রাচীন ভারতীয় গ্রিক-মিশরীয়-পলিনেশীয় লোকপুরাণ, আফ্রিকার জাম্‌বিয়ার লুবা, ভোল্‌টার মোস্‌সি, ঘানার ক্রাচি, কেনিয়ার ছাগা আদিবাসী এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অসংখ্য লোককথায় ছড়িয়ে রয়েছে। মোটিফগুলির বিশ্লেষণেও এর লৌকিক পরিচয় পাওয়া যাবে— মৃতের রাজ্যে সশরীরে প্রবেশ, মৃতের রাজ্যে প্রবেশের মুখে আধা-পশু দৈত্যদের পাহারা, নানা বাধা অতিক্রম, নারীর মোহিনী রূপে ভুলে যাওয়া, সাগরতলে মৃত্যুর দুনিয়া, স্বর্গের ষাঁড়, মৃত্যুপুরীর পথপ্রদর্শক মাঝি, সঞ্জীবনী গাছ, সাপ কেন খোলস ছাড়ে, মানুষ কেন মরণশীল, জাদু ঢাক ও জাদুকাঠি, অশরীরী আত্মা প্রভৃতি। আর প্রলয়ের মোটিফটি তো অতি পরিচিত। এর মধ্যে একদিকে যেমন পুরোহিতদের কিছু উচ্চতর অনুশাসন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তৎকালীন মেসোপটেমিয়ার লৌকিক বিশ্বাস, লোকায়ত আচার এবং লোকঐতিহ্যের কাহিনি। এস. এইচ. হুক বলেছেন, 'মিথ ও ফোকলোরের' আশ্চর্য মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই মহাকাব্য। এই হিসেবে রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়াড-ওডিসির সঙ্গে গিলগামেশের মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। হুক মন্তব্য করেছেন, The epic in its present form is composed of various myths and folk-stories which have been brought together and artistically welded into a whole round the central figure of Gilgamesh.

গিলগামেশ মহাকাব্য আক্কাদীয় ভাষায় রচিত। বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা এই আক্কাদীয় ভাষা ও গিলগামেশ বিষয়ে গবেষণা করে মন্তব্য করেন,— The Bible students account of the deluge is of particular interest. Students of comparative literature admit the possibility that the Gilgamesh story, current in Asia Minor in Hittite and Hurrian languages, may have influenced the Greek Odyssey. Similarities are noted especially between

the Calypso and Siduri episodes. Themes from the Gilgamesh epic are said to occur also in the folklore of the Pacific.

এই গবেষণার ফলে গিলগামেশ মহাকাব্যের অনন্যতা ও ব্যাপ্ত প্রভাবের কথা জেনে এই আদি মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায়। এত বিশাল প্রভাব বোধহয় অন্য চারটি মহাকাব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। হোমারের ওডিসি থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় লোকসংস্কৃতি, গোটা এশিয়া মাইনর, ক্যালিপসো ও সিদুরি উপাখ্যান— সত্যই বিস্ময়কর প্রভাব।

আদি মহাকাব্য রচিত হয়েছিল আক্কাদীয় ভাষায়। এই ভাষা সেমিটিক ভাষাসমূহের অন্যতম। সেমিটিক ভাষা বলতে বোঝায় যেসব জনগোষ্ঠী শেম বা সেম জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। যেমন, আরব মেসোপটেমিয়া সিরিয়া প্যালেস্টাইন থেকে যারা ছড়িয়ে পড়েছে তাদের ভাষাকেই বোঝায়। সেমিটিক ভাষার প্রাচীনত্ব বিষয়ে পণ্ডিতজনদের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই।

সেমিটিক আক্কাদীয় ভাষা খ্রিস্টজন্মের তিন হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়া অর্থাৎ বর্তমান ইরাকের ভাষা ছিল। পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্য বহন করছে গিলগামেশের ভাষা। আক্কাদীয় মূল ভাষার অনেকগুলি উপভাষা ও কথ্য ভাষা ছিল।

সেমিটিক ভাষাসমূহের পূর্ব গোষ্ঠীর ভাষা ছিল আক্কাদীয় আর পশ্চিম গোষ্ঠীতে ছিল হিব্রু, ফিনিসিয়ান, আমোরাইট, উগারিতীয়, আরামিক, সিরিয়াক, আরবি প্রভৃতি।

আক্কাদ রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক সারগোন-এর রাজত্বকালে আক্কাদীয় ভাষা সারগোনীয় সাম্রাজ্য অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগর হয়ে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

অনেক গবেষক মনে করেন, এই সারগোনীয় মহান রাজার রাজত্বকালেই গিলগামেশ মহাকাব্য প্রথম লিখিত রূপ পায়।

ইলিয়াড ও ওডিসি

প্রাচীন ভারতবর্ষ ও প্রাচীন গ্রিসেরই দুটি করে মহাকাব্য রয়েছে। আবার গ্রিসের গর্ব, একই মহাকবি দুটি মহাকাব্য রচনা করেন। তবে অনেক গবেষণার পরে জানা গিয়েছে, রামায়ণ মহাভারত যেমন শুধুমাত্র বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচনা নয়, তেমনি হোমারের দুই মহাকাব্যও তাঁর একার রচনা নয়। পরবর্তীকালের বহু নাম-না-জানা কবির রচনাও রয়েছে এর মধ্যে। চারটি মহাকাব্যও একই সময়কালে রচিত হয়নি।

রামকথা-মহাভারতকথা এবং বাল্মীকি-বেদব্যাসের কাল নিয়ে তর্কের অবসান আজও ঘটেনি। একই রহস্য রয়ে গিয়েছে ইলিয়াড-ওডিসি ও হোমারকে ঘিরে। তবে গ্রিস ইউরোপে বলেই অনেক লিখিত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। হোমারীয় প্রত্নতত্ত্ব ও মহাকাব্যের ভাষাও এ বিষয়ে সহায়ক হয়েছে।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এ. ল্যাং 'হোমার অ্যান্ড হিজ এজ' গ্রন্থে বলেছেন, Disputes about the date, authorship and composition of the

Iliad and the Odyssey constitute the notorious 'Homeric question', which was apparenty first posed toward the end of the 6th contury B. C. when a certain Theagenes of Rhegium began to inquire into the poetry, pedigree and the date of Homer.

যাই হোক বহু তর্ক-আলোচনার পরে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন হোমার খ্রিস্টপূর্ব ৮৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের মানুষ। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁকে নবম খ্রিস্টপূর্ব যুগের মহাকবি বলেছেন। তাঁর মতই মেনে চলেন অধিকাংশ ঐতিহাসিক। তবে আমাদের আলোচ্য হল এই দুই মহাকাব্যে লৌকিক সমাজের লোককথা কীভাবে কোন রূপে রয়ে গিয়েছে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদ ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা গ্রিসের লোকসংস্কৃতি সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। গ্রিস একটি পিছিয়ে-পড়া দেশ, অধিকাংশই কৃষক ও কারিগর, দারিদ্র্য অত্যন্ত ব্যাপক, শিক্ষা দূর অঞ্চলে পৌঁছয়নি। অর্থাৎ প্রাচীন গ্রিসের কোনো গরিমাই আর অবশিষ্ট নেই সাম্প্রতিক কালের গ্রিকদের মধ্যে। যেমন মিশর ইরাক ইরান রোম চিন ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক বৈভবের তেমন সন্ধান পাওয়া যায় না। মায়া-আজটেক সভ্যতার পরিণতিও একই।

উনিশ শতকে গ্রিসের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত লোককথার সংগ্রহে গবেষকরা বিস্মিত হলেন। অসংখ্য লৌকিক গল্প তাঁরা পেলেন যেগুলি রয়েছে হোমারের দুটি মহাকাব্যে। লোককথা কখনও রয়েছে অবিকৃতভাবে, কিন্তু ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে, মহাকাব্যের ভাষা অনেক পরিশীলিত। আর কিছু কিছু লোককথা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে। হোমার লোককথাকে নিজের প্রয়োজনে পালটে নিয়েছেন, লোককথার আদলটি কিন্তু ঠিক খুঁজে পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে আশ্চর্য মিল এই দুই পাশ্চাত্য মহাকাব্যের ।

এই সময়কালেই গ্রিসের কৃষকদের কাছ থেকে প্রমিথিউসের লোককথা সংগৃহীত হয়েছিল। অথচ প্রমিথিউসের মিথ তো গ্রিসের ক্লাসিক্যাল মিথের অন্তর্ভুক্ত। এভাবেই গোটা পৃথিবীতে লৌকিক উপাদান চিরায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

এই দুই মহাকাব্যের অনেক কাহিনি কৃষক সমাজের লোককথার অনুরূপ। বোঝাই যায়, মহাকাব্যকার লৌকিক উপাদানকে ব্যবহার করেছেন। তবে যেহেতু তিনি মহান কবি, তাই লোকসমাজের কাহিনিকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে অন্য মাত্রা যোগ করেছেন। কিন্তু লৌকিক ঐতিহ্যের লিখিত রূপের মধ্যেও মাটি-শেকড়ের ঘ্রাণ ও মোটিফ রয়েছে। এমন অনেক লোককথার সন্ধান এই দুই মহাকাব্যে পাওয়া যাচ্ছে যা একসময়ে ছিল নিরক্ষর গ্রিক লোকসমাজের নিজস্ব সম্পদ।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায়, ট্রয় অবরোধ ঘটে দ্বাদশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তার তিন-চারশো বছর পরে হোমার এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন। অর্থাৎ হোমারের মহাকাব্য লিখবার সময়কালে কিংবা চারণকবি হিসেবে প্রচার করবার সময়েও সেই কাহিনি জনমানসে বেশ উজ্জ্বল ছিল। ভারতবর্ষীয় মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিষয়েও একই প্রমাণ মিলেছে। আর কালের ব্যবধানে মহাভারত-ইলিয়াড-ওডিসির মধ্যে লৌকিক সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তির যথেষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

সেই কারণে হোমার-বিশেষজ্ঞ আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি. ডি. পারসি বলেছেন, During this time history of Troy was turned into legend and expanded by the addition of myth and folklore.

প্রাচীনতম মহাকাব্যগুলির মধ্যে লোকসংস্কৃতির উপাদান কীভাবে লিখিত আকারে চিরস্থায়ী রূপ পায় সে বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ নেই।

হোমারের ইলিয়াড হল ট্রয়ের কাহিনি। অর্থাৎ বীর অ্যাকিলিস-এর কাহিনি। আগামেমনন, মেনেলাউস, প্যারিস, হেলেন, হেক্টর, প্যাট্রোক্লাস— অসংখ্য রাজন্য উচ্চবর্গীয় চরিত্র ও তাদের বীরোচিত কার্যকলাপের কথা রয়েছে ইলিয়াডে।

ইলিয়াডে চব্বিশটি মূল পর্ব রয়েছে। এক একটি পর্বের মধ্যে রয়েছে অনেক উপকাহিনি।

জিউস-অ্যাপোলো-চালচাস্ প্রমুখ দেবতাদের মধ্যে বিবাদ, প্যান্ডারাস শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করলেন, হেক্টর ও অ্যানড্রোমাচে, আইয়াস-হেক্টরের যুদ্ধ, ট্রোজানরা প্রাচীরের কাছে পৌঁছল, হেক্টর প্রাচীরে প্রবল আঘাত করল,

জাহাজের যুদ্ধ, প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে নিহত হল, দেবতারা যুদ্ধে গেলেন, হেকটরের মৃত্যু, প্রায়াস ও অ্যাকিলিস, এইসব মূল কাহিনির মধ্যে রয়েছে অনেক উপকাহিনি। আর এইসব উপকাহিনির মধ্যেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি লোকসমাজের লোককথা।

দ্বিতীয় মহাকাব্য ওডিসি। ট্রয়ের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। অনেক রক্তক্ষয় অনেক অবিশ্বাস, তত্ত্বকথা, বিশ্বাসঘাতকতা, বীরত্বের অবমাননা, যুদ্ধরীতি লঙ্ঘন, যুদ্ধ-কৌশল, অমানবিকতা, মিথ্যাচার, সংকীর্ণতা— ট্রয়ের যুদ্ধ শেষ।

ট্রয়ের যুদ্ধশেষে মহান বীর ওডিসিউস ফিরে আসছেন স্বদেশভূমিতে। অনেক অ্যাডভেঞ্চার। আর এইসব অ্যাডভেঞ্চারে রয়েছে অনেক রূপকথার উপাদান। আর এমন রূপকথার আদি উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে গ্রিসের কৃষকসমাজের মধ্যে।

ওডিসিতেও মূল পর্বে রয়েছে চব্বিশটি কাহিনি। আর এসবের মধ্যে মধ্যে রয়েছে অসংখ্য উপকাহিনি। সব কিছুই আবর্তিত হয়েছে অতিমানব ওডিসিউসকে ঘিরে। মূল পর্বের কাহিনি হল— আথেন ও টেলিমাকাস, ইথাকায় বিতর্ক, নেস্‌টর ও টেলিমাকাস, মেনেলাউস ও হেলেন, ক্যালিপ্‌সো, আলচিনাউস প্রাসাদ, সাইক্লোপ্‌স, ওডিসিউস ইথাকায় এলেন, ওডিসিউস তার সন্তানের সঙ্গে মিলিত হলেন, তিনি নগরে গেলেন, রাজপ্রাসাদে ভিখারি, ইউরিক্লেইয়া ওডিসিউসকে চিনতে পারল, ওডিসিউস ও পেনেলোপ প্রভৃতি।

ওডিসিতে কাহিনির বিন্যাস যেভাবে করা হয়েছে তাতে ইলিয়াডের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় লোককথার উপাদান অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার সুযোগ রয়েছে। মহাকাব্যকার লৌকিক সেইসব ঐতিহ্যকে মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করতে কোনো কার্পণ্য করেননি। আর ওডিসিউস যেহেতু ওডিসিতে 'সুপারম্যান' তাই তার বীরোচিত দুঃসাহসিক রোমহর্ষক কর্মকাণ্ডে লৌকিক রূপকথা মিথকথার অতিলৌকিকতা সুন্দরভাবে সাযুজ্য রক্ষা করতে পেরেছে। ট্রয়ের যুদ্ধশেষে দুর্গম পথ অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ঘরে ফেরা— এই দীর্ঘসময়ের কাহিনিতে লৌকিক উপাদানের কত যে দৃষ্টান্ত রয়েছে তা আজ আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রাসাদে ফিরে এসেছে ওডিসিউস, মিলন হয়েছে সকলের সঙ্গে, পেনেলোপের প্রেমেও মুগ্ধ হয়েছে। মহাকাব্যের শেষ অধ্যায় 'দীর্ঘকালব্যাপী

দ্বন্দ্বের অবসান।' তখন তো শান্তি, তখন তো স্বস্তি। কিন্তু শেষ মুহূর্তেও চরম অশান্তি, রক্তপাতের আশঙ্কা, অস্ত্রের ঝংকার, ব্যক্তিগত হিংসার প্রকাশ। আর ওই অবস্থায় ওডিসিউসের আচরণও ইউরোপীয়, বিশেষ করে প্রাচীন গ্রিসের রূপকথার মহাতেজা রাজপুত্রের মতোই।— The indomitable Odysseus raised a terrible war-cry, gathered himself together and pounced on them like a swooping eagle. অবশ্য জিউস ও আথেনের সাবধানবাণীতে ওডিসিউস সংযত হল, তাদের মান্য করে বিনীত হল। শান্তি ফিরে এল।

উনিশ শতকে লোকসংস্কৃতিবিদ ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা যদি গবেষণার তাগিদে গ্রিসের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহ্যলালিত লোককথার সন্ধান না করতেন, তবে গ্রিসের এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে লোকসমাজের লোককথার এমন ব্যাপ্ত পরিচয়ও জানা যেত না।

এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে যে অসংখ্য লোককথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ হল ভিখারিবেশে ওডিসিউসের প্রত্যাবর্তন, পেনেলোপের প্রতীক্ষা, ওডিসিউসের ধনুকে ছিলা পরানো ও তির ছোড়া, অ্যাকিলিসের ঘোড়া যে মানুষের ভাষায় উপদেশ দেয়, বেঁটে বামন আর সারসদের লড়াই, বেলেরোফোনের কাহিনি প্রভৃতি লোকপুরাণ রূপকথা লোকঐতিহ্য থেকে সরাসরি গৃহীত।

পারসিউসের মিথকথা পরিশীলিত আকারে মহাকাব্যে লিখিত রূপ পেলেও এসব কাহিনির মূল ভিত্তি লোকসমাজ। থেসিউসের কাহিনিও লোককথার ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত। আরগোনটস্-এর গল্পগুলোর মধ্যে রূপকথার অসংখ্য উপাদান ও মোটিফ গৃহীত হয়েছে। পড়লেই মনে হবে লৌকিক রূপকথাকে সরাসরি গ্রহণ করা হয়েছে। আঙ্গিক ও বিষয়ভাবনায় এগুলি অকৃত্রিম লোককথা।

গিলগামেশ-রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়াড-ওডিসির কাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত সারা বিশ্বে মহাকাব্য, গদ্যসাহিত্য লিখিত আকারে যেভাবে আমাদের হাতে এসেছে, সেসবের মধ্যে লৌকিক উপাদানের এবং বিশেষ করে লোককথার অনন্য সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়। কোনো মহান সাহিত্যিকই লৌকিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারেন না।

জাতক

পৃথিবীর প্রাচীন যেসব লোককথার সংগ্রহ লিখিত আকারে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, জাতক তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকলন গ্রন্থ। জাতককে বলা হয় গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মগুলির বৃত্তান্ত। ধর্মীয় উপদেশ-দানই জাতকের মূল লক্ষ্য। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করতেন, মানুষ এক জন্মে কোনোভাবেই পরিপূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয় না। বুদ্ধদেবের মতো 'অপারবিভূতি-সম্পন্ন সম্যকসম্বুদ্ধ' মানুষ এই জন্মের আগে অনেকবার জন্মগ্রহণ করেই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বোধ থেকেই জাতকগুলির সৃষ্টি।

পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশ-পিলপের নীতিকথা বা ঈশপের লোককথা যেমন সংকলন গ্রন্থ, জাতকও তাই। মূল কাঠামো হয়তো একজন রচয়িতার সৃষ্টি, কিন্তু পরবর্তীকালে নানা কথক এর কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। তাই এসবের সঠিক কালনির্ণয় প্রায় অসম্ভব। বৌদ্ধদর্শন যতই জটিল ও উচ্চাঙ্গের হোক না কেন, এই ধর্মে এমন কিছু আবেদন রয়েছে যা এককালে সাধারণ মানুষকে আন্তরিকভাবে আন্দোলিত করেছিল। জনশিক্ষা বা

লোকশিক্ষা ছাড়া এই প্রভাব এত ব্যাপক হতে পারেনি। ধর্মদর্শনের মূল বিষয়গুলো সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য লোককথার ব্যবহার করা হত। বুদ্ধদেবের মতো অসাধারণ প্রাজ্ঞ মানুষ এ বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন। নিরক্ষর গ্রামীণ জনগণের মধ্যে নিজের ধর্মমতকে প্রচার করবার সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম হল গল্পকথার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেওয়া। তাই মনে হয়, জাতকের মূল প্রেরণা বুদ্ধদেব স্বয়ং। তিনি গল্পের মাধ্যমে ধর্মমত প্রচার করতেন। সেই হিসেবে বলা যায়, জাতকের প্রথম গল্পগুলি বুদ্ধদেব বলেছিলেন। তার সংখ্যা কত তা বলা সম্ভব নয়। তবে তিনিও যে লোককথাকে ব্যবহার করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গৌতম বুদ্ধের জীবনকাল হল ৫৬৩-৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। জাতকের মূল কাঠামোও এইকালে সংকলিত হয়। তারপর বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর থেকে জাতক স্ফীত হতে থাকে। গৌতম বুদ্ধই সমগ্র জাতকের স্রষ্টা, এই ধর্মীয় বিশ্বাসকে কোনোভাবেই গ্রহণ করা যায় না। জাতকের অর্ধেক কাহিনিতে কোনো বৌদ্ধ প্রভাব নেই, বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মগুলির সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। লোককথাগুলি সংকলন করে জাতকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কষ্ট-কল্পনা করে কোনোভাবে মূল অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। লোককথাটির সঙ্গে জাতকের মানসিকতার সম্পর্ক যেন আরোপিত, 'পুরাকালে বোধিসত্ত্ব কোনো বনমধ্যবর্তী পদ্ম সরোবরের নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষদেবতা হয়ে বাস করেছিলেন।' লোককথায় যা ঘটে গেল তিনি শুধু তা দেখলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ হলে এভাবে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য লোককথা জাতকে স্থান পেত না।

জাতকের সংকলন শুধুমাত্র বৌদ্ধরাই করেননি। একদিন বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে গৌণধর্ম হয়ে গেল। অধিকাংশ বৌদ্ধ শঙ্করাচার্য ও অমানবিক অত্যাচারী হিন্দু পুরোহিতবর্গের নির্মম অত্যাচারে একদিন আবার পুরনো হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন। অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির হিন্দু মন্দিরে পরিণত হল, বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দু দেবদেবীতে রূপান্তরিত হল। বুদ্ধকে অবতার হিসেবে প্রচার করলেন হিন্দুরা। যখন বুঝলেন বৌদ্ধধর্মকে আর 'ভয়' পাওয়ার কিছু নেই, তখন জাতকের মধ্যেও তাদের অনুকূল বিষয়সমূহ অনুপ্রবিষ্ট হল। ভারতীয় লোকসমাজের লোককথাগুলি নির্বিচারে জাতকের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকল। তাই জাতকের মূল কাঠামোর সময়কাল নির্ধারণ করা গেলেও

গোটা জাতকগ্রন্থ কবে বর্তমান সংকলনের রূপ পেল তা আর কোনোদিনই সঠিকভাবে বলা যাবে না। তবে একথা ঠিক, পালিভাষা যখন সমাজের গভীরে ব্যাপক ছিল তখনই জাতক সংকলিত হয়ে বর্তমান রূপ পেয়েছিল।

জাতকের আদি কাঠামো সংকলিত হয়েছিল প্রথম যেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারলাভ করল। মগধ বা কলিঙ্গে এটি প্রথম সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন প্রাচীন মগধ ও কলিঙ্গ ছাড়িয়ে কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, সাংকাশ্যা, অঙ্গ, বৈশালীব পথ বেয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল, জাতকও একইভাবে একই পথ বেয়ে প্রচারিত হতে থাকল। একদিন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে জাতকও সিংহল, তিব্বত, চিন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও জাপানে পাড়ি দিল। ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে জাতক প্রথম প্রচারিত হয় সিংহলে। কেননা, ২৪১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যখন সিংহলে যান তখন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে জাতকও সঙ্গে নিয়েছিলেন। তবে তখনকার জাতকের আকার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা দুরূহ।

ফসবৌলের যে জাতক সংকলনটি সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে তাতে জাতকগুলির সংখ্যা হল ৫৪৭টি। ১৮৯৫-১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ই. বি কাওয়েল পালিভাষা থেকে ইংরেজিতে যে জাতক অনুবাদ করলেন তাতেও এই সংখ্যাই রয়েছে। যদিও এর মধ্যেও অনেক কাহিনির পুনরুক্তি ঘটেছে। জাতকের আকার কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। উদীচ্য সংস্কৃত জাতকমালায় রয়েছে ৩৪টি জাতক। অনেকে বলেন, এগুলিই আদি জাতক। আবার মহাবস্তু গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে ৮০টি জাতক। তিব্বতের জাতকমালায় রয়েছে ৫৬৫টি জাতক কাহিনি। দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধশাস্ত্রে জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি। বুদ্ধদেবের সংকলন হলে সংখ্যার এমন তারতম্য ঘটত না, ধর্মপ্রবক্তার সংকলিত জাতক ধর্মীয় কারণেই অপরিবর্তিত থাকত। আসলে কথক কিংবা সংকলক কালে কালে তার নিজের সংগ্রহকে জাতকের অন্তর্ভুক্ত করে গৌরবান্বিত হতে চেয়েছেন।

জাতকমালার অন্তত সাড়ে চারশোটি জাতক লৌকিক ঐতিহ্য থেকে সংকলন করা হয়েছিল। লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য লৌকিক কাহিনির মধ্যে থেকে নিজেদের প্রয়োজনে এগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। যেহেতু জাতক প্রচারের একটি বিশেষ ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল, তাই সংকলক যখন এগুলিকে গ্রন্থভুক্ত করলেন তখন মূল কাহিনির প্রথমে ও

শেষে কিছু মন্তব্য জুড়ে দিলেন। আর মাঝখানে কবিতার আকারে গাথাও দেওয়া হল। লোককথার মধ্যে দু-এক ছত্র কবিতা যে একেবারেই ব্যবহৃত হয় না তা নয়। কিন্তু এটা সাধারণত লোককথার ধর্ম নয়। পঞ্চতন্ত্রেও এই ধরনের উপদেশাত্মক কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে। জাতক বা পঞ্চতন্ত্রে এই কবিতার ব্যবহার করেছেন প্রাজ্ঞ সংকলক। লোককথা বলবার আগে সংকলক এইভাবে শুরু করেছেন: শাস্তা জেতবনে এক লোভী ভিক্ষুকের উদ্দেশে এই কথা বলেছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষু একদিন শাস্তার কাছে গিয়ে বললেন, ভগবন, এই ভিক্ষু বড় লোভী। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন হে, এ কথা কি সত্যি? সে বলল, হ্যাঁ প্রভু। শাস্তা বললেন, তুমি অতীতকালেও লোভের জন্য প্রাণ হারিয়েছিলে, আর তোমার দোষে যারা বুদ্ধিমান তারাও নিজের নিজের আবাস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এই কথা বলে শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন। এরপর শুরু হয় এইভাবে, পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব... জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর লোককথাটি বিবৃত করা হল। আর শেষাংশে 'সমবধান' অংশে বলা হয় বোধিসত্ত্ব সেই লোককথায় কে ছিলেন। গাথার প্রথম ও শেষ অংশ সংকলকের সৃষ্টি কিন্তু মাঝখানের কাহিনি অংশটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোককথা।

একটি বিতর্কিত জাতক

বৌদ্ধজাতকে দশরথ-জাতক নামে একটি জাতককে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। একদিকে রয়েছেন যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত কিছু জ্ঞানী মানুষ আর অন্যপক্ষে রয়েছেন ধর্মীয় ভাবনায় উদ্দীপিত কিছু পণ্ডিত। দশরথ জাতকটি একটি রূপকথার গল্প, এই কাহিনির সঙ্গে বাল্মীকির রামকথার আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। দশরথ-জাতকের কাহিনিটি বিশ্লেষণ করলে বিতর্কের কারণ বোঝা যাবে।

শাস্তা জেতবনে থাকবার সময় এক পিতৃহারা ভূস্বামীকে লক্ষ্য করে এই কথা বলেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে সেই ব্যক্তি শোকে এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে শুধুই শোক করতেন। একদিন প্রভাতে শাস্তা সর্বলোক পর্যবেক্ষণ করতে বুঝলেন যে তার

স্রোতাপন্ন-ফলপ্রাপ্তির সময় এসে গিয়েছে। তাই দেখে তিনি দিনমানে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার পরে আহার করলেন এবং অন্যান্য ভিক্ষুকে বিদায় দিয়ে কেবল একজন শ্রমণকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভূস্বামীর বাড়িতে গেলেন। ভূস্বামী তাকে প্রণাম করলেন। তখন শাস্তা মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, উপাসক, তুমি কি খুব শোকার্ত হয়েছ? ভূস্বামী বললেন, হ্যাঁ ভদন্ত, পিতার মৃত্যুতে খুবই কাতর হয়েছি। শাস্তা বললেন, দেখ উপাসক, প্রাচীন পণ্ডিতেরা অষ্টলোক ধর্ম জানতেন বলে পিতার মৃত্যু হলে অনুমাত্র শোকও অনুভব করেননি। তখন ভূস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলতে লাগলেন:

পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয়— এই চার রকমের অগতি পরিহার করতেন। তার ষোল হাজার অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন, তার মধ্যে অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বড় ছেলের নাম রামপণ্ডিত, ছোট ছেলের নাম লক্ষ্মণকুমার ও মেয়ের নাম সীতাদেবী।

অগ্রমহিষীর মৃত্যু হল। দশরথ তার বিয়োগে অনেক দিন শোকাভিভূত হয়ে রইলেন, শেষে মন্ত্রীদের পরামর্শে রানির শ্রাদ্ধের পরে আর একজন স্ত্রীকে অগ্রমহিষীর পদে অধিষ্ঠিত করলেন।

নবীনা মহিষীও দশরথের প্রিয়া এবং মনোজ্ঞা হলেন। কিছুদিন পর তিনি গর্ভবতী হলেন ও তার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। এই ছেলের নাম রাখা হল ভরতকুমার। রাজা পুত্রস্নেহের আবেগে একদিন রানিকে বললেন, প্রিয়ে, আমি তোমায় একটি বর দেব, কী বর চাও, বলো। রানি বললেন, মহারাজা, আপনার বর দাসীর শিরোধার্য, কী বর চাই, তা এখন বলব না।

ভরতকুমারের বয়স সাত বছর হল। তখন একদিন রানি দশরথের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনি আমার ছেলেকে একটি বর দেবেন বলেছিলেন। এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন। রাজা বললেন, কী বর চাও বলো। রানি বললেন, আমার ছেলেকে রাজপদ দিন।

রাজা রেগে গিয়ে বললেন, নিপাত যাও বৃষলি, জ্বলন্ত আগুনের টুকরোর মতো আমার আরও দুটি ছেলে রয়েছে। তুমি কি তাদের মেরে ফেলতে চাও যে, নিজের ছেলেকে রাজ্য দেবার কথা বলছ?

রানি রাজার রাগ দেখে ভয় পেয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। কিন্তু তারপর থেকে বারবার রাজার কাছে ওই একই অনুরোধ জানাতে লাগলেন। রাজা তাকে ওই বর দিলেন না বটে, কিন্তু চিন্তা করতে লাগলেন— নারীজাতি অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী, রানি নিজের দুরভিসন্ধি সফল করার জন্য উৎকোচ দিয়ে আমার ছেলেদের প্রাণবধ করাতেও পারে। তখন রাজা বড় দুই ছেলেকে ডেকে এনে সব কথা জানিয়ে বললেন, এখানে থাকলে তোমাদের বিপদ ঘটতে পারে। তোমরা কোনো সামন্ত রাজ্যে কিংবা বনে গিয়ে বাস করো। যখন শ্মশানে আমার দেহ ভস্মীভূত হবে, তখন ফিরে এসে পিতৃ-পিতামহের রাজ্য গ্রহণ করবে।

দুই ছেলেকে এই কথা বলে দশরথ দৈবজ্ঞ ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন তো, আমি আর কতকাল বাঁচব?

তারা বললেন, আরও বারো বছর আপনি বেঁচে থাকবেন।

সেই কথা শুনে রাজা বললেন, তোমরা বারো বছর পরে এসে রাজছত্র গ্রহণ করবে। দুই ছেলে সম্মতি জানিয়ে পিতার পায়ে প্রণাম করে জলভরা চোখে প্রাসাদ থেকে চলে গেলেন। তখন সীতাদেবী বললেন, আমিও সহোদরদের সঙ্গে যাব। তিনিও পিতাকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পেছন পেছন গেলেন।

এই তিনজন যখন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন হাজার হাজার নরনারী তাদের সঙ্গে চলল। এরা তাদের আসতে নিষেধ করলেন। কিছুদিন পরে হিমালয়ে এলে তারা এক জায়গায় আশ্রম তৈরি করে থাকতে লাগলেন। সেই জায়গায় ছিল ফলমূলের অনেক গাছ, সেখানে ছিল জলের উৎস।

লক্ষ্মণপণ্ডিত ও সীতাদেবী রামপণ্ডিতকে বললেন, আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয়, আপনি আশ্রমেই থাকবেন, আমরা আপনার জন্য বনের ফল জোগাড় করে আনব।

রামপণ্ডিত এতে সম্মত হলেন। তখন থেকে তিনি আশ্রমেই থাকতেন। লক্ষ্মণ ও সীতা যে ফলমূল নিয়ে আসতেন, তাই খেতেন।

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা এইভাবে ফল খেয়ে সেখানে থাকতে লাগলেন। এদিকে মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে নয় বছরেই দেহত্যাগ

করলেন। তার শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে ভরতের মাথার ওপরে রাজছত্র ধারণ করতে হবে।

কিন্তু মন্ত্রীরা ভরতকে রাজ্য দিলেন না। তারা বললেন, যারা ছত্রের অধিপতি, তারা বনে বাস করছেন। তারা ভরতকে ছত্র দিলেন না। তখন ভরত ঠিক করলেন, আমি বনে গিয়ে অগ্রজ রামপণ্ডিতকে এনে রাজছত্র দেব।

তারপরে ভরত পাঁচ রকমের রাজচিহ্ন নিয়ে ও চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হয়ে সেই বনে গেলেন, কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি রামের আশ্রমে ঢুকলেন। সেই সময় লক্ষ্মণ ও সীতা আশ্রমে ছিলেন না। রাম আশ্রম-দুয়ারে পরম নিশ্চিন্তে বসে রয়েছেন। ভরত তার কাছে গেলেন এবং দশরথের মৃত্যু সংবাদ জানালেন। তারপর মন্ত্রীদের সঙ্গে রামের পায়ের কাছে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। রামপণ্ডিত কিন্তু শোক করলেন না, কাঁদলেনও না, তার সামান্য ইন্দ্রিয়বিকার ঘটল না।

কান্নার পরে ভরত রামের পাশে বসে রইলেন। এদিকে সন্ধে হয়ে এল, ফলমূল জোগাড় করে লক্ষ্মণ ও সীতা আশ্রমে ফিরে এলেন। তাদের দেখে রামপণ্ডিত ভাবতে লাগলেন, এদের বয়েস অল্প, এখনও আমার মতো পুরো জ্ঞানলাভ করেনি, যদি হঠাৎ বলি যে পিতার মৃত্যু হয়েছে, তাহলে শোক সামলাতে পারবে না, বেদনায় বুক ফেটে যাবে। তাই কোনোভাবে এদের জলের মধ্যে নামিয়ে এই দুঃসংবাদ জানাতে হবে।

তখন সামনে একটি জলাশয় দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, তোমরা আজ অনেক দেরি করে ফিরেছ, তাই তোমাদের সাজা দিচ্ছি, তোমরা এই জলে নেমে দাঁড়িয়ে থাকো।

লক্ষ্মণ ও সীতা এই কথা শোনামাত্র জলে নেমে গেলেন। তখন রামপণ্ডিত তাদের সেই দুঃসংবাদ জানালেন। লক্ষ্মণ ও সীতা পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরে আসার পরে আবার যখন এই কথা শুনলেন তখন আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এইভাবে তারা তিনবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পরে মন্ত্রীরা তাদের পারে নিয়ে এলেন। সেখানে জ্ঞান ফিরলে সকলে মিলে বিলাপ করতে লাগলেন। তখন ভরতকুমার চিন্তা করতে লাগলেন, আমার ভাই লক্ষ্মণকুমার ও বোন সীতাদেবী পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকাবেগ সংবরণ করতে পারছেন না,

কিন্তু রামপণ্ডিত শোকে অভিভূত হননি, বিলাপও করছেন না। তার শোক না করবার কারণ কী? তাকেই জিজ্ঞাসা করি।

রামপণ্ডিত নিজের অশোকের কারণ বোঝাবার জন্য কয়েকটি গাথা বললেন। গাথাগুলির অর্থ হল: দিনরাত কান্নাকাটি করেও কেউ কাউকেই রক্ষা করতে পারে না, তাই বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান ব্যক্তি তার জন্য বৃথা শোকে কখনই কাতর হয় না। শিশু বৃদ্ধ ধনী গরিব মূর্খ বিজ্ঞ সকলেই মৃত্যুর অধীন। গাছের ডালে ফল যখন খুব পেকে যায়, তখন সবসময়েই তার পতনের ভয় থাকে, জীবেরাও তেমনি জন্মাবার পর থেকেই দিনরাত মৃত্যুভয়ে কাঁপতে থাকে। সকালে যাদের দেখা পাই, সন্ধ্যাবেলায় তাদের অনেককেই দেখতে পাওয়া যায় না, এদের মধ্যে অনেকেই সকাল ফিরে আসবার আগেই যমের হাতে অদৃশ্য হয়ে যায়। মূঢ় ব্যক্তি বৃথা শোকে অভিভূত হয়ে আত্মার অশেষ ক্লেশ সৃষ্টি করে, শোকে শরীর ক্ষয় হয়, কোনো লাভ হয় না। শোক করে তো জীবন ফিরে পাওয়া যায় না, তাই কেঁদে কী লাভ? কর্মের বশে জীব যাতায়াত করে, কেউ মরে, কেউ জন্মগ্রহণ করে। পিতা স্বর্গে গিয়েছেন, তাই তার জন্য কেঁদে লাভ কী? আমি ভেবেছি, পিতার স্থান নিয়ে গরিবকে দান করব, মানীর মান রাখব, আত্মীয়-স্বজনকে সাবধানে পালন করব। যারা সুধীর ও শাস্ত্রজ্ঞ, বড় শোক এলেও তাদের হৃদয়কে দগ্ধ করতে পারে না। এই গাথাগুলির সাহায্যে রামপণ্ডিত সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়ে দিলেন। রামপণ্ডিতের এই ব্যাখ্যা শুনে সকলে শোকমুক্ত হলেন।

তারপর ভরতকুমার রামের চরণবন্দনা করে বললেন, চলুন, এখন বারাণসীতে ফিরে চলুন।

রাম বললেন, ভাই, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে যাও, আর এদের সঙ্গে রাজ্য শাসন কর।

না, দাদা, আপনাকেই রাজ্য গ্রহণ করতে হবে।

রাম বললেন, ভাই, বাবা বলেছিলেন বারো বছর পরে এসে রাজ্য নেবে। এখন ফিরলে তার আদেশ লঙ্ঘন করা হবে। আরও তিন বছর যাক। তারপরে আমি ফিরব।

এতদিন কে রাজ্য শাসন করবে?

তুমি করবে।

আমি কখনই করব না।

তবে, আমি যতদিন না ফিরি ততদিন এই পাদুকা রাজ্য শাসন করবে। এই বলে রাম নিজের তৃণনির্মিত পাদুকাটি খুলে ভরতের হাতে দিলেন।

তখন ভরত লক্ষ্মণ ও সীতা ওই পাদুকা নিয়ে রামের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, হাজার হাজার অনুচর নিয়ে তারা বারাণসীতে ফিরে গেলেন।

রামের পাদুকাই তিন বছর বারাণসীরাজ্যের শাসনকাজ চালাল। বিবাদের নিষ্পত্তির সময়ে মন্ত্রীরা পাদুকাকে সিংহাসনের ওপরে রেখে দিতেন, যদি নিষ্পত্তি ন্যায়বিরুদ্ধ হত, তাহলে পাদুকাদুটিতে পরস্পর আঘাত লাগত, তা দেখে মন্ত্রীরা সেই বিবাদের আবার বিচার করতেন। নিষ্পত্তি ন্যায়সঙ্গত হলে পাদুকাদুটি নিশ্চল হয়ে থাকত।

তিন বছর কেটে গেল। রামপণ্ডিত বন থেকে ফিরে এসে বারাণসীর উদ্যানে পৌঁছলেন। কুমার দুজন তার আসবার কথা শুনে মন্ত্রীদের নিয়ে উদ্যানে গেলেন এবং সীতাকে অগ্রহমহিষীর পদে বরণ করে উভয়কে অভিষেক করলেন। রাম রথে চড়ে পুরবাসীদের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করলেন। নগর প্রদক্ষিণ করে সুচন্দ্রক নামে প্রাসাদের সবচেয়ে উঁচুতলায় উঠলেন। তারপর তিনি ষোল হাজার বছর যথাধর্ম রাজ্য শাসন করে স্বর্গবাসীদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য ইহলোক ত্যাগ করলেন।

এইভাবে ধর্ম উপদেশ দিয়ে শাস্তা জাতকের সমবধান করলেন। সত্য ব্যাখ্যা করবার পরে ওই ভূস্বামী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হলেন। সমবধান—তখন মহারাজ শুদ্ধোধন ছিলেন মহারাজ দশরথ, মহামায়া ছিলেন সেই মাতা, রাহুলজননী ছিলেন সীতা, আনন্দ ছিলেন ভরত, সারিপুত্র ছিলেন লক্ষ্মণ, বুদ্ধ-অনুচরেরা ছিলেন অন্যান্য বক্তি এবং আমি ছিলাম রামপণ্ডিত।

মহাভারত আলোচনায় উল্লেখ করেছি, প্রাজ্ঞ সংকলকগণ নিজেদের দর্শন ও তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই লোককথাকে ব্যবহার করেন। এবং তাদের সেই উদ্দেশ্য তারা কোনোভাবেই গোপন করেন না। জাতকমালার সংকলক বিশেষ উদ্দেশ্যেই রামচন্দ্রের এই রূপকথাটি গ্রহণ করলেন। শাস্তা ভূস্বামীকে ধর্মীয় উপদেশ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি জানেন বিমূর্ত উপদেশে তেমন ফল হয় না। তাই একটি অতীত কথা বললেন। সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে বোঝানোই তার উদ্দেশ্য। বৌদ্ধধর্মে এই বিষয়টি সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে। শোকাভিভূত হওয়া যে বিজ্ঞজনের পক্ষে অনুচিত—

এই বিষয়টি বোঝাবার জন্যই রামপণ্ডিতের উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে। মহাভারতকার যেমন ব্যবহার নীতি শেখাবার জন্য লোককথার আশ্রয় নিয়েছেন, জাতককারও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সেইভাবে লোককথার ব্যবহার করেছেন। দশরথ-জাতকের অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে এর মূল লক্ষ্য কী। ভরতের মনে প্রশ্ন জেগেছিল পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়েও রামপণ্ডিতের শোক না করবার কারণ কী? এখন রাম তেরোটি গাথা বললেন যার উদ্দেশ্য সংসারের অনিত্যতা ব্যাখ্যা করা। কাহিনি বলতে হয়েছে তাই বলা, কিন্তু মূল লক্ষ্য এই তেরোটি গাথা। রামের মানসিকতা যেন বৌদ্ধধর্মের মানুষ গ্রহণ করেন সেই কারণেই অতীত কথার অবতারণা।

বাল্মীকি-রামায়ণের রামকথার সঙ্গে এই জাতকের কাহিনির শুধুমাত্র কাঠামোতে মিল রয়েছে। সুখে রাজত্ব করছিলেন দশরথ। অশান্তি ডেকে আনলেন এক রানি। বনবাসে গেলেন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা। বনবাস থেকে ফিরে রাজা হলেন রাম। এ ছাড়া রামায়ণের সঙ্গে আর কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। রামায়ণের কাহিনি অনেক জটিল, সেই কাহিনিতে যে নাটকীয়তা ও বীরত্বের কথা রয়েছে তার কিছুই এই জাতককাহিনিতে নেই। সহজ-সরল একটি রূপকথা। রামায়ণে রাবণ চরিত্রটি যে জটিলতা সৃষ্টি করল, যে অপরূপ নাটকের জন্ম দিল তার কোনো হদিস এই জাতকে নেই। সত্যি কথা বলতে কী, মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। বিশেষ করে কয়েকটি ঘটনা এত ভিন্ন যে, রামায়ণ-পাঠকের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দশরথ-রাম-লক্ষ্মণের চরিত্রগুলি মোটামুটি মেনে নেওয়া যায় কিন্তু ভরতের প্রথমদিকের কাজকে কেমন যেন আরোপিত বলে মনে হয়। মন্ত্রীরা ভরতকে রাজ্য দিলেন না বলেই ভরত যেন রামকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। অবশ্য পরে তিনি অনুজের মতোই ব্যবহার করেছেন। জাতকে তৃতীয় রানি ও চতুর্থ পুত্রের কোনো উল্লেখ নেই। পাটরানির মৃত্যু হল, পরে আর একজনকে পাটরানি করা হল, কিন্তু তাকে যে কুমন্ত্রণা দিত সেই দাসী অনুপস্থিত। নারী হয়ে সীতা ফল আহরণ করতে যেতেন, রামপণ্ডিত আশ্রমেই থাকতেন। রাম একা বনে থাকলেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতা ফিরে এলেন। সীতা রাম-লক্ষ্মণের বোন ও শেষকালে রামের পাটরানি। রামায়ণের সঙ্গে এইসব পার্থক্য বেশ চোখে পড়ে।

বাল্মীকি রামকথাকে গ্রহণ করেছিলেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। তা হল: বাল্মীকি এমন একজন ব্যক্তির কথা শুনতে চেয়েছিলেন যিনি গুণবান বিদ্বান মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী কৃতজ্ঞ দৃঢ়ব্রত ও সৎচরিত্র। নারদ তখন রামচন্দ্রের কথা বলেন। আর ব্রহ্মা বাল্মীকিকে সমগ্র রামচরিত রচনা করতে আদেশ দিলেন। জাতক-সংকলক অন্য উদ্দেশ্যে রামকথাকে গ্রহণ করলেন।

দশরথ-জাতকের তিনটি অংশে এমন উক্তি রয়েছে যা থেকে প্রচণ্ড বিতর্কের শুরু। (ক) অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বড় ছেলের নাম রামপণ্ডিত, ছোট ছেলের নাম লক্ষ্মণকুমার ও মেয়ের নাম সীতাদেবী। (খ) তখন ভরতকুমার চিন্তা করতে লাগলেন, আমার ভাই লক্ষ্মণকুমার ও বোন সীতাদেবী পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে শোকাবেগ সংবরণ করতে পারছেন না। (গ) সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করে উভয়কে অভিষেক করলেন। অর্থাৎ জাতকে বলা হয়েছে, সীতা রামচন্দ্রের বোন এবং পরে বিবাহিতা স্ত্রী। জাতকে খুব সহজভাবে এই সম্পর্কের কথা জানানো হয়েছে, সামান্যতম বিদ্বেষ বা ঘৃণার কোনো ভাব নেই। ভাই-বোনের বিয়ে যেন খুব সহজ ঘটনা এবং তাই জাতকের রূপকথায় সহজভাবেই বলা হয়েছে। কাহিনিটিকে বিকৃত করা হয়েছে এমন কোনো আভাসই কিন্তু জাতকের রূপকথায় নেই। অথচ ধর্মীয় ভাবাবেগ কখন কীভাবে কাকে যে আঘাত করে তা বোঝা বড় কঠিন, বিশেষ করে ধর্মভীরু দেশে যেখানে মহাকাব্য-পুরাণ প্রভৃতির নায়ক-নায়িকারাও দেবদেবীর আসন দখল করে বসেন। জাতকের কাহিনিতে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলেও বিশেষ শ্রেণির মানুষ তার মধ্যেও বিকৃতির গন্ধ পেলেন। অবশ্য ভাবাবেগই এর পেছনে কাজ করেছে, যুক্তি নয়।

বছর কয়েক আগে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, রামকথার আদি উৎস হল বৌদ্ধজাতকের দশরথ-জাতক। তিনি শুধু এই মন্তব্যই করেননি, যুক্তি ও তথ্য দিয়ে বিষয়টি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মন ছিল যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত। একটি ঐতিহাসিক সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই নির্ভয়ে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আমরা জানি, এর ফলে আচার্যকে অনেক লাঞ্ছনা ও

শ্লেষবিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি ভাইবোনের বিয়ের সম্পর্কটিকেও মেনে নিয়েছেন— তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছিল।

এই ধরনের যুক্তিহীন অভিযোগ অনেক পুরনো। বৌদ্ধজাতকের অবিস্মরণীয় অনুবাদক আচার্য ঈশানচন্দ্র ঘোষের সময়েও হিন্দু-কাহিনির অপকর্ষ ঘটানোর জন্য জাতককে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বাংলায় অনূদিত জাতকের ভূমিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ঈশানচন্দ্র লিখেছেন. "রামায়ণ সম্ভবতঃ মূল মহাভারতের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। ইহার এক অংশে বুদ্ধদেবের নাম দেখা যায় বটে; কিন্তু উহা পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে দশরথ-জাতকের সহিত রামায়ণের পার্থক্য ঘটিবার কারণ কি? 'দস বস্‌স-সহস্‌সানি...— 'দশরথ জাতকের এই গাথাটির প্রথমার্দ্ধ সংস্কৃতাকারে বাল্মীকির কাব্যে অবিকৃতভাবে দেখিতে পাওয়া যায় (রামায়ণ, বালকাণ্ড, প্রথম সর্গ, ৯৮ শ্লোক—দশবর্ষসহস্রানি দশবর্ষ শতানি চ...)। কাজেই সন্দেহ জন্মে যে, জাতককারই সমস্ত আখ্যানটী রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিকৃতি ঘটাইয়া আখ্যানটীর অপকর্ষ সম্পাদন করা জাতককারের উদ্দেশ্য-বিরুদ্ধ এ যুক্তিও নিতান্ত দুর্বল নহে। তবে কি বলিতে হইবে যে জাতকরচনার সময়েও রামায়ণের শ্লোকগুলি নানাস্থানে নানাভাবে চারণাদির মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল; অতঃপর তাহাদের সঙ্কলন সম্পাদিত হয়?"

ঈশানচন্দ্র শেষকালে যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন তার মধ্যেই এই অপকর্ষ বিষয়টির সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। জাতককার কোনোভাবেই জনপ্রিয় এই রামকথার অপকর্ষ ঘটাননি। তারও উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার, জনপ্রিয় কোনো আখ্যানের অপকর্ষ ঘটালে শ্রোতা বা পাঠক তা কখনও সহজে মেনে নেন না। মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করা বৌদ্ধজাতকের উদ্দেশ্য নয়। আর দশরথ-জাতকটি পড়লেও বোঝা যাবে সেভাবে কাহিনিটি বলা হয়নি।

বাল্মীকি রামায়ণের সূচনাতেই আমরা জানতে পেরেছি, রামকথা ছিল বিদিত ও প্রচারিত কাহিনি। লোকসমাজের নিজস্ব সম্পদ ছিল এই লোককথাটি। বাল্মীকি নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে অপরূপ মহাকাব্যে রূপান্তর ঘটালেন আর জাতকে প্রয়োজন ছিল শুধু কাহিনিটির। দুজনেই লৌকিক উৎস থেকে আখ্যানটি গ্রহণ করেছেন। কেউ কারও কাছে

ঋণী নন, ঋণ শুধু লৌকিক ঐতিহ্যের কাছে। জাতক-মহাভারত-পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির অসংখ্য কাহিনিতে যে এত মিল তার কারণ উৎস। এক এক জন সংকলক এক এক উদ্দেশ্যে কাহিনিগুলিকে গ্রহণ করেছেন। কথক বা চারণকবিদের মুখে মুখে ফিরত এসব লোককথা-গাথা, সেখান থেকেই এগুলো উচ্চতর সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। তাই রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়াড-ওডিসিতে যা ঘটেছে, জাতকের কাহিনিমালাও সেভাবেই সংকলিত হয়েছে। পরে আমরা জাতকের অনেক কাহিনির এই একই উৎসের সন্ধান দেব।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। জাতকের রাম কাহিনিটি রামায়ণ কাহিনি থেকে এত আলাদা কেন? আসলে, রূপকথা-পশুকথা-লোকপুরাণ-পরিকথা নানা রূপে নানা অঞ্চলে দেখা যায়। মূল কাঠামোটি এক, কিন্তু এলাকাভেদে রূপের কিছু পরিবর্তন ঘটে। তাই আমরা দেখেছি, একটি লোককথার পঞ্চাশ-ষাটটি পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ। জাতকে এমন অনেক পশুকথা রয়েছে, যা কিছুটা অন্যভাবে পঞ্চতন্ত্র কিংবা হিতোপদেশে রয়েছে। যিনি যে এলাকা থেকে সংগ্রহ করেছেন সেখানকার রূপই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। জাতককার যে এলাকা থেকে দশরথের আখ্যানটি সংগ্রহ করেছিলেন সেখানকার লোকসমাজে এইভাবেই রূপকথাটি বলা হত। তাই রামায়ণের কাহিনির সঙ্গে এত তফাত। দশরথ-জাতক ও রামকথার উৎস লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য, কিন্তু ভিন্ন এলাকার লোকসমাজের গল্প সংগ্রহ করেছিলেন দুই সংকলক।

লোককথায় ভাইবোনের বিয়ে

দুটি আখ্যানের ভিন্নতার কারণ না হয় স্বীকার করে নেওয়া গেল, কিন্তু ভাইবোন রাম সীতার বিয়ের বিষয়টি তো বিতর্কিতই থেকে যায়।

লোকসমাজ নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষ হতে পারেন কিন্তু তারা অশিক্ষিত নন, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আশ্চর্য শিক্ষিত মানুষ। তাদের সৃষ্ট মৌখিক লোককথায় থাকে ইচ্ছাপূরণের তাগিদ। জীবনে যা পাওয়া হল না, লোককথার মাধ্যমে সেই ইচ্ছাকে তারা পূর্ণতা দেন। লোককথায় প্রতীক ও রূপকের আড়ালে থাকে অবিচার-বেদনা-অত্যাচার-আশা-আকাঙ্ক্ষার রূঢ়

বাস্তব ছবি। আর থাকে সামাজিক ইতিহাস ও রীতিনীতির খণ্ড চিত্র। এক সময়ে লৌকিক সমাজে যে রীতি প্রচলিত থাকে তা লোককথায় স্থান করে নেয়। পরবর্তী কালে রীতিটি বিলুপ্ত হলে অনেক সময় লোককথায় তা বাদ পড়েও যায়, আবার অনেক সময় থেকেও যায়। সমাজের এমন একটি স্তরে আমরা পৌঁছই যখন সেই রীতিটিকে উদ্ভট-অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু একসময় তা যে সমাজে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ মেলে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়। ভারত ও আফ্রিকার অনেক রূপকথায় আমরা দেখি, রাজপুত্র অনেক বাধা পেরিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করল, তারপরে রাজকন্যাকে বিয়ে করে অর্ধেক রাজত্ব পেয়ে সেখানেই সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল। অধিকাংশ রূপকথায় দেখি, রাজপুত্র আর পিতৃরাজ্যে ফিরে এল না। এটা হয়তো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভুলে-যাওয়া চিত্র। রাজকন্যা পেল পিতার সম্পদ, আবার রাজপুত্রের বোন হয়তো পাবে রাজপুত্রের পিতার সম্পদ। তাই ফেরার প্রশ্নই ওঠে না।

সামাজিক কোনো রীতিনীতি এককালে অনুমোদিত থাকলেও পরে তা যদি নিন্দিত হয় তবে তার ওপরে দেবত্ব বা অতিলৌকিকতা আরোপ করা হয়। কিন্তু মূল কাহিনিটি থেকেই যায়। দেবত্ব আরোপের পরে রীতিটি আর তেমন কুৎসিত বলে মনে হয় না। একসময় কুমারীর সন্তান হওয়া ছিল স্বাভাবিক, সমাজে তা স্বীকৃতও ছিল। কিন্তু যেই সমাজ এই প্রথাকে নিষিদ্ধ করল তখনই দেবত্ব আরোপের প্রশ্ন ওঠে। কুন্তী ও মাতা মেরির কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের পথে এই রীতিটি যখন নিষিদ্ধ হল, তখনই দৈব প্রভাবের বিষয়টি যুক্ত হল।

ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি এই দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। ভারতবর্ষে বহুকাল আগেই এই বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু দশরথ-জাতকের ওই আখ্যানে তার রেশ রয়ে গিয়েছে। সামাজিক ইতিহাসের একটি বিশেষ প্রথা ক্ষীণভাবে আখ্যানটির মধ্যে রয়ে গিয়েছে। ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি শুধু লোককথাতেই নয়, ইতিহাসও তার সাক্ষী। স্বয়ং বুদ্ধ যে বংশে জন্মেছিলেন, সেই লিচ্ছবিদেরই কোনো শাখার মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল।

ভারতের সাঁওতাল আদিবাসীদের এক প্রাচীন মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। তাদের সংস্কৃতি ও ভাষার শব্দভাণ্ডারের কাছে আমরা ঋণী। তাদের সৃষ্টি বিষয়ক লোকপুরাণে রয়েছে:

খেরোওয়াল বংশের আদি পিতামাতার নাম পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি। তাদের সাত ছেলে ও সাত মেয়ে ছিল। ছেলেদের নাম লিটা কাতরি, লাও লাসান, ভীম অর্জুন, কাপি কারান, টেগচ সুরাই, রতন পঁড়া ও হুদুড় দুর্গা। মেয়েদের নাম ছিতা, কাপারা, দানগী, পুড়গী, হিঁসি, ডুমনী ও গুইরী।

ছেলেমেয়েরা বড় হলে বাবা-মা ভাবলেন, এরা যদি একসঙ্গে থাকে তাহলে যৌবনের চপলতার সুযোগে পদস্খলন হতে পারে এবং অসামাজিক কাজ করতে পারে। কারণ তারাও নিজেরা হাঁস ও হাঁসির ডিম থেকে জাত ভাই ও বোন। কিন্তু তারা মারাং বুরুর সাহচর্যে থেকে দেবভাবাপন্ন হলেও মানুষের বংশবৃদ্ধির জন্য গুরুদেব তাদের হাঁড়িয়া খাইয়ে অজ্ঞান করায় তারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে ওই ধরনের দোষ-দুষ্ট না হয়, সেই জন্য পিলচু বুড়ো ছেলেদের নিয়ে খাদেরা বনে চলে যায় আর পিলচু বুড়ি মেয়েদের নিয়ে খাইরী বনে চলে যায়।

বাবা ছেলেদের সাবধান করে বলেছিলেন, তারা যেন খাইরী বনে শিকার করতে না যায়। কেননা, সেই বনে এক ধরনের কুকুর আছে, তারা মানুষকে পেলে ভীষণভাবে আক্রমণ করবে। পিলচু বুড়িও মেয়েদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, তারা যেন খাদেরা বনে শাকপাতা বা ছাতু কুড়োতে না যায়। কেননা, খাদেরা বনে এক ধরনের হিংস্র কুকুর আছে, তারা মানুষকে পেলে ভীষণভাবে আক্রমণ করবে।

কিন্তু ছেলেদের তখন যৌবনকাল, কাউকে ভয় করে না। সেইজন্য পিতার আদেশ লঙ্ঘন করে খাইরী বনে শিকার করতে গেল। দৈবক্রমে তারা একটি হরিণ পেয়ে গেল, তাকে তির ছুড়ে মারল। তারা তির খুঁজতে খুঁজতে ও হরিণের রক্ত অনুসরণ করতে করতে এক জায়গায় এল। সেখানে তাদের বোনেরা চাঁপাকিয়া বড় গাছের ঝুরিতে ঝুলছিল। ভাইয়েরা বোনেদের দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। বোনেরাও ভাইদের দেখে অবাক।

তারা পরস্পরের জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বোনেরা বলল, আমাদের জাতি ঠান্ডা কলসি ও বেটনা। বোনেরাও ভাইদের জিজ্ঞাসা করাতে ভাইরা বলল, লাঙলের বাঁকা বোঁটা ও গোরু তাড়াবার লাঠি। পরস্পরের উত্তর শুনে তারা বিচার করে দেখল, তারা এক গোত্র নয়। ওদিকে যৌবনের চপলতার সুযোগে ও কামের তাড়নায় ভাই বোন আগুপিছু না ভেবে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করল ও আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। তারা কেউ বাবা-মা'র কথা স্মরণ করল না।

অনেক রাত হয়ে গেল তবু মেয়েরা মায়ের কাছে ফিরে গেল না। তখন পিলচু বুড়ি পিলচু বুড়োর কাছে গিয়ে বলল, মেয়েরা আজ এখনও ফিরে আসেনি। পিলচু বুড়োও বলল, ছেলেরাও ফিরে আসেনি।

তখন পিলচু বুড়ো ও পিলচু বুড়ি ছেলেমেয়েদের খোঁজে বের হল। সেই চাঁপাকিয়া বড় গাছের তলায় তাদের দেখতে পেল। অগত্যা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাদের সংসারী করে দিল।

এইসব ঘটনা লিটার কানে পৌঁছতে তিনি ভাবলেন, এরা সকলেই কামাসক্ত। তাহলে কী উপায়ে একটি সৎ বংশ জন্মগ্রহণ করে জগতে দেবভাব প্রচার করবে? তখন মারাং বুরু ছোট ছেলে হুদুড় দুর্গা ও ছোট মেয়ে গুইরীর মনের মধ্যে দাদা-দিদিদের প্রতি ঘৃণা ও তার প্রতি ভক্তি ও সংসারে অনাসক্ত ভাবের সঞ্চার করলেন। তখন তাদের মনে সংসারে বিরাগ ভাবের সঞ্চার হওয়াতে এবং মারাং বুরুর মনোরঞ্জনের জন্য তারা ঘর থেকে বেরিয়ে বনে তপস্যা করতে গেল।

তারা নানা বনে প্রবেশ করে বনের ফলমূল আহরণ করে দিন কাটাতে লাগল। রাতে তারা গাছের কোটরে বাস করত। মারাং বুরু সময় সময় তাদের কাছে যেতেন এবং বিয়ে দেবার প্রস্তাব করে তাদের মন পরীক্ষা করতেন। উত্তরে দুর্গা ও গুইরী বলত, দাদা, আমাদের বিয়ের কথা বলবেন না। আমরা ভালো আছি। আপনার সেবা করেই জীবন কাটিয়ে দেব।

এইভাবে তারা বনে বাস করে, ফলমূল খেয়ে, গাছের কোটরে রাত কাটিয়ে ও নিয়মিত মারাং বুরুর সেবা করে কষ্টসহিষ্ণু ও সংযমী হয়ে উঠল। তারা অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হল।

পুরুষমানুষ চিরকাল সাধু-সন্ন্যাসীর মতো হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মেয়েরা সেভাবে চিরকাল থাকতে পারে না। গুইরীর মনে এই একা একা থাকা দুর্বহ হয়ে উঠল। এইজন্য সে সময় সময় তার এই নিঃসঙ্গতার জন্য মনের দুঃখ গানে প্রকাশ করত।

দুর্গা বনের মধ্যে ফলমূল আহরণের জন্য সব জায়গায় ঘুরত। দৈবক্রমে গুইরীর এই গান দুর্গার কানে পৌঁছল। সে ভাবল, এতদিন আমি বনের মধ্যে বাস করছি, কোনোদিন কোনো মানুষের দেখা পাইনি। আজ কে কোথা থেকে এসে এখানে কাঁদছে? আমি তাকে দেখব, সে কেন কাঁদছে তা জিজ্ঞেস করব।

এই কথা ভেবে দুর্গা গান লক্ষ্য করে সেই দিকে গেল। এদিকে গুইরী মানুষের সাড়া পেয়েই সেই গাছের কোটরে আশ্রয় নিল। কতদিন ধরে দুর্গা গুইরীকে ধরার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু তাকে ধরতে পারল না।

শেষকালে দুর্গা বনের মধ্যে লুকিয়ে রইল। আর যেমনি গুইরী আবার গান আরম্ভ করেছে, অমনি পেছন দিক থেকে গিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরল। গুইরী পালাবার অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। পরে বলল, কে তুমি ডোম না হাড়ি আমাকে স্পর্শ করলে? আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার বাসায় চলে যাব।

তখন দুর্গা বলল, আমি ডোম কি হাড়ি নই, আমি তপস্বী। তোমার পরিচয় দাও। কেন তুমি কাঁদ? এসব কথার উত্তর না দিলে আমি তোমায় ছাড়ব না।

তখন গুইরী বলল, আমি কে তা জানি না, তবে আমি এই বনে বাস করি। আমি একা একা থাকি। আমার স্বামী নেই, তাই যখন মনে খুব দুঃখ হয় তখন গানে মনের দুঃখ জানাই, মনকে হালকা করতে চেষ্টা করি।

গুইরীও দুর্গাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? কোথা থেকে এলে?

দুর্গা বলল, আমি অন্য বনে থাকি। আমিও একা একা থাকি। ফল-মূল আহরণ করতে এসে তোমার কান্না শুনতে পাই। তুমিও একা, আমিও একা — একসঙ্গে থাকলে কি ভালো হয় না? চলো, আমরা একসঙ্গে থাকি।

দুর্গার এই প্রস্তাব শুনে গুইরী বলল, আমরা একা একা আছি, বেশ ভালোই আছি, যা দুঃখ-কষ্ট তা অন্য কাউকেই ভোগ করতে হবে না। দুজন একসঙ্গে থাকলে দুঃখ-কষ্ট বাড়বে।

দুর্গা তখন বলল, দুজন একসঙ্গে থাকলে দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নেব। দুজন একসঙ্গে থাকলে মনোবল বাড়বে, দুঃখ-কষ্ট কম হবে। চলো আমরা একসঙ্গেই থাকি।

এবারে গুইরী আর কিছু বলতে পারল না। দুজন একসঙ্গে অযোধ্যা বনে বাস করতে লাগল। এরাই মুরমু ঠাকুর বা ব্রাহ্মণ। যেহেতু সংসারে থাকার জন্য যে গুণ দরকার বনের মধ্যে থেকে অভ্যাস করে তারা তা শিখেছিল। দুর্গা ও গুইরী সংসারী হল। তাদের সাত ছেলে জন্মাল। শেষের দুজনেই কুরমু ধুরমু।

সমাজে একটি রীতি অনেকদিন প্রচলিত থাকার পরে তা অনেকসময় নিষিদ্ধ হয়। মূল্যবোধ পালটে যায়, মানুষের চিন্তার উত্তরণ ঘটে। এই আদিবাসী সমাজে ভাইবোনের বিয়ের প্রচলন ছিল। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে যখন চিন্তায় বিবর্তন ঘটে গেল, তখন এই বিয়ের সম্পর্কটিও বন্ধ হয়ে গেল। বাবা-মায়েরা যেদিন উপলব্ধি করলেন, ভাই-বোনের বিয়ের সম্পর্কটি সমাজের পক্ষে শুভ নয় তখনই তারা ছেলেমেয়েদের আলাদা বনে পাঠিয়ে দিলেন। অর্থাৎ সচেতনতা জেগে উঠেছে। কিন্তু এই ভাইবোন বিয়ের বিষয়টি পরবর্তী কালে আদিবাসী সমাজ থেকে বিলুপ্ত হলেও প্রাচীন প্রথার রেশ রয়ে গিয়েছে এই সৃষ্টি বিষয়ক লোকপুরাণটিতে।

আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশে কালাহারি মরুভূমি এলাকার ন্‌গোমবে আদিবাসীদের একটি লোককথায় রয়েছে এই একই বিষয়। পৃথিবীতে এত লোক এল কেমন করে,— এই ভাবনা থেকেই এই লোকপুরাণটির জন্ম। লোকপুরাণটি হল:

সেই আদ্যিকালে আমাদের এই পৃথিবীতে কোনো মানুষ ছিল না। মানুষ আকাশে আকোংগোর সঙ্গে সুখে-শান্তিতে বাস করত। সেই আকাশে থাকত এক বউ, তার নাম ম্‌বোকোমু। সব বিষয়েই তার ছিল বিরক্তি, সে ছিল ভীষণ দজ্জাল।

একদিন হল কী, আকোংগো রেগে গিয়ে সেই বউকে আর তার এক মেয়ে ও এক ছেলেকে ঝুড়ির মধ্যে রেখে, কিছু গম, কিছু আখ আর মেটে আলু দিয়ে ঝুড়ি নামিয়ে দিলেন। তারা এসে পৌঁছল পৃথিবীতে।

তারা পৃথিবীতে এসে একটা বাগান তৈরি করল। গম, আখ আর আলু বুনল। দিনরাত যত্ন নিত সেই বাগানের। প্রচুর ফসল হল।

একদিন মা বলল, আমরা মরে গেলে এই বাগানের যত্ন নেবার আর কেউ থাকবে না। বাগান শুকিয়ে যাবে।

ছেলে বলল, তা আর কী করা যাবে? কেউ না থাকলে বাগান তো শুকিয়ে যাবেই।

মা বলল, তোমার ছেলেমেয়ে হওয়া দরকার।

ছেলে বলল, কেমন করে? আমরা তো এখানে মাত্র তিনজন রয়েছি। অন্য কেউ তো নেই। আমি বউ পাব কোথায়?

মা সঙ্গে-সঙ্গে বলল, তোমার বোন তো একজন মেয়ে। তাকেই বিয়ে কর, তাহলে ছেলেমেয়ে হবে।

ছেলে কিন্তু মায়ের কথায় রাজি হল না। মা বারবার একই কথা বলে আর ছেলেও রাজি হয় না। এমনি করে দিন যায়।

শেষকালে মা একদিন রেগে গিয়ে বলল, এইভাবেই কি চলবে? ছেলেমেয়ে না রেখেই মরে যাবে? বাগানের গাছ-গাছালি দেখবে কে? তুমি যদি বোনকে বিয়ে কর, তবেই তোমাদের ছেলেমেয়ে হতে পারে। ওসব কথা শুনছি না, বোনকে বিয়ে করতেই হবে। অনেক হয়েছে।

শেষকালে ছেলে রাজি হল। বোনকে বিয়ে করল। মেয়েও হাসিমুখে মেনে নিল ছেলেকে। তারা দুজনে একসঙ্গে থাকতে লাগল। কিছুদিন পরে মেয়েটি পোয়াতি হল। মেয়ের ছেলে হল। তারপর তাদের আরও অনেক ছেলেমেয়ে হল। পৃথিবী মানুষে ভরে গেল।

ভাই-বোনের বিয়ে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু ছেলে যে প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল তা পরবর্তীকালে গল্পে আরোপিত হয়েছে। সমাজ বির্বতনের ধারায় পারিবারিক সম্পর্ক যখন উন্নত হল, মানুষের সম্পর্কগত মূল্যবোধ যখন পরিশীলিত হল, ভাইবোনের মধুর সম্পর্কটি যখন সমাজ অনুভব করল তখনই মৃদু আপত্তি করতে করতে একদিন সেই প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেল। সমাজ একদিন এমন স্তরে এসে পৌঁছল যখন ভাইবোনের সম্পর্কের মধ্যে দৈহিক মিলনের স্থূল বিষয়টিকে বর্জন করল। তাই আজকের সমাজব্যবস্থায় বেড়ে-ওঠা মানসিকতায় সেই প্রাচীন প্রথাটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল।

ভাইবোনের বিয়ের সম্পর্ক বিষয়ে লোককথা খুব যে বেশি রয়েছে তা নয়। তবে ঐতিহ্যবাহিত কিছু সমাজে এরকম কিছু লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার বেনিয়াডি এলাকার শিকারজীবী একজন আদিবাসী ও উত্তরপ্রদেশের মুসৌরীর চাক্রাতা রাস্তার পাশে এক গ্রামে একজন গাড়োয়ালি পাহাড়িয়ার মুখে ভাইবোনের বিয়ের লোককথা শুনেছিলাম। আর কেউ নেই, ভাইবোন তাই বাধ্য হয়ে বিয়ে করল। কিন্তু পাহাড় ও বনের দেবতা ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, তোমাদের ক্ষমা

করলাম, কিন্তু এই কাজ আর যেন কেউ না করে। বোঝাই যাচ্ছে, এই বিয়ের সম্পর্কটি ট্যাবু হয়ে যাওয়ার পরেই দেবতার রোষের কাহিনিটি যুক্ত হয়েছে।

এস্কিমো, আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব ও ম্যাকেনজি এলাকার রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে 'সূর্য ও চন্দ্রে'র কিছু লোককথা রয়েছে। সূর্য হল ভাই, চন্দ্র হল বোন। তারা বিয়ে করেছিল কিন্তু আকাশের দেবতার অভিশাপে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তাই আজ আর কখনই তাদের একজনের সঙ্গে অন্যজনের দেখা হয় না। উত্তর আমেরিকার অনেক আদিবাসীর মধ্যেও এই ধরনের ভাইবোনের বিয়ের লোককথা রয়েছে।

পৃথিবীর অনেক জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণে রয়েছে, কোনো কারণে একটি নারী ও একটি পুরুষ স্বর্গচ্যুত হল। তারাই পৃথিবীর আদি মানব-মানবী। তারপরে পৃথিবীতে মানুষ ছড়িয়ে পড়ল। বাইবেলের আদম-ইভের কাহিনি তো অতি পরিচিত। এখানেও ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া হল। এই আদি মানব-মানবীর ছেলে বউ পেল কোথায়, মেয়ে স্বামী পেল কোথায়? তারা নিশ্চয় সহোদর-সহোদরা ছিল। অবশ্য এই আদি মানব-মানবীর কথা নেহাতই কল্পনা।

তবে ভাইবোনের বিয়ে সম্পর্কে যত লোককথা সংগৃহীত হয়েছে, তার অধিকাংশের মধ্যেই এই সম্পর্কটিকে সহজে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি।

ইতিহাসের বাস্তব উদাহরণের দিকে তাকালেও আমরা ভাইবোনের বিয়ের নিদর্শন পাই। মিশর, পারস্য, পেরু, শ্যাম, সিংহল, ওয়েলস, ব্রহ্মদেশ, হাওয়াই ও উগান্ডার রাজপরিবার, সামন্তপ্রভু ও সমাজের উচ্চস্তরের ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে এই সেদিনও ভাইবোনে বিয়ে হত। এটা প্রাগৈতিহাসিক বা আদিম কালের কথা নয়। মিশরে শুধু রাজ পরিবারে নয় সাধারণ লোকসমাজেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ইউরোপীয় মানুষেরা যখন এসব দেশে আসতে শুরু করল, খ্রিস্টধর্ম যখন প্রভাব ফেলতে শুরু করল, তখন থেকেই ধীরে ধীরে সমাজে এই বিয়ের সম্পর্কটি বিলুপ্ত হতে থাকল। হাওয়াই দ্বীপে এই প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। ভারতে হিমালয় এলাকায় বিষয়সম্পত্তি অটুট রাখার জন্য কিছু আদিবাসী সমাজে কিছুকাল আগেও এই ধরনের বিয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল।

তাই একথা বলা যায় যে, জাতকের সংগ্রাহক দশরথ-জাতকে কোনো সম্পর্কের অপকর্ষ ঘটাননি। তিনি এই ধরনের একটি লোককথাকে হুবহু সংকলনে স্থান দিয়েছেন। আর হিন্দুধর্মের অপকর্ষ দেখানোও তার উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, হিন্দু পুরাণেও ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি একবারে অনুল্লিখিত নয়।

ভারতীয় পুরাণে ধর্মরাজ, দক্ষিণদিকের অধিপতি, জীবের পাপপুণ্যের ফলদানকারী যম সম্পর্কে নানা কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। এর পিতা সূর্য, মাতা সংজ্ঞা। এর বাহন মোষ ও অস্ত্র দণ্ড। দক্ষ প্রজাপতির তেরোটি কন্যাকে ইনি বিয়ে করেন, এদের গর্ভে যমের সত্য, প্রসাদ, অভয়, শম, হর্ষ, গর্ব, নর ও নারায়ণ এই ক'টি পুত্র জন্মায়। কুন্তীর গর্ভে যমের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়।

আরও কাহিনি রয়েছে। বৈদিক পুরাণে বলা হয়েছে, যমের প্রতি দেবত্ব আরোপ করা হয় কিন্তু তিনিই প্রথম মানুষ যিনি মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। যম ও তার বোন যমী পৃথিবীর আদি মানব-মানবী। তাহলে লোকপুরাণের মতে, তাদের সন্তানদের নিশ্চয়ই ভাইবোনে বিয়ে হয়েছিল যেমন তারাও ভাই-বোন ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। ঋগ্‌বেদে অন্য কাহিনি আছে। বোন যমী নির্জন দ্বীপে ভাইকে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন— বিস্তীর্ণ সমুদ্র-মধ্যবর্তী এই দ্বীপে এসে এ নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী। কেননা, গর্ভাবস্থা থেকে তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দর নাতি জন্মাবে। ভাই যম যে এই প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন, পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তা পরবর্তীকালে আরোপিত। বৈদিক সমাজের এক স্তরে এই প্রথা অবশ্যই প্রচলিত ছিল।

বিষ্ণু, কূর্ম, ব্রহ্মাণ্ড ও গরুড় পুরাণে আছে, মনুর অন্যতমা কন্যা কাকুতি প্রজাপতি রুচির স্ত্রী ছিলেন। কাকুতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক ছেলে ও দক্ষিণা নামে এক মেয়ে জন্মায়। যজ্ঞ নিজের বোন দক্ষিণাকে বিয়ে করেন।

দ্বাপরের অবসানে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্মের জন্ম হয়। অধর্মের স্ত্রীর নাম মিথ্যা। তাদের দম্ভ নামে এক ছেলে হয়। দম্ভ নিজের বোন মায়াকে বিয়ে করে। এই কাহিনিটির মধ্যে সুন্দর প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। দম্ভ ও মায়ার এক ছেলে হয়। তার নাম লোভ। লোভ নিজের বোন নিবৃত্তিকে

বিয়ে করে। তাদের আবার ক্রোধ ও হিংসা নামে ছেলেমেয়ে হয়। ক্রোধ নিজের বোন হিংসাকে বিয়ে করে। অধর্ম ও মিথ্যা মিলিত হলে যে সর্বনাশের জন্ম হয় এই কাহিনি যেন তারই ইঙ্গিত বহন করছে।

এরকম অনেক কাহিনি রয়েছে ভারতীয় লোকপুরাণে। সমাজে ভাইবোনের বিয়ের প্রথাটি ছিল বলেই লোকপুরাণ-রূপকথায় তা স্বাভাবিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরকম একটি রূপকথাই হল দশরথ-জাতক। লৌকিক ঐতিহ্য থেকেই জাতককার, বাল্মীকি ও বেদব্যাস দশরথের কাহিনিকে তাদের সংকলনে লিপিবদ্ধ করে যান। উৎস এক, কারও প্রভাবে কেউ প্রভাবিত হননি।

জাতকে পশুকথা

জাতকে বেশ কিছু পশুকথা সংকলিত হয়েছে। অবশ্যই জাতকের আদর্শের প্রয়োজনে। এর মধ্যে অনেক পশুকথা লিপিবদ্ধ রয়েছে বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রে, সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে, হিতোপদেশে এবং ঈশপের নীতিকথায়। এর মধ্যে নেকড়ে ও সারস এবং সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভ পশুকথা দুটি খুবই জনপ্রিয়। যেহেতু অন্য সংকলনগুলোর অনেক আগে জাতকের জন্ম, তাই স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে, জাতকের সংকলন থেকে এগুলো অন্য সংকলনে অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু বিষয়টি তা নয়। লৌকিক উৎস থেকেই প্রত্যেকে সংগ্রহ করেছেন। নিজের নিজের সংকলনের প্রয়োজনেই এগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

লৌকিক পশুকথা কীভাবে জাতকের প্রায়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখা দরকার। শুধুমাত্র কাহিনিটি ব্যবহার করলেই জাতককারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। তার মধ্যে একটি ধর্মীয় দর্শনকেও প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। জাতককার সেটা কীভাবে ব্যবহার করেছেন? অতি পরিচিত 'বক ও কাঁকড়ার কথা' পশুকথাটি নেওয়া যেতে পারে। জাতকে এটি বকজাতক নামে রয়েছে। একটু অন্যভাবে এই কাহিনি রয়েছে পঞ্চতন্ত্রে।

শাস্তা পশুকথাটি বললেন। কিন্তু এই কাহিনি বিবৃতির আগে একটি প্রস্তাবনা রয়েছে। অকারণে শাস্তা কোনো লোককথা বলতে পারেন না, জাতকে যখন সংকলিত হল তখন নিশ্চয়ই এর কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। কাহিনি বলবার আগে প্রস্তাবনায় রয়েছে:

জেতবনের একজন ভিক্ষু খুব সুন্দর কৌপীন তৈরি করতে পারত। খুব ভালো কৌপীন তৈরি করতে পারত বলে অনেকেই তার কাছ থেকেই কৌপীন নিত। লোকে তাকে 'চীবর-বর্ধক' বলত। সে ছেঁড়া কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করে নিজের নৈপুণ্যে সুন্দর কৌপীন বানাত। যারা এটা তৈরি করতে জানত না, তারা নতুন কাপড় নিয়ে তার কাছে যেত। বলত, আমরা কৌপীন তৈরি করতে জানি না, আপনি আমাদের কৌপীন তৈরি করে দিন। সে বলত, ভাইসব, কৌপীন তৈরি করতে অনেক সময় লাগে। এই একটা কৌপীন তৈরি করা আছে, যদি ইচ্ছে হয় তবে কাপড়গুলোর বদলে এই কৌপীন নিতে পার। এই কথা বলে সে কৌপীন বের করে দেখাত। ভিক্ষুরা বাইরের চটক দেখে ভুলে যেত, ভেতরে কী আছে তা জানত না। তারা চীবর-বর্ধককে নিজেদের নতুন কাপড় দিয়ে তার বদলে সেই পুরনো কাপড়ে তৈরি কৌপীন নিয়ে যেত। কিন্তু কৌপীন ময়লা হয়ে গেলে ভিক্ষুরা তা গরম জলে কাচত, তখন আসল ব্যাপার বুঝত। এখানে জোড়া, ওখানে তালি দেওয়া, আরেক জায়গায় ফাটা। তখন তারা বুঝত, নতুন কাপড়ের বদলে তৈরি-করা কৌপীন নিয়ে তারা নিতান্ত প্রতারিত হয়েছে। তখন সব জায়গায় জানাজানি হয়ে গেল, চীবর-বর্ধক ছেঁড়া-ফাটা পুরনো কাপড় দিয়ে কৌপীন বানিয়ে ভিক্ষুদের প্রবঞ্চিত করছে।

ওই সময়ে কাছের এক গ্রামে একজন সুনিপুণ চীবর-বর্ধক ভিক্ষু বাস করত এবং জেতবনবাসী ভিক্ষুর মতো সেও গ্রামবাসীদের প্রতারিত করত। জেতবনের ভিক্ষুদের মধ্যে এই ব্যক্তির কয়েকজন বন্ধু ছিল। তারা একদিন তাকে বলল, লোকে বলে জেতবনে একজন চীবর-বর্ধক আছে, সেও তোমার মতোই সবাইকে ঠকায়। তা শুনে সেই লোকটি ভাবল, আচ্ছা আমি সেই জেতবনের চীবর-বর্ধককেই ঠকাব। তখন সে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় দিয়ে একটা সুন্দর কৌপীন তৈরি করল, সেটা খুব উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রাঙিয়ে নিল। তারপরে সেই কৌপীন গায়ে পরে জেতবনে গেল। জেতবনের চীবর-বর্ধক তা দেখে লোভে পড়ে জিজ্ঞেস করল, এই কৌপীন কি তুমি তৈরি করেছ? সে বলল, হ্যাঁ, আমিই এটা তৈরি করেছি। তখন জেতবনের ভিক্ষু বলল, এই কৌপীনটা আমায় দাও না, আমি এর বদলে অন্য কিছু দিচ্ছি। তখন গ্রামের ভিক্ষু বলল, আমরা গ্রামের ভিক্ষু, গ্রামে ভিক্ষুদের ব্যবহারের জিনিস

সহজে পাওয়া যায় না, তোমাকে এই কৌপীন দিলে আমি কী পরব? অন্য ভিক্ষু বলল, আমার কাছে নতুন কাপড় রয়েছে। তুমি সেই কাপড় নিয়ে গিয়ে কৌপীন বানিয়ে নাও। গ্রামের ভিক্ষু বলল, আমি অনেক যত্নে এই কৌপীন বানিয়েছি, কিন্তু তুমি যখন এটা চাইছ, তখন আমি আর কী বলতে পারি? তুমি এই কৌপীনটা নাও। এইভাবে গ্রামের ভিক্ষু জেতবনের ভিক্ষুকে ঠকিয়ে নতুন কাপড়ের বদলে পুরনো কৌপীন দিয়ে সেখান থেকে চলে এল।

জেতবনের ভিক্ষু কয়েকদিন ব্যবহার করে একদিন সেই কৌপীন জলে ধুতে গেল আর কৌপীন পুরনো কাপড়ে তৈরি বুঝতে পেরে অপ্রতিভ ও লজ্জিত হল। গ্রামের ভিক্ষু জেতবনের ভিক্ষুকে ঠকিয়েছে এই কথা সংঘের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্মসভায় এই কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বললেন, জেতবনবাসী ভিক্ষু পূর্বজন্মেও এইভাবে প্রতারণা করত এবং এবার যেমন নিজে প্রতারিত হয়েছে, পূর্বজন্মেও সেইভাবে প্রতারিত হয়েছিল। তখন তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

মূল লোককথাটির সঙ্গে অত্যন্ত সুকৌশলে এই প্রস্তাবনাকে যুক্ত করে দিয়েছেন জাতককার। এইখানেই সংকলকের কৃতিত্ব। এরপর শুরু হল মূল লোককথা।

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব কোনো এক বনের মাঝখানে পদ্মসরোবরের কাছের এক গাছে বৃক্ষদেবতা হয়ে বাস করছিলেন। তখন একটা মাঝারি মাপের পুকুরে প্রতি বছর গরমকালে জল খুব কমে যেত। এই পুকুরে মাছ ছিল। একদিন এক বক মাছদের দেখে মনে করল, এদের কোনোভাবে ঠকিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। একদিন খব চিন্তা করছে এইরকম ভাব করে পুকুরের ধারে বসে রইল।

মাছেরা বককে দেখতে পেয়ে বলল, আর্য, আপনি এত কী ভাবছেন?

বক বলল, আমি তোমাদের কথাই চিন্তা করছি।

আমাদের জন্য কীসের চিন্তা?

এই পুকুরের জল কমে আসছে। খাবার-দাবারেব অভাব পড়ছে, খুব গরমও পড়েছে— তাই বসে ভাবছি, মাছ বেচারিরা এখন কী করবে।

বলুন তো আর্য, এখন তবে আমরা কী করব?

তোমরা যদি আমায় বিশ্বাস কর, তাহলে এক কাজ করা যেতে পারে। কিছুদূরে একটা সরোবর আছে, তাতে পাঁচ রঙের পদ্ম ফোটে। আমি তোমাদের এক একজনকে ঠোঁটে করে তার জলে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারি।

আর্য, পৃথিবীর প্রথম কল্প থেকে আজ পর্যন্ত কখনও কোনো বক মাছদের কথা ভাবেনি। বলুন দেখি, আপনি আমাদের এক একজনকে খাবার ইচ্ছে ফেঁদেছেন কি না?

না, না, তোমরা যদি আমায় বিশ্বাস কর, তাহলে তোমাদের কখনও খাব না। আমি যে সরোবরের কথা বললাম, সেই সরোবর আছে কি না তা যদি তোমাদের দেখার ইচ্ছে হয়, আমাকে সন্দেহ হয়, তবে তোমাদের মধ্যে একজনকে আমার সঙ্গে দাও, সে নিজের চোখেই দেখে আসুক।

মাছেরা বকের কথামতো এক বিরাট কানা মাছকে এনে বলল, এই মাছকে নিয়ে যান। তারা ভাবল, বক জলে কিংবা ডাঙায় কোথাও এই কানা মাছের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

বক কানা মাছকে নিয়ে গিয়ে সেই সরোবরের জলে ছেড়ে দিল। তারপরে তাকে আবার সেই আগের পুকুরে ফিরিয়ে আনল। কানা মাছ সেই সরোবরের গভীর জল ও শোভার কথা সবাইকে বলল। তা শুনে সব মাছই সেখানে যাবার জন্য আগ্রহ দেখাল ও বককে বলল, আর্য, আপনি খুব সুন্দর উপায় বের করেছেন। আমাদের সেই বিশাল সরোবরে নিয়ে চলুন।

তখন বক প্রথমেই সেই কানা মাছকে নিয়ে চলল। তাকে সরোবরের তীরে নামিয়ে প্রথম জল দেখাল, তারপর তাকে নিয়ে বরুণ গাছের ডালে বসল আর ঠোঁট দিয়ে মেরে ফেলল। তার মাংস খেয়ে কাঁটাগুলো গাছের নীচে ফেলে দিল।

তারপর আবার সেই পুকুরে এসে বলল, তাকে জলে ছেড়ে দিয়ে এলাম। এখন তোমরা আর কে কে যাবে চলো।

এইভাবে বক এক একটি মাছ নিয়ে যেতে লাগল। শেষে পুকুরের সব মাছ প্রায় শেষ হয়ে এল। শেষে থাকার মধ্যে থাকল একটা কাঁকড়া। বক তাকেও খেয়ে ফেলতে চাইল। বলল, আমি পুকুরের সব মাছ নিয়ে গিয়ে সরোবরে রেখে এলাম। চলো, এবার তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাই।

কাঁকড়া জিজ্ঞেস করল, আমাকে কীভাবে নিয়ে যাবে?

কেন, ঠোঁটের ফাঁকে ধরে নিয়ে যাব।

না তা হতে পারে না। তুমি হয়তো আমায় পথে ফেলে দেবে, তাহলে আমার হাড়গোড় ভেঙে যাবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

ভয় নেই, আমি তোমাকে বেশ শক্ত করে ধরব।

কাঁকড়া ভাবল, চালাক বক হয়তো মাছেদের জলে ছেড়ে দেয়নি। দেখা যাক, আমাকে নিয়ে কী করে! যদি আমাকে সত্যি সত্যিই জলে ছেড়ে দেয়, তাহলে খুব ভালো। আর যদি তা না করে, নাই করুক, আমি ওর গলা কেটে ফেলব।

এই কথা ভেবে সে বককে বলল, দেখ মামা, তুমি আমাকে বেশ শক্ত করে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমরা হলাম কাঁকড়া, আমরা খুব শক্ত করে ধরতে পারি। আমায় যদি দাঁড়া দিয়ে তোমার গলা ধরতে দাও, তাহলে আমি নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

কাঁকড়ার ফন্দি বুঝতে না পেরে বক রাজি হয়ে গেল। তখন কামার যেমন সাঁড়াশি দিয়ে ধরে, কাঁকড়াও নিজের দাঁড়া দিয়ে বকের গলা শক্ত করে ধরে বলল, এখন আমরা রওনা হতে পারি।

বক প্রথমে তাকে সরোবরের জল দেখাল, তারপর তাকে নিয়ে সেই গাছের দিকে উড়ে চলল।

কাঁকড়া বলল, একি মামা, সরোবর রইল ওই দিকে, আর তুমি আমায় নিয়ে চললে উলটো দিকে?

বক বলল, ব্যাটা কী সাধের মামা পেয়েছে রে! ব্যাটা যেন আমার প্রাণের ভাগ্নে! আমি কি তোর বাপের কালের ক্রীতদাস যে তোকে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াব? বরুণগাছের তলায় একরাশ কাঁটা দেখতে পাচ্ছিস না? মাছগুলোকে যেমন খেয়েছি, তোকেও খাব তেমনি করে।

এই কথা শুনে কাঁকড়া বলল, মাছগুলো বোকা, তাই তোমার পেটে গিয়েছে। আমায় কিন্তু কিছুতেই খেতে পারবে না। আমাকে খাওয়া তো দূরের কথা আজ তুমি নিজেই মরবে। বোকা কোথাকার, আমি যে তোমায় ঠকিয়েছি, তা তো তুমি বুঝতে পারনি। যদি মরতে হয় দুজনেই মরব। আমি তোমার গলা কেটে মাটিতে ফেলে দেব।

এই কথা বলে সে সাঁড়াশির মতো দাঁড়া দিয়ে বকের গলা চেপে ধরল। বক ব্যথায় কাতরে উঠল, তার চোখদুটি থেকে জল গড়াতে লাগল।

সে প্রাণের ভয়ে বলল, প্রভু, আমি আপনাকে খাব না, দয়া করে প্রাণে মারবেন না।

কাঁকড়া বলল, বেশ কথা, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে সরোবরের তীরে চলো। আমাকে জলে ছেড়ে দাও।

তখন বক সরোবরের দিকে গেল আর কাঁকড়াকে জলের ধারে কাদায় ছেড়ে দিল। কিন্তু কাঁকড়া জলে যাবার আগে, লোক যেমন কাটারি দিয়ে পদ্মের নল কাটে, সেইভাবে খুব সহজেই দাঁড়া দিয়ে বকের গলা কেটে ফেলল।

পশুকথাটি এখানেই শেষ। কিন্তু সংকলকের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র গল্প বলা নয়। তাই তিনি আরও কিছুটা যোগ করলেন। এই বাড়তি অংশ না দিলে বোধিসত্ত্বের বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। জাতককার লিখছেন, বরুণ গাছের অধিদেবতা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে সাধু! সাধু! বলে উঠলেন এবং মধুরস্বরে নীচের গাথাটি বললেন,

প্রবঞ্চনা পরায়ণ সতত যে জন,
অবিচ্ছিন্ন সুখ তার না হয় কখন।
তার সাক্ষী দেখ, এই বক প্রবঞ্চক,
কর্কট দংশনে মরি লভিল নরক।

বক-জাতকের শেষে রয়েছে সমবধান: তখন জেতবনের চীবর-বর্ধক ছিল সেই বক, গ্রাম্যচীবর-বর্ধক ছিল সেই কাঁকড়া এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

লৌকিক ঐতিহ্যের পশুকথা ও এই বক-জাতকের রূপ-রীতি নিয়ে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হবে। বক ও কাঁকড়ার মূল কাহিনিটি লৌকিক পশুকথা তা এর মোটিফ ও মেজাজ থেকেই উপলব্ধি করা যাবে। কিন্তু পশুকথায় যে সারল্য ও গতি থাকে এখানে তা ব্যাহত হয়েছে। সংকলক তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই পশুকথাটিকে বেছেছেন। সাধারণভাবে পশুকথাটির মর্মার্থ হল, যেমন কর্ম তেমনি ফল, কিংবা পাপের পরিণতি। কিন্তু এখানে প্রবঞ্চনার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। ভিক্ষুদের উপদেশ দিতে হবে— কাউকে প্রবঞ্চনা করবে না, এ কাজ অধর্মীয়, উপদেশকে মনে গেঁথে রাখবার জন্যই উদাহরণের অবতারণা। তাই চীবর-বর্ধকের প্রবঞ্চনার নীতিহীন কাজটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বক-জাতক

বলা হল। স্বাভাবিকভাবেই বকের প্রবঞ্চনার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। লোকসমাজ যে নীতিকথা এই কাহিনির মধ্যে বলতে চেয়েছেন, জাতককার অন্য নীতিকথা আবিষ্কার করেছেন।

বোধিসত্ত্ব, আর্য, পৃথিবীর প্রথম কল্প, সাধু-সাধু প্রভৃতি শব্দ লোকসমাজ কখনও ব্যবহার করেন না। কিন্তু লোকসমাজের গল্পটি জাতককারের হাতে পরিশীলিত হল। এর ফলে কাহিনির গতিময়তা ও স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হলেও জাতকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। ধর্মগুরু বোধিসত্ত্ব যখন এই ঘটনার সাক্ষী, তখন এটি বিশ্বাসযোগ্য এবং পালনীয়। তাই বোধিসত্ত্বের কোনো ভূমিকা না থাকলেও তাকে বৃক্ষদেবতারূপে দ্রষ্টার ভূমিকায় রাখা হল। গাথা অংশটিতেও প্রবঞ্চনার বিষয়টি মুখ্য হয়েছে। আবার পঞ্চতন্ত্রে যে শ্লোক বলা হয় তার উদ্দেশ্য অন্যরকম। এইভাবেই উচ্চতর সমাজের সংকলকেরা লৌকিক ঐতিহ্যের কিছুটা রূপান্তর ঘটিয়ে লোককথা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকেন।

সংকলক কীভাবে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দুটি পশুকথাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বানরেন্দ্র-জাতক। এই ধরনের অনেক লোককথা আমরা ভারতীয় উপ-মহাদেশে দেখতে পাই। এই কাহিনির প্রথমাংশে রয়েছে একটি পশুকথা, তার সঙ্গে শেষাংশে আর একটি পশুকথা যুক্ত হয়ে গিয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে আমরা এই আলাদা দুটি পশুকথাই পাচ্ছি, অবশ্য দু-একটি পাত্র-পাত্রী অন্য পশু। যেহেতু বানরের বিচক্ষণতা দেখানোই এই গল্পের উদ্দেশ্য, তাই বোধিসত্ত্ব সেই জন্মে বানর হয়ে জন্মেছিলেন। দুটি আলাদা পশুকথা হলেও সংকলক অপূর্ব নৈপুণ্যে তাদের এক মালায় গেঁথেছেন। এই কাহিনিতে কোন কোন অংশ সংকলকের নিজের কল্পনার সৃষ্টি তা খুব সহজেই বোঝা যায়।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বানররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পূর্ণবয়সে তিনি অশ্বশাবক- প্রমাণ ও অসাধারণ বলবান হয়েছিলেন। তিনি একচর হয়ে কোনো নদীর তীরে বাস করতেন। ওই নদীর মধ্যে এক দ্বীপ ছিল। সেই দ্বীপে ফলমূলের অনেক গাছ। বোধিসত্ত্ব যে পারে থাকতেন সেখান থেকে দ্বীপ পর্যন্ত ঠিক অর্ধেক পথে নদীর মধ্যে একটা পাহাড় ছিল। হাতির মতো বলবান বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন নদীর ধার থেকে এক লাফে সেই পাহাড়ের ওপরে যেতেন, আবার সেখান থেকে আর

এক লাফে দ্বীপে গিয়ে পড়তেন। সেখানে তিনি নানা ধরনের ফল খেয়ে সন্ধ্যার সময় ঠিক ওইভাবে নদী পার হয়ে নিজের বাসায় ফিরতেন।

ওই নদীতে এক কুমির তার বউকে নিয়ে বাস করত। বোধিসত্ত্বকে প্রতিদিন এপার-ওপার হতে দেখে বউয়ের সাধ হল সে বানরের কলিজা খাবে। বউ তখন ছিল গর্ভবতী। সে কুমিরকে বলল, আর্যপুত্র, আমার সাধের জন্য এই বানরের কলিজা এনে দিন।

কুমির বলল, আচ্ছা, তোমার সাধ মেটাব। এই বানর আজ সন্ধ্যায় যখন ফিরবে তখনই ওকে ধরব। এই কথা ভেবে সে পাথরের ওপরে গেল।

বোধিসত্ত্ব নাকি প্রতিদিন নদীর জল কতটা উঠত আর পাহাড়টা কতটা জেগে থাকত, তা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতেন। আজ সমস্ত দিন দ্বীপে ফলমূল খেয়ে সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। নদীর জল বাড়েওনি, কমেওনি, তবু পাহাড়ের ওপরটা উঁচু মনে হচ্ছে। তার সন্দেহ হল, হয়তো তাকে ধববার জন্য কুমির ওখানে লুকিয়ে রয়েছে।

তখন ব্যাপারটা কী জানবার জন্য পাথরের সঙ্গে কথা বলছেন এমন ভাব করে 'ওহে পাহাড়, ওহে পাহাড়' বলে চিৎকার করে ডাকলেন।

পাহাড়ের কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি আবার বললেন, কীহে ভাই পাহাড়, আজ কোনো উত্তর দিচ্ছ না কেন?

কুমির ভাবল, তাই তো, এই পাহাড় প্রতিদিন বানরের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আজ তবে আমিই পাহাড়ের পরিবর্তে সাড়া দি। সে বলল, কে? বানরেন্দ্র নাকি?

বোধিসত্ত্ব বললেন, তুমি কে গো?

কুমির বলল, আমি কুমির।

ওখানে বসে আছ কেন?

তোমাকে ধরব আর তোমার কলিজা খাব।

বোধিসত্ত্ব দেখলেন দ্বীপ থেকে ফেরার অন্য কোনো পথ নেই। তাই কুমিরকে ঠকাতে হবে। তিনি বললেন, কুমির ভাই, আমি তোমায় ধরা দিচ্ছি। তুমি হাঁ করো, আমি যেমন লাফিয়ে পড়ব, অমনি তুমি আমায় ধরে ফেলবে।

কুমিররা যখন মুখ হাঁ করে তখন তাদের চোখদুটো বন্ধ হয়ে যায়। বোধিসত্ত্ব যে প্রবঞ্চনা করছেন, কুমিরের মনে কিন্তু সে সন্দেহ হয়নি। কাজেই সে তার মুখ হাঁ করল, তার চোখদুটি বন্ধ হয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব তা

দেখে একলাফে তার মাথার ওপরে গেলেন আর একলাফে বিদ্যুতের বেগে নদীতীরে পৌঁছে গেলেন। কুমির এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে বলল, বানরেন্দ্র, চারটি গুণ থাকলে সব শত্রুকে দমন করতে পারা যায়। তোমার দেখছি ওই চারটি গুণই রয়েছে।

সত্য, ধৃতি, ত্যাগ, বিচারক্ষমতা— এই চারিগুণে সবে,
বিষময় সংকটে পায় পরিত্রাণ, রিপুগণ পরাভাবে।

লৌকিক পশুকথাটির রূপান্তর ঘটে গেল। লোকসমাজের গল্পে যে বোকা সে শেষ পর্যন্ত চরম বোকামির পরিচয় দেয়। কুমিরও তাই দিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তার মুখ দিয়ে যে জ্ঞানের কথা প্রকাশ করানো হল তা কোনোভাবেই পশুকথার মোটিফের সঙ্গে মেলে না। এটা সম্পূর্ণ আরোপিত বলেই কাহিনির মেজাজ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পৃথিবীর কোনো লোককথায় এই ধরনের পরিণতি ঘটতে দেখা যায় না। সংকলক লৌকিক ঐতিহ্যকে গ্রহণ করলেন কিন্তু নিজের ভাবনাকে রূপ দিতে গিয়ে কাহিনিতে যে হাস্যকর রূপান্তর ঘটালেন তা অনুভব করেননি। যে কুমির একটু আগে এমন ধরনের বোকামির পরিচয় দিল, পাহাড়ের পরিবর্তে কথা বলল, বানর নিজের খাদ্য হবে একথা বিশ্বাস করল— সে কখনও চারটি গুণের কথা বলার মতো জ্ঞানের উপদেশ দিতে পারে না।

জাতককার বলতে চেয়েছেন, দেবদত্ত শাস্তাকে বধ করতে চেয়েছিল। শুধু এ জন্মে নয়, অতীত জন্মেও দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি। সেই অতীত জন্মে দেবদত্ত ছিল এই কুমির। ধর্মীয় উপদেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে নেই, একথাই ভক্তজনকে শেখানো হয়। ভক্ত মানুষের মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথও খোলা নেই। কিন্তু পশুকথাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বোধিসত্ত্বের বিচারক্ষমতার গুণটি দেখতে পাই। ধৃতির পরিচয়ও না হয় অল্প পেলাম। কিন্তু সত্য ও ত্যাগের গুণটি কীভাবে বানরের কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হল? বানর তো ত্যাগ করেইনি, বরং মিথ্যাচরণ করেছে। জীবনের তাগিদে তাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে, পাহাড়কে সম্বোধন জানাতে হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক ব্যবহারনীতি। লোককথায় এই স্বাভাবিকতাই ছিল। কুমিরের বোকামি দেখানো ও কৌশলে বানরের বেঁচে যাওয়া— এই ছিল গল্পের উদ্দেশ্য। একটি বিশেষ ধর্মীয় দর্শন প্রচার করতে গিয়ে পশুকথাটির সজীবতা ও

প্রাণময়তা খর্বিত হল। অথচ পঞ্চতন্ত্রে এই পশুকথাটি অনন্য সজীব। কেননা, সেখানে লোককথার মর্মকথাই বলতে চাওয়া হয়েছে।

কুমির ও বানরের এই কাহিনির অন্য একটি রূপ জাতকে রয়েছে। সেই পশুকথাটি অনেকাংশে লৌকিক ঐতিহ্যের কাছাকাছি। লোকসমাজের পশুকথাটি প্রায় সরাসরি জাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই একই পশুকথা পঞ্চতন্ত্র, চরিয় পিটক, মহাবস্তু, ঈশপের নীতিকথা ও প্লেটোর বইতে রয়েছে। সকলেই লোকঐতিহ্য থেকে কাহিনিটি সংগ্রহ করেছেন, তবে পাত্র-পাত্রী কিছুটা বদলেছে। জাতকের কাহিনির নাম শিশুমার-জাতক। শিশুমার সাধারণত শুশুক, কিন্তু এখানে মনে হয় কুমির অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা শেষাংশে কুমিরের উল্লেখ রয়েছে। দেবদত্ত যে শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করেছিল, এখানে সেই একই প্রসঙ্গে কাহিনিটি বলা হয়েছে। কাহিনির শেষে জ্ঞানের কথা গাথায় প্রকাশ করেছে কুমির নয়, স্বয়ং বানররূপী বোধিসত্ত্ব। তাই এই পশুকথাটি অনেক বেশি স্বাভাবিক ও লৌকিক।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কপিযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বিশাল দেহে ছিল হাতির বল, তিনি ছিলেন যেমন পৌরুষবান তেমনি সৌভাগ্যশালী। তিনি গঙ্গার নিবর্তন-স্থানে এক বনের মধ্যে বাস করতেন। ওই সময়ে গঙ্গায় এক শুশুক ছিল। তার বউ বোধিসত্ত্বের দেহ দেখে তার হৃদয়ের মাংস খেতে চাইল।

একদিন শুশুককে বলল, আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ওই বানরের হৃদয়ের মাংস খাই।

শুশুক বলল, বউ, আমি থাকি জলে আর বানর থাকে ডাঙায়, আমি তাকে কেমন করে ধরব বল তো?

বউ বলল, যেমন করে পার ওকে ধর। হৃদয়ের মাংস না খেলে আমি মরেই যাব।

শুশুক বলল, ঠিক আছে, কোনো চিন্তা নেই। একটা উপায়ে আমি তোমাকে ওর হৃদয়ের মাংস খাওয়াতে পারব।

বউকে একথা বলে শুশুক গঙ্গাতীরে বোধিসত্ত্বের কাছে গেল। তিনি তখন গঙ্গাজল খাওয়ার জন্য সেখানে এসেছিলেন।

শুশুক বলল, বানররাজ, চিরকাল এই এক জায়গায় থেকে বিস্বাদ ফল খেয়ে খেয়ে শুধ্ শুধু কষ্ট পান কেন? গঙ্গার ওই পারে আম, জাম, বন-কাঁঠাল

কত কী মধুর ফল পেকে রয়েছে। সেখানে গিয়ে ওই সমস্ত ফল খেতে পেলে আপনারও ভালো লাগবে।

বানর বলল, কুমিররাজ, গঙ্গা কত চওড়া, এর জলও অগাধ। আমি ওই গঙ্গা পার হব কেমন করে?

যদি খেতে ইচ্ছে করেন, তবে আমি আপনাকে আমার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

বোধিসত্ত্ব এই কথা বিশ্বাস করলেন, বেশ, চলুন তবে, যাওয়া যাক।

কুমির বলল, আসুন, আমার পিঠে উঠে বসুন।

তখন বোধিসত্ত্ব কুমিরের পিঠে চেপে বসলেন। কুমির কিছুদূর গিয়ে জলে ডুব দিল। বোধিসত্ত্ব বললেন, সৌম্য, আমাকে জলে ডোবাচ্ছ কেন? এ তোমার কেমন কাজ?

কুমির বলল, তুমি ভেবেছ আমি তোমাকে ভালোবেসে তোমার ভালো করবার জন্য তোমায় পিঠে নিয়ে চলেছি। তা মোটেই নয়। আমার বউয়ের সাধ হয়েছে, সে তোমার হৃদয়ের মাংস খাবে। তাকে সেই মাংস খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছি।

সৌম্য, কথাটা খুলে বলে ভালোই করেছ। আমাদের বুকের মধ্যে যদি হৃদয় থাকত, তাহলে ডালে ডালে লাফালাফি করবার সময় তা টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

তবে তোমার হৃদয়টা রাখ কোথায়?

অল্প দূরেই পাকা ডুমুর ফলে ভরা একটা ডুমুর গাছ ছিল। বোধিসত্ত্ব সেই দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, ওই দেখ, আমাদের হৃদয়গুলো ওই ডুমুর গাছে ঝুলছে।

কুমির বলল, দেখ বানরেন্দ্র, তুমি যদি আমায় তোমার হৃদয়টা দাও, তাহলে আমি তোমায় মারব না।

তবে আমায় ওখানে নিয়ে চলো। গাছে আমার যে হৃদয়টা ঝুলছে, তা আমি তোমায় দিয়ে দেব।

তখন কুমির বোধিসত্ত্বকে নিয়ে সেই গাছের কাছে গেল। বোধিসত্ত্ব কুমিরের পিঠ থেকে এক লাফে গাছে চড়ে বসলেন। গাছের ডালে বসে তিনি বললেন, বোকা শুশুক, তুমি বিশ্বাস করলে যে প্রাণীদের হৃদয় গাছের ডগায় ঝুলে থাকে! তুমি নিতান্তই বোকা। আমি যে তোমায় ঠকিয়েছি, এখন

তা বুঝতে পারলে? তোমার মধুর ফলগুলো তুমিই খাও। তোমার দেহটি বিশাল, কিন্তু একেবারেই বুদ্ধি নেই।

এই ভাব প্রকাশ করে বোধিসত্ত্ব নীচের গাথাটি বললেন:

সাগরের পারে আছে মধুর ফলের বন,
আম-জাম-পনসাদি— নাহি তাহে প্রয়োজন।
উডুম্বর বৃক্ষ এই— এই ভালো মোর কাছে,
যার আশ্রয় লভি আজি মোর প্রাণ বাঁচে।
বিশাল দেহটা তবু বুদ্ধি কিন্তু ক্ষীণ অতি,
ঠকিয়াছ শিশুমার! যথা ইচ্ছা কর গতি।

হাজার মুদ্রা নষ্ট হলে লোক যেমন দুঃখিত ও বিষণ্ণ হয়. শুশুক তেমনি হল। মনে ব্যথা পেয়ে সে নিজের বাসায় ফিরে গেল।

জাতকমালায় 'কচ্ছপ-জাতক' নামে একটি পশুকথা রয়েছে। ভারত, গ্রিস ও আফ্রিকায় এই পশুকথাটি খুবই জনপ্রিয়। জাতককার কীভাবে লৌকিক পশুকথাকে ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে ও নীতিশিক্ষার জন্য ব্যবহার করেছেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল এই জাতকটি। পশুকথাটি যেখানে শেষ হয়েছে, জাতককার সেখান থেকে আর একটি কাহিনি গড়ে তুলেছেন যার উদ্দেশ্য হল পশুকথাটির মর্মার্থকে বিশ্লেষণ করা। কাহিনির শেষাংশে বোধিসত্ত্বের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হল। তবু লোকঐতিহ্যর অপরূপ কাহিনিটি প্রায় অবিকৃতই রয়ে গিয়েছে। অকারণ বাচালতায় যে জীবন-সংশয় ঘটে যেতে পারে লৌকিক পশুকথাটির এই মর্মার্থ জাতকেও রক্ষিত হয়েছে। জাতকে সংকলিত পশুকথাটির প্রথম ও শেষাংশ জাতককারের সংযোজন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে তিনি রাজার ধর্মার্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ওই রাজা খুব বাচাল ছিলেন। তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলে অন্য কেউ কিছু বলবার অবসর পেত না। বোধিসত্ত্ব রাজার বাচালতা-দোষ দূর করবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

ওই সময়ে হিমবন্ত প্রদেশে কোনো এক সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করত। দুটো হাঁস খাবার খুঁজতে সেই সরোবরে যেত। তাদের সঙ্গে কচ্ছপের আলাপ হয়, তারপরে তাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

হাঁসদুটি একদিন কচ্ছপকে বলল, কচ্ছপ, আমরা থাকি হিমবন্ত প্রদেশের চিত্রকূট পাহাড়ের কাঞ্চনগুহায়। সে জায়গা বড় সুন্দর। তুমি কি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাবে?

কচ্ছপ বলল, আমি সেখানে কেমন করে যাব?

তুমি যদি মুখ বন্ধ করে থাকতে পার, কাকেও যদি কিছু না বলো, তাহলে আমরাই তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।

মুখ বন্ধ করে থাকতে পারব না কেন? তোমরা আমাকে নিয়ে চলো।

হাঁসদুটি বলল, বেশ তাই হবে।

তখন হাঁসেরা একটা লাঠি এনে কচ্ছপকে তার মাঝখানে শক্ত করে কামড়ে ধরে থাকতে বলল। লাঠির দুপাশে হাঁসদুটি তাদের ঠোঁট দিয়ে ধরল আর আকাশে উড়ল। হাঁসেরা কচ্ছপকে লাঠিতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে গ্রামের ছেলেরা বলতে লাগল, দেখ, দেখ, দুটো হাঁস লাঠি দিয়ে একটা কচ্ছপকে নিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামের ছেলেদের কথা শুনে কচ্ছপের বলতে ইচ্ছে করল, দুষ্টু ছেলেরা কোথাকার! আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তোদের কী রে?

তার মনে যখন এই ভাব এল, তখন প্রচণ্ড বেগে হাঁসেরা আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে। উড়তে উড়তে তারা বারাণসীর রাজার বাড়ির ওপর এসে পৌঁছল। কচ্ছপ যেমন কথা বলার চেষ্টা করল, অমনি লাঠি থেকে মুখ ফসকে গেল আর রাজপ্রাসাদের উঠোনের ওপর আছড়ে পড়ল। কচ্ছপ সেই প্রচণ্ড আঘাতে মরে গেল।

পশুকথাটি এখানেই শেষ। জাতকের এই কাহিনিতে হিমবন্ত প্রদেশ, বারাণসী রাজ, চিত্রকূট পর্বত প্রভৃতির উল্লেখ থাকলেও মূল কাহিনিটি অবিকৃতই রয়েছে। এর পর বারাণসীরাজকে শিক্ষা দেবার জন্যই জাতককার নতুন সংযোজন ঘটালেন।

রাজভবনে মহা কোলাহল হল। সকলেই চিৎকার করতে লাগল, উঠোনে একটা কচ্ছপ পড়ে দু-টুকরো হয়ে গিয়েছে।

এই কথা শুনে রাজা বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে করে নিয়ে উঠোনে গিয়ে কচ্ছপটিকে দেখলেন। বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করলেন, পণ্ডিতবর, এই কচ্ছপটা পড়ে গেল কেমন করে?

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, রাজাকে উপদেশ দেবার জন্য এতদিন অপেক্ষা করে রয়েছি। এখন দেখছি, উপযুক্ত সুযোগ এসেছে। এই কচ্ছপের সঙ্গে হাঁসদের বন্ধুত্ব হয়েছিল সন্দেহ নেই। তারা একে হিমবন্ত প্রদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য লাঠি কামড়ে ধরতে বলেছিল আর সম্ভবত সেই অবস্থায় একে নিয়ে আকাশে উড়েছিল। তারপর কিছু বলবার ইচ্ছায় কচ্ছপ মুখ খুলেছিল, কথা বলতে গিয়ে লাঠি থেকে মুখ ফসকে আকাশ থেকে পড়ে যায়। তার কচ্ছপ-লীলা এইভাবে সাঙ্গ হয়।

এই কথা চিন্তা করে তিনি রাজাকে বললেন, মহারাজ, যারা অতি মুখর, যারা জিভকে সংযত করতে জানে না, তাদের এই রকম দুর্দশাই ঘটে থাকে।

তখন বোধিসত্ত্ব এই গাথা বললেন:

নির্বোধ কচ্ছপ কথা বলিতে চাহিয়া
নিজেই নিজের মৃত্যু আনিল ডাকিয়া।
কাষ্ঠদণ্ড দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আকাশে যাবে
করেছিল এই আশা অন্তরে পোষণ,
কিন্তু নিজ বাক্যে তার ঘটিল মরণ।
দেখি এ দৃষ্টান্ত, ওহে নৃবীরপুঙ্গব,
মিত-সত্যবাদী হতে শিখুক মানব।
সময় না বুঝে যেই কথা বলে, মূর্খ সেই,
বাচাল তাহারে বলি নিন্দে সর্বজন,
বাচালতা-দোষে ত্যজে কচ্ছপ জীবন।

রাজা বুঝলেন বোধিসত্ত্ব তাকে লক্ষ্য করেই একথা বলছেন। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন, পণ্ডিতবর, আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করে একথা বলছেন?

বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, মহারাজ, আপনিই হোন বা অন্য কেউ হোন, অপরিমিতভাষীদের এই রকমের দুর্গতিই ঘটে থাকে।

বোধিসত্ত্ব এইভাবে সমস্ত কথা খুলে বললে রাজা তখন থেকে জিভকে সংযত করে মিতভাষী হলেন।

ভারতীয় উপ-মহাদেশে এই পশুকথাটির যতগুলো রূপ সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায়, কচ্ছপ আকাশ থেকে নীচে পড়ে মারা যায়। কিন্তু আফ্রিকার জাম্বিয়া দেশের থোংগা, নাইজেরিয়ার ইকোই, অ্যাংগোলার

আম্‌বুনডু প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর পশুকথায় অন্য তাৎপর্য ফুটে উঠেছে। 'কচ্ছপের পিঠে ফাটা ফাটা দাগ কেন'—এই প্রশ্নের উত্তর তারা খুঁজেছে এই পশুকথার মধ্যে দিয়ে। প্রচণ্ড বেগে কচ্ছপ আকাশ থেকে পড়ল, পিঠটা গিয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে, পিঠের খোল গেল চৌচির হয়ে ফেটে। সেদিন থেকেই কচ্ছপের পিঠে ওইরকম ফাটা ফাটা দাগ। এদের গল্পেও কচ্ছপ মারা গিয়েছে। বাচালতার জন্য তার মৃত্যু হলেও একটি 'কেন'র জবাব দিতেই আফ্রিকার আদিবাসীরা এই পশুকথার সৃষ্টি করেছেন।

জাতকমালার মধ্যে আমরা লৌকিক পশুকথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই এইসব জাতকে: শৃগাল-জাতক শূকর-জাতক কচ্ছপ-জাতক (অন্য একটি কাহিনি)। সিংহ-ক্রোষ্টুক-জাতক সিংহচর্ম-জাতক কুমির-জাতক শুক-জাতক উলূক-জাতক ব্যাঘ্র-জাতক জম্বু-খাদক-জাতক শকুন-জাতক তিতির-জাতক কপোত-জাতক মৎস্য-জাতক মিতচিন্তি-জাতক কাক-জাতক চক্রবাক-জাতক অন্ত-জাতক উডুম্বর-জাতক নৃত্য-জাতক সম্বোদমান-জাতক বিড়াল-জাতক অগ্নিক-জাতক সুবর্ণহংস-জাতক মুণিক-জাতক জবশকুন-জাতক শশ-জাতক কুটীদূষক-জাতক কোকালিক-জাতক জম্বুক-জাতক মৃগালোপ-জাতক কুক্কুট-জাতক সুবর্ণকর্কট-জাতক মহাকপি-জাতক দ্বিপি-জাতক কালবাহু-জাতক দর্ভপুষ্প-জাতক মহাশুক-জাতক কৌশিক-জাতক ইত্যাদি।

লৌকিক পশুকথা কত ব্যাপকভাবে জাতকের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তা এই তালিকা থেকে উপলব্ধি করা যাবে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। জাতককারের সংযোজন বাদ দিয়ে শুধুমাত্র লোকসমাজের সৃষ্টি পশুকথা বিবৃত করছি। সবগুলি পশুকথাই অতিপরিচিত।

জম্বুখাদক-জাতক। এক জামগাছে বসে একটা কাক জাম খাচ্ছিল। এমন সময় সেই গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল এক শেয়াল। মিষ্টি জাম খেতে তারও খুব ইচ্ছে হল। ওপরে তাকিয়ে সে কাককে দেখতে পেল। শেয়াল ভাবল, আমি যদি এই কাকের প্রশংসা করি তাহলে পাকা জাম খেতে পারব।

শেয়াল বলল, কে তুমি গাছের ডালে জাম খাচ্ছ? তোমাকে দেখছি ময়ূরের মতো সুন্দর দেখতে। যেমন সুন্দর তোমার দেহ, তেমনি মিষ্টি তোমার ডাক। কত পাখি তো জীবনে দেখলাম, কিন্তু তোমার রূপের কাছে সবাই হেরে যাবে।

এই প্রশংসা শুনে কাক বলল, ভালো বংশে যে জন্মেছে, সেই-ই কেবল ভালো বংশের লোকদের প্রশংসা করতে জানে। তুমি সুন্দর, বাঘের মতো রূপ তোমার। এসো বন্ধু, পেট ভরে জাম খাও। আমি ওপর থেকে পাকা জাম ফেলছি, তুমি নীচে বসে প্রাণভরে খাও।

এই কথা বলে কাক ডাল ঝাঁকাতে লাগল, পাকা সুমিষ্ট জাম নীচে পড়তে লাগল। দুজনেই দুজনের মিথ্যে প্রশংসা করছে আর জাম খাচ্ছে।

ঈশপের নীতিকথায় এই একই পশুকথা পাওয়া যায়। জাতকে এই একই ধরনের আর একটি পশুকথা রয়েছে।

অন্ত-জাতক। কোনো এক সময় এক গ্রামে এক বুড়ো গোরু ছিল। একদিন সে মরে গেল। গাঁয়ের লোকেরা গোরুটাকে টেনে এনে ভেরেন্ডা বনে ফেলে দিয়ে চলে গেল। এমন সময় সেখানে এল এক শেয়াল। মহা আনন্দে সে গোরুর মাংস খেতে লাগল। সেইসময় একটা কাক উড়ে এসে ভেরেন্ডা গাছে বসল। সে ভাবল, আমি যদি মিথ্যা এই শেয়ালের প্রশংসা করি, তবে নিশ্চয়ই গোরুর মাংস খেতে পাব।

এই কথা ভেবে কাক বলল, তোমার দেখছি সিংহের মতো বিক্রম, তুমি নিশ্চয়ই পশুরাজ। তোমার প্রসাদ পাবার জন্য আমি এসেছি, আমি তোমার দাস। সামান্য মাংস দিয়ে তুমি কি আমার আশা পূর্ণ করবে?

তখন শেয়াল প্রশংসায় গলে গিয়ে বলল, ভালো বংশে যে জন্মেছে, সেই কেবল ভালো বংশের লোকদের প্রশংসা করতে জানে। ময়ূরের মতো গলা তোমার কাক, যত ইচ্ছে তুমি মাংস খাও।

কাক শেয়ালের সঙ্গে মনের সুখে সেই মরা গোরুর মাংস খেতে লাগল। উড়ুম্বর-জাতক। এক পাহাড়ি গুহায় থাকত এক লালমুখো বানর। যতই বৃষ্টি হোক না কেন সেই গুহায় কিন্তু বৃষ্টি ঢুকত না। একবার সাত রাত সাত দিন ধরে খালি বৃষ্টি হতে লাগল। সেইসব বৃষ্টি-ভেজা দিনে বানর গুহাতেই নিশ্চিন্তে বসে রইল। খুব খিদে পেয়েছে, কিন্তু বাইরে যেতে মন চাইছে না, গাছেও ফল নেই।

এমন সময় জলে চুপচুপে ভিজে সেখানে এল এক কালোমুখো বানর। লালমুখোকে গুহার মধ্যে সুখে থাকতে দেখে কালোমুখো ভাবল, কোনো উপায়ে একে যদি গুহা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি, তবে বৃষ্টিতে আর কষ্ট পেতে হবে না।

এই ভেবে কালোমুখো তার পেটটা খুব ফুলিয়ে নিল। তাকে দেখে মনে হল, সে বুঝি অনেক কিছু খেয়েছে, তাই পেটটা এত ফুলে রয়েছে। এবার সে গুহার মুখে এসে বলল, বট-কদ্‌বেল-ডুমুর ফল যে কত পেকে রয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আর তুমি কিনা খিদের জ্বালায় মরছ? এত বোকা তুমি? চলো ভাই, আমার সঙ্গে চলো। দুহাতে ফল ছিঁড়বে আর খাবে। কত খাবে? পেট পুরে ফল খাবে চলো।

লালমুখোর এমনিতেই খুব খিদে পেয়েছে। কালোমুখোর পেটের দিকে তাকিয়ে তার লোভ আরও বেড়ে গেল। সে বৃষ্টির মধ্যেই গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল। অনেক ঘোরাঘুরি করল, কিন্তু কোনো গাছেই ফল পেল না। কোথাও কিছু না পেয়ে সে আবার তার গুহায় ফিরে এল। এসে দেখল, কালোমুখো বানর গুহার ভেতরে বসে রয়েছে। তখন লালমুখো কালোমুখোকে ঠকাবার জন্য বলল, গাছ-পাকা ফল খেয়ে আজ যা সুখ পেলাম, তা আর তোমাকে কী বলব ভাই। এমনটি কখনও খাইনি।

এই কথা শুনে কালোমুখো বানর বলল, বানরই পারে বানরকে ঠকাতে। কিন্তু তুমি তো সেদিনের ছেলে, ঠকাবে আমাকে? আমি হলাম পুরনো ঘুঘু, তোমার কথায় ভুলব আমি? আমি তো জানি, এখন কোনো বনের কোনো গাছেই ফল নেই। তুমি আমায় কি ঠকাবে? এখন বিরক্ত কর না, যেখানে খুশি সেখানে চলে যাও। এখানে ঠাই হবে না।

তখন লালমুখো বানর কালো মুখ করে মনের দুঃখে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সেখান থেকে চলে গেল।

উলূক-জাতক। অনেক কাল আগে পাখিরা ভাবল, সবারই রাজা আছে, শুধু রাজা নেই আমাদের। আমাদেরও একজন রাজা থাকা চাই। এই ভেবে তারা পাখিদের এক সভা ডাকল। সেই সভায় সব পাখি এল। কাকে রাজা করা যায়? অনেক চিন্তা করে তারা প্যাঁচাকে তাদের রাজা করা ঠিক করল। সব ঠিক করে তারা বলল, আমাদের মধ্যে একজন তিনবার প্যাঁচার নাম বলবে। তোমরা সায় দেবে।

সেই সভায় ছিল এক কাক। প্রথম দুবার প্যাঁচার নাম বলাতে সে চুপ করে শুনল। তিনবারের বার নাম ডাকার আগেই কাক বলল, একটু অপেক্ষা কর, রাজা হবার সময়েই প্যাঁচার যদি মুখের চেহারা এমন হয়, তাহলে রাজা হবার পরে ইনি যখন রেগে যাবেন তখন না জানি এই মুখ আরও কত

ভয়ংকর হবে। তখন যে আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়ব তার ঠিক নেই। তাই আমার মতে প্যাঁচাকে রাজা করা ঠিক হচ্ছে না।

'আমার মত নেই, আমার মত নেই'-- একথা বারবার বলতে বলতে কাক আকাশে উড়ে গেল। প্যাঁচাও কাকের পেছনে ধাওয়া করল। সেইদিন থেকে কাক আর প্যাঁচা চিরশত্রু হয়ে গেল।

পঞ্চতন্ত্র ও কথাসরিৎসাগরে এই পশুকথা রয়েছে। ঈশপেও রয়েছে এই কাহিনি, সেখানে ময়ূর ও দাঁড়কাকের চিরশত্রুতা দেখানো হয়েছে।

সিংহচর্ম-জাতক। অনেক কাল আগে এক বণিক ছিল। তার ছিল একটা গাধা। বণিক যেখানে যেত সেখানে বোঝা নামিয়ে গাধাটাকে সিংহের একটা চামড়া পরিয়ে দিত। তারপর তাকে লোকের ধান যবের খেতে ছেড়ে দিত। চাষিরা ভাবত, এটা একটা সিংহ। তাই তার কাছে যেতে সাহস পেত না।

এইরকমভাবে দিন যায়। একদিন সকালে বণিক গাধাকে খেতে ছেড়ে দিয়েছে। গাধা মনের সুখে ফসল খাচ্ছে। চাষিরা ভয় পেয়ে খেত ছেড়ে গাঁয়ে চলে গেল, সেখানে সবাইকে এই খবর দিল। গাঁয়ের লোকেরা লাঠি নিয়ে শাঁখ বাজিয়ে খেতের দিকে ছুটে এল। খেতের কাছে এসে খুব চিৎকার করতে লাগল। গাধা ভয় পেয়ে প্রাণের ভয়ে ডেকে উঠল। তখন তারা বুঝল, এটা সিংহ নয়, সিংহের চামড়া গায়ে এক গাধা। গাঁয়ের লোকেরা লাঠি দিয়ে বেদম মারতে লাগল সেই গাধাকে। তারপর তার দেহ থেকে সিংহের চামড়াটা নিয়ে গাঁয়ে ফিরে গেল।

একটু পরে বণিক এল সেখানে। গাধার দুর্দশা দেখে সে সব বুঝতে পারল। একটু পরেই গাধা মরে গেল। বণিক তাকে ফেলে রেখে চলে গেল।

পঞ্চতন্ত্রে রয়েছে এই পশুকথা। সেখানে গাধার মালিক একজন ধোপা। লোকসমাজে পশুকথাটি খুব জনপ্রিয়। তবে কোথাও রয়েছে বাঘের চামড়ার কথা আবার কোথাও রয়েছে সিংহের চামড়ার কথা।

সুবর্ণহংস-জাতক। অনেক অনেককাল আগে এক হাঁস ছিল। সে আগের জন্মে ছিল এক গৃহস্থ। তার ছিল বউ আর দুই মেয়ে। লোকটি মারা যাবার পরে বউ আর মেয়েদের খুব কষ্টে দিন চলত। পাড়া-পড়শিদের বাড়ি কাজ করে তারা কোনোরকমে বেঁচে ছিল।

একদিন হাঁস চিন্তা করল, আমার আপনজন কী কষ্টেই না দিন কাটাচ্ছে! তারা পরের বাড়ি কাজ করে। আমার পালকগুলো তো খাঁটি সোনার। আমি

ওদের এক-একটা করে পালক দেব, সেটা বিক্রি করে ওরা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

এই কথা ভেবে হাঁস তাদের কুঁড়েঘরে উড়ে গিয়ে ঘরের মাঝখানের খুঁটিতে বসল।

হাঁসকে দেখে তারা জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এলে?

হাঁস বলল, আমি তোমাদের বাবা, মৃত্যুর পরে সোনার হাঁস হয়ে জন্মেছি। তোমাদের দেখতে এসেছি। এখন থেকে তোমাদের আর পরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে হবে না। আমি এখন থেকে তোমাদের এক একটা করে সোনার পালক দেব, তাই বিক্রি করে তোমরা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

এই কথা বলে তাদের একটা সোনার পালক দিয়ে হাঁস আবার উড়ে চলে গেল। তারপর থেকে হাঁস মাঝে-মাঝে তাদের কুঁড়েঘরে উড়ে আসত, একটা করে সোনার পালক দিত, আবার ফিরে যেত। সেই পালক বিক্রি করে বউয়ের অনেক টাকা হল, তাই দিয়ে তারা তিনজনে পরম সুখে বাস করত।

একদিন বউ মেয়েদের বলল, হাঁস একটা সামান্য পাখি, কখন কী মতি-গতি হয় বলা যায় না। তোদের বাবা কখন যে আসা বন্ধ করে দেবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই বলি, এবার যখন হাঁস আসবে, তখন আমরা তার সব পালক ছিঁড়ে রাখব।

কিন্তু বাবার গায়ে খুব ব্যথা লাগবে ভেবে মেয়েরা রাজি হল না। কিন্তু মনে মনে সব ঠিক করে রাখল মা। বাচ্চাদের কথায় কান দিতে নেই।

আবার একদিন হাঁস কুঁড়েঘরে এল। বউ বলল, তুমি আমার কাছে এসে বসো। হাঁস বউয়ের কথায় তার কাছে গেল। হঠাৎ বউ দুই হাতে জাপটে ধরল হাঁসকে। পটাপট তার পালকগুলো দেহ থেকে ছিঁড়ে নিল। পালক পড়ে আছে মেঝেতে, একটাও সোনার পালক নয়, সবই হাঁসের সাধারণ পালকের মতো। বউ তখন হাঁসকে ধরে একটা মাটির জালার মধ্যে রেখে দিল। প্রতিদিন তাকে খেতে দিত। কিছুদিন পরে হাঁসের গায়ে আবার পালক বের হল। কিন্তু কোনো পালকই সোনার নয়, হাঁসের সাদা পালকের মতো। পালক গজালে হাঁস উড়ে বনে চলে গেল, আর কোনোদিন সে কুঁড়েঘরে ফেরেনি।

ঈশপের নীতিকথায় আছে, হাঁস সোনার ডিম দিত। ফরাসি লোককথা সংগ্রাহক লা ফঁতেন-এর পশুকথায় অবশ্য সোনার পালকের কথাই আছে। ওড়িশার পান্‌কা আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও ডিমের উল্লেখ রয়েছে। তবে জাতকের কাহিনিতে হাঁসের পূর্বজন্মের যে কথা রয়েছে অন্য কোথাও তার উল্লেখ নেই।

এইভাবে লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য থেকে অনেক পশুকথা জাতককার গ্রহণ করেছেন। আবার এমন কিছু পশুকথাকে জাতককার প্রয়োজনে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যার মূল রূপটি প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। তবু বিশ্লেষণ করলে অন্তত ইঙ্গিতটি অনুধাবন করা যায়।

জাতকে রূপকথা

জাতকে অনেক রূপকথা আছে। কিছু রূপকথা যে লোকসমাজ থেকে সংগ্রহ করা তা বোঝা যায়। তবে পশুকথাকে যেমন ব্যাপকভাবে নীতি-উপদেশের জন্য ব্যবহার করা যায়, রূপকথাকে অত ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যায় না। কেননা, রূপকথার মধ্যে অন্য রসের প্রাধান্যই বেশি। আনন্দদায়ক গল্পরসটি সেখানে গুরুত্ব পায়। জাতকে যেসব লৌকিক রূপকথা সংযোজিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্যও নীতিশিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় উপদেশ-দান। দশরথ-জাতক রূপকথা আলোচনায় উল্লেখ করছি, কেন কীভাবে অন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কাহিনির সঙ্গে জাতকের কাহিনির এত মিল। পার্থক্য যেখানে রয়েছে, সেখানে মনে হয়, অন্য এলাকার লোকসমাজ থেকে কাহিনিটি সংগৃহীত। একই লোককথার যেমন বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়, তেমনি এইসব গ্রন্থেও বিভিন্ন রূপ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংগ্রাহক যে রূপটির সঙ্গে পরিচিত সেই রূপই গ্রহণ করেছেন।

সঞ্জীব-জাতক। অনেক কাল আগে একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তার ছিল অনেক শিষ্য। তিনি তাদের শিক্ষাদীক্ষার ভার নিয়েছিলেন। সেই শিষ্যদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সঞ্জীব। গুরু তাকে একটা মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। এই মন্ত্রের জোরে মৃত প্রাণীকেও বাঁচিয়ে তোলা যেত। কিন্তু জীবিতকে আবার মৃত করার মন্ত্র সে জানত না।

একদিন সঞ্জীব অন্য কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে বনের পথে চলেছে। বন থেকে কাঠ নিয়ে আসতে হবে। পথে তারা দেখল একটা বাঘ মরে পড়ে রয়েছে। সঞ্জীব বলল, এই মরা বাঘকে আমি বাঁচিয়ে তুলতে পারি।

সঙ্গীরা বলল, তা কখনও হয় নাকি? মৃতদেহ কি কখনও প্রাণ ফিরে পেতে পারে!

তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ না, আমি বাঘকে বাঁচিয়ে তুলছি। অন্যেরা দূর থেকে কী ঘটে তা দেখতে লাগল।

সঞ্জীব মন্ত্র পড়ল, একটা মাটির খাপ্‌রা তুলে নিয়ে বাঘের দেহে আঘাত করল,বাঘ চোখ মেলল, লাফিয়ে উঠল— তারপরে প্রচণ্ড গর্জন করে সঞ্জীবের দিকে ধেয়ে এল। লাফিয়ে তার গলা কামড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীব মারা গেল। বাঘও সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল আর মরে গেল। দুটো মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে রইল।

শিষ্যেরা কাঠ নিয়ে ফিরে এল। সব কথা গুরুকে জানাল। গুরু বললেন, দেখ, সঞ্জীব শয়তানের উপকার করতে গিয়ে, অনুচিত জায়গায় মন্ত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রাণ হারাল। তোমরা কেউ যেন এমন ভুল কর না।

পঞ্চতন্ত্রে ব্রাহ্মণ ও চারপুত্রের যে রূপকথা রয়েছে তার সঙ্গে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। তিন ছেলে শাস্ত্রজ্ঞ, একজন মূর্খ। তিন ছেলে তিন ধরনের মন্ত্র জানত। মৃত সিংহের হাড় একজন একত্রিত করল, অন্যজন তাতে রক্ত-মাংস-চামড়া জুড়ল আর তৃতীয়জন প্রাণ দিল। মূর্খ ছেলে গাছে চড়ে বসে ছিল। তিনজন শাস্ত্রজ্ঞ মারা পড়ল, মূর্খ বেঁচে গেল।

কূটবণিক-জাতক। একজন বণিক ছিল। তার নাম পণ্ডিত। সে অন্য একজন বণিকের সঙ্গে মিলে ব্যাবসা শুরু করল। সেই বণিকের নাম ছিল অতিপণ্ডিত। ব্যাবসা করে তাদের খুব লাভ হল, তারা নিজেদের দেশে ফিরে এল।

লাভের ভাগাভাগির সময় অতিপণ্ডিত বলল, আমি লাভের দুই অংশ নেব, আর তুমি নেবে এক অংশ।

পণ্ডিত বলল, তুমি দুই অংশ পাবে কেন?

অতিপণ্ডিত বলল, তুমি পণ্ডিত, আমি অতিপণ্ডিত। যে পণ্ডিত সে এক ভাগ আর যে অতিপণ্ডিত সে দুই ভাগ পাওয়ার যোগ্য।

পণ্ডিত বলল, সে কী কথা? পণ্যের মূল্য, গাড়ি-বদলের খরচ, সবই তো আমরা সমান সমান দিয়েছি। তবে তুমি কেন লাভের দুই অংশ পাবে?

আমি অতিপণ্ডিত তাই।

এইভাবে কথা কাটাকাটি হতে হতে তাদের মধ্যে রীতিমতো ঝগড়া বেধে গেল। তখন অতিপণ্ডিত ভাবল, আচ্ছা, ঝগড়ার মীমাংসার একটা উপায় মাথায় এসেছে। সে তার বাবাকে এক গাছের কোটরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বলল, আমরা দুজনে এসে যখন জিজ্ঞেস করব, তখন আপনি বলবেন যে, অতিপণ্ডিত দুই অংশ পাবে।

তারপর সে পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলল, ভাই, আমাদের কার কী প্রাপ্য, তা জানেন গাছের দেবতা। চলো, তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।

দুইজনে গেল সেই গাছের তলায়। অতিপণ্ডিত বলল, হে গাছের দেবতা, আপনি আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিন।

তখন তার বাবা গলার স্বর অন্য রকম করে বলল, কী নিয়ে তোমাদের ঝগড়া আগে তাই শুনি।

অতিপণ্ডিত বলল, দেবতা, এই বন্ধু পণ্ডিত, আর আমি অতিপণ্ডিত। আমরা একসঙ্গে ব্যাবসা করেছিলাম। তাতে যে লাভ হয়েছে তার কত অংশ কে পাবে আপনি বিচার করে বলুন।

গাছের কোটর থেকে উত্তর এল, পণ্ডিত পাবে এক ভাগ আর অতিপণ্ডিত পাবে দুই ভাগ।

পণ্ডিত উত্তর শুনে ভাবল, এই গাছে দেবতা আছে কি না তা জানা দরকার। এই ভেবে সে কিছু শুকনো পাতা কুড়িয়ে এনে কোটরের মধ্যে ফেলে দিল। তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। শুকনো পাতায় আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। অতিপণ্ডিতের বাবা আধপোড়া হয়ে গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এল। এর পর পণ্ডিত ও অতিপণ্ডিত লাভের অংশ সমানভাবে ভাগ করে নিল।

পঞ্চতন্ত্রে ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি রূপকথার সঙ্গে জাতকের এই কাহিনির মিল রয়েছে।

চুল্লকশ্রেষ্ঠী-জাতক। অনেক অনেক কাল আগে এক বণিক ছিল। সে ছিল বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। সে চুল্লকশ্রষ্ঠী উপাধি পেয়েছিল। বণিক একদিন রাজার কাছে যাচ্ছিল, পথে সে একটা মরা ইঁদুর দেখতে পেয়ে বলল, যদি কোনো বুদ্ধিমান লোক এই মরা ইঁদুরটা তুলে নিয়ে যায়, তবে সে ব্যাবসা করে খুব ধনী হতে পারবে।

এই সময়ে একজন গরিব মানুষ ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বণিকের কথা শুনে সে ভাবল, দেখি না মরা ইঁদুর নিয়ে ভাগ্য ফেরে কি না। সে মরা ইঁদুরটা তুলে নিল। কাছেই থাকত এক দোকানদার। সে পোষা বেড়ালের জন্য খাবার খুঁজছিল। এক পয়সা দিয়ে সে ইঁদুরটা কিনে নিল।

গরিব মানুষটি সেই এক পয়সা দিয়ে গুড় কিনল। এক কলসি জল নিয়ে পথের ধারে বসে রইল। সেই পথে ফুল কুড়িয়ে মালাকারেরা যেত। ক্লান্ত হয়ে তারা সেখানে বসল, গরিব মানুষটির কাছ থেকে একটু একটু গুড় নিয়ে জল খেল। তেষ্টা মিটিয়ে তারা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু কিছু ফুল দিল। ফুল বিক্রি করে সে যে পয়সা পেল তা দিয়ে আরও বেশি গুড় কিনে ফুলের বাজারে গেল। মালাকারদের গুড় খাওয়াল। মালাকারেরা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কতকগুলো ফুলের গাছ দিল। এইভাবে ফুল ও ফুলগাছ বিক্রি করে অল্পদিনের মধ্যেই তার বেশ কিছু পুঁজি হল।

একদিন খুব বৃষ্টি হল। রাজার বাগানে অনেক শুকনো ও কাঁচা ডালপালা ভেঙে পড়ল। বেচারি মালী ভাবছে, এত আবর্জনা সরাই কেমন করে? এমন সময় সেই গরিব মানুষটি সেখানে এসে বলল, আমার ওপর যদি ছেড়ে দাও, তবে একাই আমি বাগান পরিষ্কার করে দেব। কোনো পয়সা-কড়ি নেব না।

মালী তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল। গরিব মানুষটি কাছেই একটা মাঠে গেল, সেখানে ছেলেরা খেলা করছিল। মানুষটি প্রত্যেকটি ছেলেকে একটু একটু গুড় দিল। বলল, ভাই, তোমরা আমার সঙ্গে এসো, রাজার বাগান পরিষ্কার করতে হবে। ছেলেরা গুড় খেয়ে খুব খুশি হয়েছিল, তারা ভাঙা ডালপালা তুলে এনে রাস্তার ওপর গাদা করে রাখল।

সেদিন রাজার কুমোরের কাঠের খুব অভাব হয়েছিল। সে হাঁড়ি-কলসি পোড়াবার জন্য কাঠ কিনতে গিয়ে ভাঙা ডালের পাহাড় দেখতে পেল। গরিব মানুষটিকে কিছু টাকা ও কয়েকটা হাঁড়ি দিয়ে সে ডালগুলো কিনে নিল।

তার হাতে আরও টাকা-কড়ি জমল। সেই এলাকায় অনেক অনেক ঘাসুড়ে ছিল। তারা প্রতিদিন মাঠে ঘাস আনতে যেত। মানুষটি মাঠের ধারে বড় বড় জালায় জল ভরে রাখল। ঘাসুড়েরা ঘাস কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তেষ্টা মেটাতে তার কাছে থেকে জল চেয়ে খেত। ঘাসুড়েরা সন্তুষ্ট

হয়ে বলল, তুমি আমাদের এত উপকার করছ, তুমি বল আমরা তোমার জন্য কী করতে পারি!

গরিব মানুষটি বলল, তার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যখন দরকার পড়বে আমিই জানাব।

এই সময়ে তার সঙ্গে দুজন বণিকের খুব বন্ধুত্ব হল। একজন জলপথে ও অন্যজন স্থলপথে বাণিজ্য করত। একদিন স্থলপথের বণিক বলল, ভাই, কাল এই নগরে একজন অশ্ব-বিক্রেতা পাঁচশো অশ্ব নিয়ে আসবে। এই কথা শুনে সে ঘাসুড়েদের বলল, ভাই, কাল তোমরা প্রত্যেকে আমায় এক আঁটি করে ঘাস দেবে আর আমার ঘাস বিক্রি করা শেষ না হলে তোমাদের ঘাস বিক্রি করবে না। তারা রাজি হল।

পরের দিন অশ্ব-বিক্রেতা কোথাও ঘাস না পেয়ে তার কাছ থেকে অনেক টাকা-কড়ি দিয়ে পাঁচশো আঁটি ঘাস কিনল।

এর কয়েকদিন পরে সে জলপথের বণিকের কাছ থেকে জানতে পারল, বন্দরে একটা বড় জাহাজ মাল নিয়ে এসেছে। সে দেরি না করে একদিনের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করল। গাড়ি নিয়ে বন্দরে গেল। সেখানে সে জাহাজের সমস্ত মালের দর ঠিক করে নিজেই বায়না করল। পরে তাঁবু খাটিয়ে সেখানেই থেকে গেল। অনুচরদের বলল, কোনো বণিক যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাহলে তাকে যেন একে একে তিনজন অনুচরের সঙ্গে ভেতরে আনা হয়।

এদিকে বন্দরে বড় জাহাজ এসেছে শুনে নগরের একশো বণিক জাহাজের মাল কিনবার জন্য বন্দরে এল। কিন্তু যখন শুনল একজন মহাজন একাই সমস্ত মাল বায়না করেছে, তখন খোঁজখবর নিয়ে তারা সেই মানুষটির কাছে এল। তাঁবুর আশেপাশে নানা অনুচরের ছড়াছড়ি দেখে তারা ভাবল, এই মহাজন অতুল ধনসম্পদের অধিকারী। তারা এক এক করে তার সঙ্গে দেখা করল, তার মালের এক এক অংশ কিনবার জন্য এক হাজার মুদ্রা লাভ দিতে রাজি হল। তার নিজের যে অংশ ছিল, তা কিনবার জন্যও তারা আরও এক লক্ষ মুদ্রা লাভ দিল। এইভাবে দুই লক্ষ মুদ্রা লাভ করে সেই মানুষটি নগরে ফিরে এল।

গরিব মানুষটি বুঝল, সেই পথের বণিকের শোনা কথায় কাজ করে আজ সে এত ধনবান হতে পারল। বণিকের কাছে সে চির-কৃতজ্ঞ। তাই সে বণিকের কাছে গিয়ে এক লক্ষ মুদ্রা উপহার দিল।

বণিক বলল, তুমি এত অর্থ কোথায় পেলে?

তখন মানুষটি সব খুলে বলল, মরা ইঁদুর বিক্রি করার পর থেকে মাত্র চারমাসের মধ্যে সে এত ধনী হয়েছে। তা শুনে বণিক ভাবল, এই বুদ্ধিমান মানুষটি যাতে কোনো খারাপ হাতে গিয়ে না পড়ে তা দেখতে হবে।

বণিক নিজের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিল। বণিকের অন্য কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। মানুষটি বণিকের সমস্ত সম্পত্তিও পেল।

গরিব মানুষের ভাগ্য ফেরার অসংখ্য রূপকথা রয়েছে লোকসমাজে। সেইসব রূপকথার সঙ্গে এই জাতকের সাদৃশ্য রয়েছে। আর সোমদেবের কথাসরিৎসাগরেও এইরকমের অবিকল একটি কাহিনি রয়েছে।

কাষ্ঠহারি-জাতক। অনেক অনেককাল আগে এক রাজা বনে ঘুরছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একটি মেয়ে গান গাইতে গাইতে কাঠ কুড়োচ্ছে। তাকে দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এমন রূপ! তার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা সেখানেই তাকে গান্ধর্ব-মতে বিয়ে করলেন। তাদের দৈহিক মিলন ঘটল। মেয়েটি গর্ভবতী হল। মেয়েটির গর্ভে নিজের সন্তান রয়েছে, তাই তার হাতে নিজের নাম-লেখা একটা আংটি দিয়ে বললেন, যদি তোমার মেয়ে হয়, তবে এই আংটি বিক্রি করে তার ভরণ-পোষণ চালাবে। আর যদি ছেলে হয়, তবে এই আংটি নিয়ে আমার কাছে যাবে।

কিছুদিন পরে তার একটি ছেলে হল। বনের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বেড়ে উঠতে লাগল সে। তার বাবা নেই বলে অন্য ছেলেরা তাকে খ্যাপাত।

একদিন ছেলে এসে বলল, মা, আমার বাবা কে।

মা বলল, বাছা, তুমি রাজার ছেলে।

আমি যে রাজার ছেলে তার প্রমাণ কী মা?

মা বলল, তার আংটি আমার কাছে আছে। তোমার বাবা বলেছিল যদি ছেলে হয় তবে আংটি নিয়ে আমার কাছে যাবে।

ছেলে বলল, তবে তুমি আমার বাবার কাছে নিয়ে চলো না কেন?

তখন মা ছেলে রাজার বাড়ি গেল। রাজাকে প্রণাম করে বলল, মহারাজ, এই আপনার ছেলে।

সভার মধ্যে লজ্জা পেতে হবে বলে রাজার সব কথা মনে থাকলেও তিনি না জানার ভান করে বললেন, সে কী কথা? এ আমার ছেলে হতে যাবে কেন?

রানি তখন রাজার দেওয়া আংটি দেখাল। রাজা এবারেও বিস্ময়ের ভান করে বললেন, এ আংটি আমার নয়।

তখন রানি নিরুপায় হয়ে বললেন, ধর্ম ছাড়া আমার আর কোনো সাক্ষী নেই। আমি ধর্মের দোহাই দিয়ে বলছি, এ যদি সত্যিই আপনার ছেলে হয়, তবে যেন এ মধ্য আকাশে স্থির হয়ে থাকে। আর যদি আপনার ছেলে না হয়, তবে মাটিতে পড়ে এ মারা যাবে।

এই কথা বলেই রানি পা ধরে ছেলেকে উঁচুতে ছুড়ে দিলেন। মাঝখানে ছেলে স্থির হয়ে রইল। তখন হাত বাড়িয়ে রাজা ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। ছেলে হল রাজপুত্র আর রানি হলেন রাজমহিষী।

মহাভারতের আদিপর্বের অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় থেকে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় পর্যন্ত দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-ভরত বৃত্তান্ত রয়েছে। জাতকের কাহিনির অনুরূপ। দুষ্মন্ত গিয়েছিলেন মৃগয়ায়, তিনি কণ্বমুনির আশ্রমে সর্বাঙ্গসুন্দরী মধুরভাষিণী মধুরহাসিনী রূপযৌবনবতী লোকললামভূতা অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী শকুন্তলাকে দেখেন। রাজা প্রেমাবিষ্ট হন। গান্ধর্ব-মতে বিয়ের প্রস্তাব দেন। শকুন্তলার সন্তানকে যুবরাজ ও রাজার অবর্তমানে অধিরাজ করবেন এই আশ্বাস পেয়ে শকুন্তলা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হলেন।

তখন দুষ্মন্ত গান্ধর্ব-মতে সেই মরালগামিনী শকুন্তলাকে বিয়ে করে তার সঙ্গে ক্রীড়াকৌতুক করতে লাগলেন। তাকে কিছুদিনের মধ্যেই রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুষ্মন্ত ফিরে গেলেন। মহাভারতের কাহিনিতে আংটির কোনো উল্লেখ নেই।

শকুন্তলা ভরতকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে গেলেন। কিন্তু দুষ্মন্ত বললেন, তুমি যা বললে তা আমার কিছুই মনে পড়ছে না। তোমাকে আমি চিনি না, তুমি যেখানে খুশি চলে যাও।

এমন সময় দৈববাণী হল, এই পুত্র তোমার, একে গ্রহণ করো। শকুন্তলাকে অপমান কর না। শকুন্তলা যা বলেছে সব সত্যি।

তখন দুষ্মন্ত কপটতা ত্যাগ করে বললেন, এই ছেলে যে আমার তা আমি জানি। কিন্তু যদি সহসা একে গ্রহণ করতাম তাহলে লোকে আমাকে দোষী করত। তাই মিথ্যে মিথ্যে শকুন্তলার সঙ্গে বিবাদ করছিলাম। এই বলে রাজা পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন।

আংটির বিষয়টি ছাড়া জাতকের গল্পের সঙ্গে খুব সাদৃশ্য রয়েছে। দুই রাজাই বিষয়টি জেনেও না জানার ভান করেছেন, দৈবের কৃপায় সত্য

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লোককথার যে নানা রূপ নানান জায়গায় পাওয়া যায় এখানেও তার নিদর্শন রয়েছে। দুই সংকলক দুটি এলাকা থেকে তাদের কাহিনি সংগ্রহ করেছেন, অবশ্য উৎস লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য।

শিবি-জাতক। শিবিরাজার আত্মোৎসর্গের কাহিনি ভারতে অত্যন্ত সুপরিচিত। বিভিন্ন লোকসমাজে নানা রূপে এই কাহিনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায় উভয়েরই অত্যন্ত প্রিয় রূপকথা। মহাভারতের বনপর্বের ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ও একত্রিংশদধিকতম অধ্যায়ে উশীনর উপাখ্যান ও অনুশাসনপর্বের দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়ে সর্বজীবে দয়া—শিবি-কপোত-শ্যেনবৃত্তান্তে একই কাহিনি রয়েছে। কথাসরিৎসাগরেও শিবিরাজার বৃত্তান্ত আছে।

জাতকের কাহিনিতে রয়েছে: শিবিরাজ স্থির করেছেন যে আজ কোনো যাচক উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি নিজের চোখ উৎপাটন করে তাকে দান করবেন। যাচক বলেছিলেন, আমি অন্ধ আর আপনার রয়েছে দুটি চোখ। আপনি আমাকে আপনার একটি চোখ দান করুন। রাজা সম্মত হলেন। সীবক বাম হাতে রাজার চোখ ধরলেন আর ডান হাতে অস্ত্র নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র কেটে রাজার হাতে চোখটি দিলেন। অন্ধ সেই চোখ নিজের কোটরে বসিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। শিবি দ্বিতীয় চোখটিও অন্ধকে দান করলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত তিনি দুটি চোখই ফিরে পেয়েছেন, নইলে রূপকথার ইচ্ছাপূরণ সম্পূর্ণ হয় না।

মহাভারতে কিন্তু আরও মহৎ আত্মোৎসর্গের বিবরণ রয়েছে। জাতকে রাজা নিজেই দানের বিষয়টি চিন্তা করেছেন আর মহাভারতে বাসব ও বহ্নি দেবতা উশীনরকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেন ও হুতাশন কপোতরূপে উশীনরের যজ্ঞভূমিতে এসেছেন। রাজা দেহের সব মাংস কেটে দিলেও কপোতের সমান ওজন হল না। তখন তিনি নিজেই তুলাদণ্ডে উঠে বসলেন। ইন্দ্র ও হুতাশন নিজেদের মূর্তি ধরে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। রূপকথায় যা যা ঘটে তাই হল, রাজা পূর্বদেহ ফিরে পেলেন।

অনুশাসনপর্বে কিন্তু দেবতাদের অন্য মূর্তিতে এসে পরীক্ষা করার বিষয়টি নেই। এখানে রয়েছে: আগে এক প্রিয়দর্শন কপোতকে শ্যেন পাখি শিকারের জন্য তাড়া করেছিল। শিবিরাজার কোলে সে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপরে একইভাবে কাহিনি এগিয়ে চলল। কাহিনির শেষে আছে, তিনি

তুলাদণ্ডে আরোহণ করবামাত্র দেবরাজ ত্রিলোকবাসীদের সঙ্গে সমবেত হয়ে শিবিরাজার কাছে এলেন। দেবগণ ভেরি ও দুন্দুভি ধ্বনি করে তার মস্তকে বারবার অমৃত ও পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার মতো তার আনন্দের জন্য নৃত্যগীত করতে লাগল।

উশীনর ও শিবির কাহিনি একই গ্রন্থে থাকা সত্ত্বেও কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গেল। উশীনর যজ্ঞ করছিলেন, যজ্ঞে তিনি বাসবকে অতিক্রম করেছিলেন। তাই বোধহয় পরীক্ষা করবার প্রয়োজন পড়ল। আর শিবির গল্পে ভয় পেয়ে কপোত আশ্রয় নিয়েছিল। এখানে শ্যেন ও কপোত দেবতা নয়। একই গ্রন্থে একই গল্প দুভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও কি দুজন সংগ্রাহক একই রূপকথার দুটি রূপকে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন? একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। আবার জাতকের কাহিনির মর্মকথা এক হলেও রূপটি ভিন্ন। লৌকিক ঐতিহ্য নানা রূপে উচ্চতর সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। দুটি ভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হয়ে না থাকলে কিংবা একই জনের সংগ্রহ হলে এই পরিবর্তন সম্ভব হত না।

পঞ্চতন্ত্র-পিলপের নীতিকথা-হিতোপদেশ

পঞ্চতন্ত্র

পৃথিবীর লোককথার সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন হল পঞ্চতন্ত্র। ঈশপের নীতিকথার সঙ্গে এর তুলনা করা হয়। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের সংকলন ও সম্পাদনায় যে নিষ্ঠা, বৈদগ্ধ্য ও সৃষ্টিশীল মনের পরিচয় রয়েছে তা ঈশপের নেই। ঈশপের নীতিকথা শুধুমাত্র লোককথার সংগ্রহ আর সেই কারণেই অনেক বেশি লৌকিক। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনিগুলি সম্পূর্ণভাবে লৌকিক হলেও তার সম্পাদনার চমৎকারিত্ব সকলকে মুগ্ধ করে। লৌকিক ঐতিহ্যকে প্রায় অবিকৃত রেখে সম্পাদনার এমন বুনুনি অন্য কোথাও দেখা যায় না। ভারতবর্ষীয় পঞ্চতন্ত্র বিশ্বের লোককথা সংগ্রহের ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়। নিরক্ষর গ্রামীণ লোকসমাজ যে এক অসাধারণ বিস্ময়কর স্রষ্টা তার অনন্য নিদর্শন সংকলিত সম্পাদিত ও সংস্কৃতে অনূদিত এই পঞ্চতন্ত্র। প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করতে

করতে তাদের এগোতে হয় বলেই শ্রমনির্ভর এক আশ্চর্য জীবন-অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেন। এই ধরনের সামাজিক অভিজ্ঞতা অন্য কোনো সমাজে অর্জন করা সম্ভব নয়। লোকচরিত্রের এমন অপরূপ প্রকাশও প্রায় দুর্লভ। আর এসবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দেড় হাজার বছর ধরে প্রচারিত হয়ে এসেছে ভারতীয় পঞ্চতন্ত্র।

পঞ্চতন্ত্রের লোককথাগুলি আদিতে ছিল লোকসমাজের সম্পদ। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোককথা-সংগ্রাহক পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা অসীম পরিশ্রম ও অবর্ণনীয় ধৈর্যে এগুলি সম্পাদনা করে লিখিত রূপ দেন। লোকসমাজের নিজস্ব সম্পদ না হলে বিশ্বের লোকসমাজে এগুলি এমনভাবে আদৃত হত না কিংবা পঞ্চতন্ত্রের বিশ্বজয়ও সম্ভব ছিল না। পঞ্চতন্ত্রের বিশ্বজয় কীভাবে সম্ভব হল?

এক সময় ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য-আরব দুনিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। প্রথম আদান- প্রদান শুরু হয় ব্যাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে। তারপরে স্বাভাবিক নিয়মেই অর্থনৈতিক যোগাযোগের পথ বেয়ে কিছু জ্ঞানতাপস সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে তোলেন। একে অন্যের সাংস্কৃতিক ও ভাবগত সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই প্রক্রিয়া প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।

পারস্যের এক বাদশাহ এই রকম একজন জ্ঞানতাপসের মুখে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনি শুনে মুগ্ধ হন। বাদশাহ ছিলেন রসিক মানুষ ও বিদ্যানুরাগী। তিনি পহ্লভী ভাষায় এই পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ করতে আদেশ দেন। আধুনিক পারসিক ভাষায় এই গ্রন্থের নাম আনোয়ার-উ-সুহাইলি এবং ইয়ার-ই-দানিশ। পারসিক এই অনূদিত রূপ থেকেই পরে সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্র ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয় সিরিয়াক ও আরবি ভাষায়। সিরীয় গ্রন্থটির নাম কলিলগ ও দিমনগ। পঞ্চতন্ত্রের করটক ও দমনক কাহিনি থেকেই এই নামকরণ করা হয়েছে। আরবি অনুবাদের নাম কলিলা ওয়া দিমনা, সিরীয় ভাষার নামকরণ এখানে অনুসরণ করা হয়েছে। ইংলন্ডে এই গ্রন্থ বিদ্‌পাই-এর নীতিকথা নামে প্রচারিত হয়েছিল।

সিরীয় পারসিক ও আরবি ভাষার পথ বেয়ে কনস্‌তান্তিনোপল-এর মধ্যে দিয়ে পঞ্চতন্ত্র সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ডে নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়। হিব্রু গ্রিক ইতালীয় লাতিন ফরাসি জর্মন স্লাভ স্প্যানিশ ও

সংকলিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কাহিনিগুলো আরও পুরনো, লোকসমাজে অনেক কাল আগে থেকেই এসব কাহিনি প্রচলিত ছিল। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের প্রতি মুগ্ধতার জন্যই হারটেল কিছুটা কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। একথা সত্যি, লোকসমাজে কাহিনিগুলো প্রচারিত ছিল যার ফলে জাতকমালায় অনেক কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের রচনা-কাল অত পুরনো নয়। রেমন্ড ডেলয় জেসন বলেছেন, পঞ্চতন্ত্র খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সংকলিত। লিলিয়ান হারল্যান্ডস হর্‌ন্‌স্টেইন বলেছেন, পঞ্চতন্ত্র ২০০—৫০০ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত হয়েছিল। পেনজার-টনিও সংকলনের সময় ধরেছেন খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

অর্থাৎ ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চতন্ত্র সংকলিত হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। সকলেই একটি বিষয়ে একমত, এটি লোককথার সংকলিত গ্রন্থ। কাল-নির্ণয়েই মতভেদ। আসলে, লোকসমাজের এইসব মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে এমন কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনার উল্লেখ সাধারণত থাকে না যার ওপরে ভিত্তি করে সঠিক কাল-নির্ণয় সম্ভব। বিষ্ণুশর্মা নামে একজন লোকসমাজের মধ্যে বহুকাল ধরে প্রচলিত লোককথা সংগ্রহ সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন — এই বিষয়টিতে কোনো দ্বিমত নেই। ভারতবর্ষে পাওয়া সমস্ত পুথিতেই বিষ্ণুশর্মার নাম রয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রের আদি পুথি ঠিক কবে সংকলিত হয়েছিল তা বলা না গেলেও একটি সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই করা যায়। পঞ্চতন্ত্র কোনোভাবেই ৫৭৯ খ্রিস্টাব্দের পরে রচিত নয়। কেননা, পারস্যের যে বাদশাহ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনিগুলো শুনে মুগ্ধ হয়ে অনুবাদের আদেশ দেন, সেই বাদশাহ মারা যান ওই বছরে। প্রাচীন ভারতবর্ষে পঞ্চতন্ত্র নিশ্চয়ই তার আগেই যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল নইলে পারস্যের জ্ঞানতাপস তার সন্ধান পেতেন না। তাই মনে হয়, এই সালের বহু আগেই পঞ্চতন্ত্র সংকলিত হয়ে থাকবে।

পঞ্চতন্ত্রের লেখক হিসেবে বিষ্ণুশর্মার নাম সুবিদিত। পঞ্চতন্ত্রের কথামুখম্-এ রয়েছে,

> সকলার্থ শাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
> তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম্॥

সুতরাং পুথিতে পাওয়া গ্রন্থকারের নাম সুস্পষ্ট। কিন্তু এই নামটি সত্যিই পঞ্চতন্ত্রের সংকলকের কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক গ্রন্থেরই রচয়িতার নামে সন্দেহ জাগে। অনেকে বেদব্যাস নামের মধ্যেও এই ইঙ্গিতে দিয়েছেন। অনেক পুথিকার নিজের গুরুর নামে কিংবা নিজের সম্প্রদায়গত নামে পুথি লিখেছেন। পুথি প্রচারই তাদের উদ্দেশ্য ছিল, নিজের নাম নয়। এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক বোধ থেকে এই মানসিকতার জন্ম। তাই বিষ্ণুশর্মা এই নামেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আজ বোধহয় আর সে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের যে প্রামাণ্য পাঠ আজ স্বীকৃত তাতে ৮৪টি লোককথা রয়েছে। পঞ্চতন্ত্র সংকলন করবার সময় বিষ্ণুশর্মা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লোককথা সংগ্রহ করেছিলেন। তার কালে ভারতবর্ষে অসংখ্য লোককথা ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু নীতিশিক্ষার মহান দায়িত্বের কথা মনে রেখে, লোকশিক্ষার উপযোগী করে পুথিকে সাজিয়ে তুলতে তিনি নিজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাহিনি নির্বাচন করেছেন। সম্পাদক হিসেবে এই পুথিকার যে কত বড় প্রতিভাধর ছিলেন তা পঞ্চতন্ত্র গভীরভাবে পড়লেই উপলব্ধি করা যাবে। একটি মানুষ অসীম ধৈর্যে, মননশীল নির্বাচনে ও কষ্টসাধ্য পরিশ্রমে কীভাবে লোকশিক্ষার এমন আশ্চর্য সংকলন গ্রন্থ সৃষ্টি করতে পারেন তা পঞ্চতন্ত্র না পড়লে বিশ্বাস করা যাবে না। লোকসমাজের ঐতিহ্য থেকে সম্পদ আহরণ করে তিনি তিলোত্তমা সৃষ্টি করেছেন। পঞ্চতন্ত্রের লোককথা যেমন একদিকে লোকসমাজের তেমনি অন্যদিকে সম্পাদক বিষ্ণুশর্মার। লৌকিক ঐতিহ্য ও বিষ্ণুশর্মার বৈদগ্ধ্যপূর্ণ আন্তরিকতায় পঞ্চতন্ত্র বিশ্বের চিরায়ত সাহিত্যের অনন্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। বিশ্বে তার দিগ্বিজয়-যাত্রার পেছনে এই সৃষ্টির চমৎকারিত্ব ক্রিয়াশীল ছিল।

প্রাচীন অন্যান্য ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের যেসব অনূদিত গ্রন্থ রয়েছে সেখানে লোককথার সংখ্যা অনেক বেশি। অনুবাদে লোককথার রূপরীতিতে যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে সংখ্যার ক্ষেত্রেও। তাহলে কি পঞ্চতন্ত্রে আগে আরও বেশি কাহিনি ছিল? আবার পঞ্চতন্ত্রের অনেক পুরনো সংস্কৃত পুথিতে ৮৪ কিংবা ৭৯টি কাহিনি রয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়াও আজ অসম্ভব। ইতিহাসের কোনো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন সমস্যার সমাধান হবে না।

বিষ্ণুশর্মা কেন পঞ্চতন্ত্র লিখলেন সে বিষয়ে একটি কাহিনি আছে গ্রন্থের কথামুখম্-এ। কাহিনিটিও শুনিয়েছেন স্বয়ং বিষ্ণুশর্মা। বড় বিস্ময় লাগে, যে আশি বছরের বৃদ্ধ গুরুদেব জাগতিক বৈভব প্রত্যাখ্যান করছেন তিনি এমনভাবে নিজের প্রশংসা করছেন, পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রকাশ করছেন। অন্য কেউ যেভাবে শিক্ষা দিতে পারবেন না, তিনি সেই বিস্ময়কর পদ্ধতি আশ্রয় করেছেন। 'কথামুখম্'-এর এই কাহিনিও কি প্রক্ষিপ্ত?

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বরুণ কার্তিক ইন্দ্র যম কুবের লক্ষ্মী সরস্বতী সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং মনু বৃহস্পতি শুক্র পরাশর প্রভৃতিকে প্রণাম জানিয়ে বিষ্ণুশর্মা লিখেছেন:

দাক্ষিণাত্যের এক জনপদে মহিলারোপ্য নামে এক নগর ছিল। সেখানকার রাজার নাম অমরশক্তি। তার তিন ছেলে। বসুশক্তি উগ্রশক্তি ও অনেকশক্তি। তারা তিনজনেই মহামূর্খ, লেখাপড়ায় একেবারে মন নেই, বই দেখলে সাত হাত দূরে পালায়। রাজা চিন্তিত।

শেষকালে রাজা অমাত্যদের বললেন, আপনারা সবাই জানেন আমার তিন ছেলে মহামূর্খ, অপগণ্ড, তারা লেখাপড়া করতে চায় না। আমার এত বড় রাজ্য, কিন্তু মনে সুখ নেই। সন্তান জন্মেনি কিংবা জন্মাবার পরে মরে গেল— মূর্খ ছেলের চেয়ে তাও ভালো। প্রথম দুজনের জ্বালা অল্প, কিন্তু তৃতীয় জন যে সারা জীবন জ্বালাতন করবে। যে স্ত্রীর সন্তান জন্মায় না তাও মেনে নেওয়া যায়, গর্ভেই যে সন্তান মারা যায় তাও সহ্য করা যায়। কন্যা সন্তান হলেও আপত্তি নেই। প্রচুর বিত্ত ও রূপ থাকলেও বোকা সন্তানকে কেউ কামনা করে না। যে গোরুর বাচ্চা হয় না, যে গোরু দুধ দেয় না, তাকে নিয়ে আমি কী করব? যে ছেলের বিদ্যাবুদ্ধি নেই সে ছেলে থেকেই বা কী লাভ? তাই বলছি, ছেলে তিনটির যাতে মতিগতি ফেরে আপনারা তার ব্যবস্থা করুন। আমার রাজ্যে পাঁচশো পণ্ডিত রয়েছেন যাদের আমিই ভরণপোষণ চালাই। তাই আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার ব্যবস্থা আপনারা করুন।

তখন একজন বললেন, মহারাজ, শুধু ব্যাকরণ শিখতেই বারো বছর সময় লাগে। তারপর পড়তে হবে ধর্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র কামশাস্ত্র। এইভাবে ধর্ম-অর্থ-কাম শাস্ত্র আয়ত্ত করতে পারলেই সত্যিকার জ্ঞান জন্মায়।

অমাত্য সুমতি বললেন, এ জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু শব্দশাস্ত্র আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগে। তাই ওদের জ্ঞান জন্মাবার জন্য কোনো ছোট বইয়ের কথা চিন্তা করতে হবে। খোসা ফেলে যেমন শাঁস খেতে হয়, হাঁস যেমন জল ফেলে দুধটুকু শুধু খায়, তেমনি এইরকম কোনো কৌশল জেনে নিয়ে ওদের পড়াতে হবে। তাই বলছি, এই রাজ্যে বিষ্ণুশর্মা নামে যে ব্রাহ্মণ রয়েছে তার হাতে আপনি তিন ছেলের ভার দিন। সব শাস্ত্র তিনি জানেন, তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। তিনি নিশ্চয়ই আপনার ছেলেদের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মানুষ করে তুলতে পারবেন।

রাজা বিষ্ণুশর্মাকে ডাকলেন। বললেন, আমার তিন ছেলে খুব তাড়াতাড়ি যাতে অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে, দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন। আমি আপনাকে একশোটি রাজদান দানপত্র করে দেব।

বিষ্ণুশর্মা তখন বললেন, আমি বিদ্যা বিক্রি করি না। একশো রাজদানের বিনিময়েও বিদ্যা বিক্রি করব না। কিন্তু আপনার এই তিন ছেলেকে যদি ছয় মাসের মধ্যে নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত করে তুলতে না পারি, তবে বৃথাই আমার নাম। আমার বয়স হয়েছে আশি বছর, সমস্ত ইন্দ্রিয়-সুখ থেকে সরে এসেছি, অর্থ দিয়ে আমি কী করব মহারাজ? শুধুমাত্র আপনার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আমি সরস্বতীকে নিয়ে পরীক্ষা করব। আজকের দিনটি লিখে রাখুন। ছয় মাসের মধ্যে তাদের যদি পণ্ডিত করে তুলতে না পারি তবে ঈশ্বর যেন আমার স্বর্গের পথ রুদ্ধ করে দেন।

বিষ্ণুশর্মার এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞা শুনে রাজা ও তার অমাত্যরা আনন্দিত হলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিতও হলেন। রাজা তিন ছেলেকে সঁপে দিলেন গুরুদেবের হাতে। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

বিষ্ণুশর্মা তিন অপগণ্ড ছেলেকে গ্রহণ করলেন এবং পাঁচটি তন্ত্র রচনা করে তাদের পড়াতে লাগলেন। তারাও এই পাঁচটি তন্ত্র পড়ে ছয় মাসের মধ্যেই অসাধারণ পণ্ডিত হয়ে উঠল। তখন থেকেই ভূতলে পঞ্চতন্ত্র নামে নীতিশাস্ত্রের এই গ্রন্থটি প্রচারিত হল 'বালাববোধনার্থং।' বেশি কিছু বলতে চাই না, শুধু বলছি:

> অধীতে য ইদং নিত্যং নীতিশাস্ত্রং শৃণোতি চ।
> ন পরাভবমাপ্নোতি শক্রাদপি কদাচন॥

নীতিশাস্ত্রের এই গ্রন্থ যে নিত্য পড়বে ও শুনবে, ইন্দ্রের কাছেও সে কখনও পরাভব স্বীকার করবে না।

পঞ্চতন্ত্রের এই কথামুখটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, বিষ্ণুশর্মা নিজের সম্পর্কে কী বলতে চেয়েছেন। আত্মবিশ্বাস এক জিনিস আর পাণ্ডিত্যের দম্ভ-প্রকাশ অন্য জিনিস। বিষ্ণুশর্মা স্থিরনিশ্চিত যে, তিনি নতুন পদ্ধতিতে ছেলেদের মানুষ করে তুলতে পারবেন ' বিদ্যার ক্ষেত্রে এটি একটি চ্যালেঞ্জ। সে যোগ্যতা-দক্ষতা তার যে রয়েছে তার প্রমাণ এই সম্পাদিত গ্রন্থটি। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করেছেন, যিনি বিদ্যা বিক্রয়ে অসম্মত, যিনি বৈভব প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনি কীভাবে দেবী সরস্বতীকে পরীক্ষা করবার মনোভাব প্রকাশ করেন? তিনি কীভাবে বলতে পারেন, তার গ্রন্থ ইন্দ্রের কাছে পরাভব থেকে বাঁচবার পথ দেখাবে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। নিজের গ্রন্থের উৎকর্ষের কথা তো বলবেন অন্যেরা, নিজে মুখে সে কথা প্রচার করলে তা হাস্যকর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বিষ্ণুশর্মার মতো নির্লোভ জিতেন্দ্রিয় পণ্ডিত মানুষের মুখে বড়ই বেমানান ও অসংলগ্ন বলে মনে হয়।

কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু তবু কথামুখের ভাষ্যটি পড়ে মনে হয়, এটি কোনোভাবেই বিষ্ণুশর্মার উক্তি নয়। তার কোনো শিষ্য, কিংবা পরবর্তীকালের কোনো পুথিকার পঞ্চতন্ত্রের গৌরব ও বিষ্ণুশর্মার অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই কাহিনি যুক্ত করেছেন। রাজা-অমাত্য-তিন ছেলের কাহিনিটি শুধুই যেমন একটি কল্পকাহিনি, তেমনি এই অংশটিও প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়। এরকম বহু কাহিনিই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে পরবর্তীকালে।

কথামুখের এই গল্পটি কল্পনাকাহিনি হলেও এর মধ্যে একটি সত্য লুকিয়ে রয়েছে। লোকসমাজের অভিজ্ঞতায় আলোকিত লোককথার মাধ্যমে যত সহজে সুন্দরভাবে প্রাণময় করে শিক্ষাদান সম্ভব, তা অন্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আশি বছরের কথা রয়েছে, কেননা বহু অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া পণ্ডিত এই সত্যটি উপলব্ধি করেছেন। লোককথার এই লোকশিক্ষার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে বলেই বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য রচনার সময় বেছে নেন লোকসমাজের রামকথাকে, মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম দুরূহ বিষয়কে সহজভাবে বোঝাবার জন্য শোনান লোককথা,

ক্রীতদাস ঈশপ ব্যক্তিগত জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা-ক্ষোভ-অপমান-প্রতিবাদের কথা প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্ত করতে আশ্রয় নেন কৃষকের লোককথার, গৌতম বুদ্ধ-কনফুসিয়াস-লাওসে-মুশা-জিশুখ্রিস্ট-পার্শ্বনাথ-জরোথুস্ট্রের মতো ধর্মগুরু ও নীতিশিক্ষক ক্লান্তিহীনভাবে অসংখ্য লোককথা শোনান। লোককথার যে আশ্চর্য সঞ্জীবনী ও সম্মোহনীশক্তি রয়েছে তা এঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতাও এই বোধ থেকেই রাজনীতি-অর্থনীতি-ব্যবহারনীতি প্রভৃতি জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে তুলতে লোককথাকেই বেছে নিয়েছেন। বেদ-উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে অনেক নীতিবাক্য রয়েছে, রয়েছে কিছু কাহিনিও। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রকার সেসবের ওপর আদৌ নির্ভর করেননি, সেইসব নীতিকথাকে নিজের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তও করেননি। লোকসমাজের সম্পদকেই তিনি আগাগোড়া ব্যবহার করেছেন। সামাজিক অভিজ্ঞতা ও লোকমানস সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গভীর ও ব্যাপক ছিল বলেই তিনি লোককথার আশ্রয় নিয়েছেন।

পঞ্চতন্ত্রের নীতিকথাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখব, লোকসমাজের অভিজ্ঞতা ও মানসিকতা তাদের নিজস্ব সামাজিক অনুভূতি থেকে জন্ম নিয়েছে। এই অনুভূতির কথা অন্য কোনো সমাজের বিদগ্ধ জন কোনোভাবেই প্রকাশ করতে পারেন না। যে নির্মম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই বোধ জাগে তা একান্তই লোকসমাজের। লোককথাগুলো শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশ নয়, এর মধ্যে লোকসমাজের বেদনাময় সংগ্রামশীল রূঢ় বাস্তবের ঐতিহাসিক রূপটি লুকনো রয়েছে। দারিদ্র্য-বঞ্চনা-উৎপীড়ন-অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবনযুদ্ধের জ্বালা লোকসমাজের সর্বক্ষণের সঙ্গী। লোককথাগুলো এসবেরই সাহিত্যিক বহিঃপ্রকাশ, রূপকের আড়ালে জীবনের কথা।

পঞ্চতন্ত্রের অসাধারণত্বে থিওডর বেনফে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি এমন সব উক্তি করেছেন যা অনেকের কাছে অতিশয়োক্তি বলে মনে হবে। পরবর্তী গবেষণায় তার অনেক তত্ত্ব হয়তো বাতিল হয়ে গিয়েছে কিন্তু পঞ্চতন্ত্র সম্পর্কে তার মুগ্ধতারও অনেক বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। তার মাইগ্রেশন তত্ত্বটি হয়তো সর্বাংশে সত্য নয়, কিন্তু অন্য অনেক ধারণাই আজও সত্য বলে স্বীকৃত। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পঞ্চতন্ত্রের ভূমিকায়

বেনফে লিখেছেন, As far as the sources and the dissemination of the stories contained in the Panchatantra are concerned, it is clear that in general most of the animal fables originated in the Occident and are in greater or less degree transformations of the so-called Aeshop fables.....the Indic fable treated the animals without regard to their special nature, as if they were merely men masked in animal form. My investigations in the field of fables, Marchen, and tales of the Orient and Occident have brought me to the conviction that few fables, but a great number of Marchen and other folktales have spread outword from India almost over the entire world.... It is the Marchen we have spoken of which create the inexhaustible, everbubbling fountain at which all the people, high and low, but especially those who have no other springs of spiritual enjoyment, continually refresh themselves anew.

একসময় বলা হত পঞ্চতন্ত্র হল 'চিফ্ সোরস্ অব দ্য ওয়ার্ল্ডস্ ফেব্ল্ লিটারেচার'। হয়তো অতিশয়োক্তি রয়েছে, কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু রয়েছে যাতে একদিন একথা উচ্চারিত হতে পেরেছিল। পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে সেই 'এমন কিছু' কী রয়েছে?

বিষ্ণুশর্মার সম্পাদনা

নীতিশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুশর্মা কিছু লোককথাকে বেছে নিলেন। তারপরে অপরূপ বৈদগ্ধ্যে এক অনন্য সম্পাদিত গ্রন্থ সৃষ্টি করলেন। এমন অসাধারণ সম্পাদনা দুর্লভ। বিচ্ছিন্ন লোককথাগুলোকে তিনি একটি মালায় গেঁথে তুললেন, একটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এই সম্পাদনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

বিষ্ণুশর্মার গ্রন্থ পাঁচটি তন্ত্রের সমাহার। মিত্রভেদম্, মিত্রপ্রাপ্তিকম্, কাকোলূকীয়ম্, লব্ধপ্রণাশম্ ও অপরীক্ষিত-কারকং। ৮৪টি লোককথাকে তিনি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করলেন। এই তন্ত্রভাগের মধ্যে সূক্ষ্ম চিন্তা ও

গভীর মননের পরিচয় রয়েছে, যা কোনোভাবেই লোকসমাজের সরল মননজাত হতে পারে না। এই ভাগগুলি পঞ্চতন্ত্রকে বিশিষ্ট করে তুলল।

লোকসমাজ লোককথা বলেন। বিশেষ বিশেষ অনুভূতি প্রকাশের জন্য এসবের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিমানুষ এর স্রষ্টা হলেও সমগ্র সমাজের সম্পদ বলে এগুলো গণ্য হয়। এগুলো তাই সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। আলাদা আলাদাভাবে লোককথা গড়ে ওঠে। একের সঙ্গে অন্যের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

কিন্তু বিষ্ণুশর্মা এক নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে পৃথিবীতে বহু দেশে লোককথা সংগ্রহে এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুশর্মাই বোধকরি এ বিষয়ে পথিকৃৎ।

একটি লোককথা শুরু হল। মাঝখানে অনেকগুলো কাহিনি মালার মতো গাঁথা রইল। তারপরে একেবারে শেষে গিয়ে প্রথম লোককথাটির সমাধান ঘটবে। মাঝে মধ্যে অবশ্য প্রথম কাহিনিটির কিছু কিছু অংশের উল্লেখ থাকে। এর ফলে প্রথম লোককথাটি পড়তে শুরু করলে মাঝের সবগুলো পড়ে ফেলতে হবে শেষের অংশটি জানবার জন্য। এক অদ্ভুত আগ্রহ টেনে নিয়ে যায় শেষপর্যন্ত। এমনিতেই লোককথা শুনবার একটা আলাদা আকর্ষণ থাকে যা লোকসমাজের রসিক মনের সৃষ্টি। তার ওপরে বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি করলেন বিষ্ণুশর্মা। যারা এগুলি পড়েছেন তারাই উপলব্ধি করবেন এই আকর্ষণ কত দুর্দমনীয়। আধুনিক কালের কিছু চিত্রকাহিনিতে এই প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি বিষ্ণুশর্মার চিন্তাজাত।

পঞ্চতন্ত্রে এইরকম পাঁচটি গল্পমালা রয়েছে। পদ্ধতিটি বড়ই আকর্ষণীয়। মিত্রভেদ তন্ত্রটি আলোচনা করছি।

দাক্ষিণাত্যে এক জনপদে মহিলারোপ্য নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে থাকতেন এক বণিক। তারা নাম বর্ধমান।

ধর্মপথে ব্যাবসা করে তিনি খুব ধনী হয়েছিলেন। একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে তিনি চিন্তা করলেন, অর্থের দ্বারা সব কিছুই হয়, তাই অন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আরও অর্থ উপার্জনে মন দেওয়াই ভালো। যার অর্থ আছে, তার থাকে অনেক বন্ধু, আত্মীয়। যে অর্থবান সেই সত্যিকার পুরুষ ও সর্বজ্ঞ। এমন কোনো শিল্পকলা নেই, এমন কোনো বিদ্যা নেই যা তার অজানা। যার অর্থ আছে পরও তার আপনজন হয়, যে অর্থহীন তার স্বজনই

বা কী দুর্জনই বা কী! অর্থের পাহাড় জমলে সবকিছুই করা যাবে। অর্থের জোরে মানী না হয়েও সে মান পায়, অর্থের কতই না জাদুশক্তি! অর্থের আশায় মানুষ শ্মশানেও পড়ে থাকে, নিঃস্ব ধনহীন পিতাকে লোকে ত্যাগ করে। অর্থ থাকলে বৃদ্ধও যুবক হয়ে ওঠে, অর্থহীন মানুষ যৌবনেই বৃদ্ধ হয়ে যায়।

সেই অর্থ পেতে হলে ছটি পথ রয়েছে। ভিক্ষা রাজসেবা কৃষিকাজ বিদ্যার্জন মহাজনী ও ব্যাবসাবাণিজ্য। এর মধ্যে ব্যাবসাবাণিজ্য করে যে অর্থ উপার্জন করা যায় তাই সবচেয়ে সম্মানজনক। কেননা, নীচলোকে ভিক্ষা করে, রাজা ন্যায্য প্রাপ্য দেন না, কৃষিতে খুব কষ্ট, বিদ্যাশিক্ষা কষ্টকর, একে কড়া নিয়ম মেনে চলতে হয় আবার গুরুর কাছেও নত হয়ে থাকতে হয়, মহাজনী কারবারে সুদের জন্য অন্যের কাছে অনেক অর্থ রাখতে হয়— সে অর্থ মারা যেতে পারে— তাই ব্যাবসার চেয়ে ভালো অন্য কিছু পৃথিবীতে আছে বলে আমার মনে হয় না। আর ব্যাবসার মধ্যে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে রাখাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, অন্য উপায়গুলো অনিশ্চিত। যাতে প্রভূত অর্থোপার্জন হয় সেই ব্যাবসা সাতরকমের। গন্ধদ্রব্যের ব্যাবসা, বন্ধকি কারবার, যৌথ ব্যাবসা, দোকান করা, জিনিসের দাম বাড়িয়ে বলা, ওজন ঠকানো আর অন্য স্থান থেকে জিনিস নিয়ে আসা।

অনেক ভেবেচিন্তে বণিক ঠিক করলেন, তিনি মথুরায় যাবেন। যে পণ্যের চাহিদা আছে তা কিনে আনবেন। এই ভেবে গুরুজনদের আশিস নিয়ে শুভদিনে ভালো গাড়িতে চড়ে রওনা দিলেন। তার বাড়িতেই জন্মেছিল দুটি সুলক্ষণযুক্ত ষাঁড়। তাদের নাম সঞ্জীবক ও নন্দনক। দুজনের কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে বণিক রওনা দিলেন।

কাহিনির এই অংশ পর্যন্ত লৌকিক উপাদান নেই। লোককথায় জীবন দর্শন থাকে কিন্তু তা এমন তাত্ত্বিকভাবে কখনই প্রকাশিত হয় না। ব্যাবসা-সংক্রান্ত এত সূক্ষ্ম বিভাজন লৌকিক জীবনে সম্ভব নয়। ব্যবহারনীতি শেখাতে বিষ্ণুশর্মা নিজেই এই তত্ত্বকথা সৃষ্টি করেছেন। কাহিনির পরের অংশে কিছুটা লোক-উপাদান রয়েছে।

বণিক চলেছেন গোরুর গাড়িতে। হঠাৎ যমুনার জলাভূমিতে গভীর কাদায় পা মচকে পড়ে গেল সঞ্জীবক। আর উঠতে পারে না সে। বর্ধমানের খুব কষ্ট হল। বড় আদরের গোরু। তিনি তিনদিন সেখানেই থেকে গেলেন।

তখন সঙ্গী অন্য বণিকরা বললেন, এ বনে বাঘ-সিংহ আছে, আরও কত বিপদ আপদ আছে কে জানে। একটা ষাঁড়ের জন্য আপনি সবাইকেই বড় বিপদে ফেললেন। কথায় বলে, যে বুদ্ধিমান সে সামান্য কিছুর জন্য অনেক কিছু হারায় না, তাকেই পণ্ডিত বলে যে একটু ছেড়ে অনেক কিছু ধরে রাখে।

বণিক ভাবলেন, কথাটা ওরা ঠিকই বলেছে। তখন তিনি কয়েকজন ভৃত্যকে সেখানে রেখে বণিকদের সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

এদিকে ভৃত্যেরা ভাবল, বনে কত আপদ-বিপদ ঘটতে পারে, তাই সঞ্জীবককে ফেলে তারাও রওনা দিল।

শেষকালে দলের কাছে পৌঁছে বণিককে বলল, গোরু মরে গিয়েছে। আপনার আদরের প্রাণী, তাই তাকে দাহ করে দিয়েছি।

একথা শুনে বণিক আনন্দিত হলেন, তার আদরের গোরুর ভালো সৎকার হয়েছে।

এর পরের অংশ থেকেই শুরু হল আসল লোককথা। এই অংশ থেকেই লৌকিক উপাদান লক্ষ্য করা যাবে। লোককথার মেজাজটি ধরা পড়েছে এখানে।

সঞ্জীবক কিন্তু মরেনি। যমুনার ঠান্ডা হাওয়ায় সে সেরে উঠল। আস্তে আস্তে নদীর তীরে এল। সেখানে কচি কচি ঘাস খেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই শিবের ষাঁড়ের মতো তেজি হয়ে উঠল। তখন সে রোজ তার শিং দিয়ে উইঢিপির চুড়ো ভেঙে দিয়ে বিকট গর্জন করত।

সেই বনে ছিল এক সিংহ। তার নাম পিঙ্গলক। তার আশেপাশে থাকত অনেক জন্তু-জানোয়ার। একদিন তাদের জলতেষ্টা পেয়েছে। দল নিয়ে সিংহ চলল যমুনায়। এমন সময় শুনতে পেল সঞ্জীবকের বিকট গর্জন। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সিংহ। কিন্তু সে পশুরাজ, ভেতরে কাঁপতে থাকলেও চোখ-মুখে প্রকাশ করল না। বটগাছের তলায় সবাইকে নিয়ে বসে রইল। শত্রু এলে আক্রমণের জন্য তৈরি থাকল।

সিংহের আশেপাশে ঘুর-ঘুর করত দুই শেয়াল। তারা মন্ত্রীপুত্র। কিন্তু তখন চাকরি নেই। তাদের নাম করটক ও দমনক। তারা দুজনে ফন্দি আঁটল। দমনক বলল, ভাই, তাকিয়ে দেখ আমাদের প্রভু জল খেতে যমুনায়

নেমেছিল, খুব তেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু জল না খেয়েই ফিরে এসে বটগাছের তলায় ব্যূহরচনা করে বসে রয়েছে। কী হল বোঝা যাচ্ছে না তো?

করটক বলল, ভাই, কী দরকার ওসব ঝামেলায় গিয়ে? মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? কথায় বলে, অকারণে কোনো কিছুতে নাক গলাবে না। নইলে খোঁটা খুলে-যাওয়া বানরের মতো মরতে হবে।

অব্যাপারেষু ব্যাপারং যো নরঃ কর্তুমিচ্ছতি।
স এব নিধনং যাতি কীলোৎপাটীব বানরঃ॥

দমনক বলল, সেটা কীরকম?

বণিক-সঞ্জীবক-নন্দনক-পিঙ্গলক-দমনক-করটক এক অংশ এখানেই শেষ হল। দমনক বানরের গল্প শুনতে চাইল। করটক শুরু করল খোঁটা-খুলে-যাওয়া বানরের বিপদের গল্প। এই পশুকথার রেশ ধরে শেয়াল ও দামামা, তাঁতি ও ছুতোর, বক ও কাঁকড়া, খরগোশ ও সিংহ, উকুন ও ছারপোকা, নীলবর্ণ শেয়াল, কাক উট ও সিংহ, সাগর ও তিতির পাখি, হাঁস ও কচ্ছপ, অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি, চড়ুই কাঠঠোকরা মাছি ব্যাং ও হাতি, সিংহ শেয়াল ও উট, ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি, জীর্ণধন ও শ্রেষ্ঠী, বক ও নেউল প্রভৃতি বাইশটি লোককথা শোনানো হল। এই সব লোককথার মাঝে মাঝে দমনক-পিঙ্গলকের কাহিনিও এগিয়েছে। তারপরে মিত্রলাভ অংশের শেষে এসে প্রথম গল্পের সমাধান ঘটল।

মাঝে মাঝে প্রথম গল্পের যে উল্লেখ রয়েছে তা না জানলে শেষাংশ বোঝা যাবে না। অর্থাৎ পাঠক যে একটি তন্ত্রের প্রথম ও শেষাংশ পড়েই কাহিনিটি জেনে নেবে তার কোনো উপায় রাখেননি সম্পাদক বিষ্ণুশর্মা। পুরো তন্ত্র পড়েই কাহিনি জানতে হবে। কাহিনির জাদুকরি শক্তি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সম্পাদকের মুনশিয়ানা। বাইশটি কাহিনির মধ্যে থেকে পিঙ্গলক-দমনকের কাহিনি উদ্ধার করলে লোককথাটি হবে এইরকম:

দমনক বলল, সেটা কীরকম?

করটক বলল, আমরা গন্যিমান্যি লোক নই, পরের ব্যাপারে নাক না গলানোই ভালো।

দমনক বলল, অমন কথা বলবে না। যে লোক রাজার কাছাকাছি থাকে, সেই রাজার প্রিয়পাত্র হয়। রাজা খুশি হলে অনেক কিছু পাওয়া যায়।

করটক বলল, তা এখন তুমি কী করতে চাও?

দমনক বলল, আমাদের প্রভু পিঙ্গলক আজ ভয় পেয়েছে। তার সঙ্গের পশুরাও ভয় পেয়েছে। আমরা প্রভুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, ভয়ের কারণ কী।

করটক বলল, তা ভাই তুমি জানলে কেমন করে যে প্রভু ভয় পেয়েছে?

এ জানা আর এমন কী শক্ত? ওদের ভাবসাব দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি ওরা খুব ভয় পেয়েছে।

আচ্ছা, প্রভুর কাছে গিয়ে তুমি কী বলবে শুনি?

ভয় নেই, আমি উলটো-পালটা কিছুই বলব না। প্রভুর মন-মেজাজ বুঝে চলব।

করটক তখন বলল, তোমার পথে তুমি যাও, আমি ওর মধ্যে নেই। আমি ওদিকে মোটেই যাব না।

দমনক একাই চলল পিঙ্গলকের দিকে। দমনককে আসতে দেখে পিঙ্গলক পাহারাদারকে বলল, লাঠি সরিয়ে নাও, আমাদের বহুকালের পুরনো বন্ধু মন্ত্রীর ছেলে দমনক আসছে। ও খুব খাঁটি কথা বলে, ওকে ঢুকতে দাও।

দমনক এগিয়ে সিংহকে প্রণাম করল। সিংহ তাকে বসতে বলল। তারপরে বলল, ভালো আছো? কতকাল তোমায় দেখিনি।

দমনক বলল, আমার মতো লোককে আর কী প্রয়োজন পশুরাজ? তবে সময় হয়েছে, এখন রাজার সবাইকেই দরকার। আমরা হলাম পশুরাজের ভৃত্য, বিপদে-আপদে পশুরাজের পাশেই থাকি। বলাটা ঠিক না, তবু বলছি, মহারাজ এটা ঠিক করলেন না।

সিংহ বলল, কী বলতে চাও বলো তো তুমি? ভয় নেই, যা বলার তা বলতে পার।

সবার সামনে কি সব কথা বলতে আছে? পশুরাজের কানে একা একা কথাটা বলতে চাই।

সেই কথা শুনে বাঘ চিতা নেকড়ে আর অন্য সব পশু দূরে সরে গেল। দমনক আস্তে আস্তে বলল, জল খেতে গিয়ে ফিরে এলেন কেন?

বোকার মতো হেসে সিংহ বলল, না, তেমন কিছু না, এমনি ফিরে এলাম।

যদি বলতে না চান, তাহলে শুনতে চাই না।

সিংহ ভাবল, একে বলাই ভালো। মুখে বলল, আচ্ছা, দূর থেকে তুমি কি কোনো বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়েছ? এখনও শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি, পশুরাজ। আগেও শুনেছি।

সিংহ বলল, এ বনে আমি আর থাকতে চাই না।

কেন?

কেননা এই বনে একটা অদ্ভুত জন্তু এসেছে। ওই জন্তুই এই বিকট গর্জন করছে। যে এমনভাবে গর্জন করতে পারে, তার দেহের জোর কেমন হবে ভেবে দেখ।

শুধু গর্জন শুনেই এত ভয় পেয়ে গেলেন? এটা কিন্তু ঠিক কথা মনে হচ্ছে না। ধৈর্য ধরুন পশুরাজ, শুধু গর্জন শুনেই ভয় পাবেন না।

সিংহ বলল, বেশ, ভয় পাব না।

দমনক তখন বলল, সাহস করে আপনি এখানেই বসে থাকুন। আমি গিয়ে জেনে আসি, গর্জনটা কীসের। তারপরে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

বেশ, ওখানে গিয়ে দেখে এসো, আমি এখানেই রইলাম।

এদিকে শেয়াল সেই ষাঁড়ের কাছাকাছি গিয়ে দেখল, একটা ষাঁড় অমন করে চিৎকার করছে। তার হাসি পেল। ফন্দি আঁটল, এর সঙ্গে সিংহের ভাব করে দেবে, তারপরে বাধাবে ঝগড়া। এই ভেবে শেয়াল সিংহের কাছে ফিরে গেল। বলল, যে গর্জন করছে, তাকে আপনার ভৃত্য বানিয়ে দিতে পারি।

সিংহ বলল, তাই নাকি? তাহলে তোমায় মন্ত্রী করে দিলাম।

সিংহের কথা শুনেই শেয়াল দৌড়ল ষাঁড়ের কাছে। তাকে ভয় দেখিয়ে, সিংহের রাগের কথা মিথ্যে মিথ্যে বলে ডেকে নিয়ে চলল সিংহের কাছে। ষাঁড় ভাবল, এবার তার প্রাণ যাবে, পশুরাজ রেগেছে। কাঁপতে কাঁপতে ষাঁড় বলল, ভাই, তোমাকে দেখে তো খুব ভালো লোক বলেই মনে হচ্ছে। তা তুমি দেখ, সিংহ যেন আমার কোনো ক্ষতি না করে।

শেয়াল ষাঁড়কে মাঝপথে দাঁড় করিয়ে রেখে আবার সিংহের কাছে গেল। বলল, প্রভু, ওই জন্তুটা কিন্তু আজেবাজে এলেবেলে নয়, একেবারে শিবের ষাঁড়। শিব ওকে যমুনার তীরে কচি কচি ঘাস খেয়ে বেড়াতে বলেছেন।

সিংহ বলল, তাই বলি, দেবতার অনুগ্রহ ছাড়া কি সামান্য একটা ষাঁড় এই রকম গর্জন করতে পারে? নির্ভয়ে বনে ঘুরে বেড়াতে পারে? তা সে কী বলল?

শেয়াল বলল, প্রভু আমি বললাম চণ্ডিকার বাহন পিঙ্গলক থাকে এখানে, এটা তার রাজ্য। আপনি আমাদের অতিথি। চলুন, সিংহের সাথে একসঙ্গে ভাইয়ের মতো থাকবেন। সে-ও খুশি হয়ে রাজি হল। এখন আপনার মত চাই।

খুব ভালো কথা। আমার মনের মতো কথাই বলেছ। সত্যি, তোমার খুব বুদ্ধি। তুমি মন্ত্রী হওয়ারই যোগ্য। আমি তাকে অভয় দিচ্ছি। সে-ও যেন আমায় অভয় দেয়। যাও, তাকে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে এসো।

শেয়ালকে তখন আর দেখে কে! সে রওনা দিল। ভাবল, প্রভু মুখ তুলে চেয়েছেন, আর ভাবনা নেই। আমি ধন্য।

ষাঁড়কে শেয়াল বলল, প্রভুর কাছ থেকে তোমার জন্য অভয় চেয়ে নিয়েছি। তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমার সঙ্গে শর্ত মেনে চলতে হবে। আমি মন্ত্রী হয়ে তোমার পরামর্শ নিয়ে রাজ্য চালাব। আমায় কিন্তু কখনও হেলাফেলা করবে না। মনে থাকবে তো?

এই কথা বলে শেয়াল ষাঁড়কে নিয়ে সিংহের কাছে গেল। দুজনে পরম বন্ধু হয়ে গেল। সিংহ এই দমনক ও করটকের ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে দিল। আর সে ষাঁড়ের কাছে গল্প শুনত। কয়েক দিনের মধ্যেই সিংহ বেশ পণ্ডিত হয়ে উঠল। দুজনে একসঙ্গে থাকে। অন্যসব পশু দূরে দূরে থাকে, কাছে যাওয়ার আদেশ নেই। এমন কী দমনক করটকও সেখানে যেতে পারে না। সিংহ কেমন পোষা জন্তুর মতো হয়ে গেল। বিক্রম নেই, শিকার নেই— তাই খিদের জ্বালায় সব পশু সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

দুই শেয়াল পরামর্শ করতে লাগল। করটক দমনককে দোষ দিতে লাগল, তার জন্যেই এরকম হল। এখন দমনক এমন ফন্দি আঁটল যাতে সিংহ ও ষাঁড়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বুদ্ধি করে বন্ধুত্ব ভেঙে দিতে হবে।

সুযোগ খুঁজছে শেয়াল। একদিন দেখল, সিংহ একা রয়েছে। তার কাছে গিয়ে বলল, প্রভু, আমাকে তো আপনার কোনো দরকার নেই, তাই আসি না। কিন্তু আপনার বিপদ আছে বুঝে না এসে থাকতে পারলাম না। আতঙ্কে

বুক ফেটে যাচ্ছে। ষাঁড় আপনার অনিষ্ট করতে চায়। আমায় বিশ্বাস করে একদিন ডেকে বলল, আমি ঠিক করেছি সিংহকে মেরে ফেলব, তারপর সব পশুর রাজা হব। আর আমাকে করবে মন্ত্রী।

সিংহ প্রথমে একথা বিশ্বাস করল না। কিন্তু শেয়াল নানাভাবে সিংহকে তাতিয়ে তুলল। ষাঁড়কে মেরে ফেলতে নানা পরামর্শ দিল।

তারপর ষাঁড়ের কাছে গিয়েও বলল, সিংহ তোমাকে মেরে ফেলতে চায়। তাড়াতাড়ি তাই জানাতে এসেছি। ভীষণ রেগে গিয়েছে সিংহ।

শেষপর্যন্ত দুজনের মধ্যে এমন শত্রুতা গড়ে উঠল যে, একদিন ষাঁড় সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নেমে গেল, একটুক্ষণ যুদ্ধ করে সে সিংহের থাবার আঘাতে মরে গেল। সিংহ শোক ভুলে শেয়ালকে মন্ত্রী করে রাজত্ব করতে লাগল।

এই পশুকথাটি যেভাবে এখানে বলা হল বিষ্ণুশর্মা কিন্তু সেভাবে বলেননি। মিত্রভেদের প্রথমে গল্পটি শুরু হয়ে অন্যান্য গল্পের মাঝে মাঝে এগিয়েছে, একেবারে শেষে গিয়ে সমাধান হয়েছে। এই রীতি লোকসমাজে প্রচলিত নেই, সম্পাদনার সময় এই রীতি ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্পাদক অসংখ্য সুভাষিতের ব্যবহার করেছেন। সবগুলিই কাব্যে গ্রথিত। লোককথায় দু-চার ছত্রের ছড়া যে থাকে না তা নয়, কিন্তু সাধারণত লোককথায় এই পদ্ধতির বিশেষ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলা লোককথায় কিছু ছড়ার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নাইজিরিয়ার আদিবাসীদের মধ্যেও এই প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু এর ব্যাপক প্রয়োগ লোককথায় নেই। অন্যদিকে পঞ্চতন্ত্রের প্রতিটি কাহিনিতেই একাধিক সুভাষিত রয়েছে। এটি বিষ্ণুশর্মার আর একটি বৈশিষ্ট্য।

এই সুভাষিতগুলির মধ্যে একদিকে রয়েছে রাজনীতি কূটনীতি লোকনীতি ও জীবনে চলার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সারমর্ম আর অন্যদিকে কিছু সুভাষিততে রয়েছে উচ্চাঙ্গ দর্শনের প্রকাশ। এই দর্শন কিন্তু জীবনবিমুখতার প্রকাশ নয়, সেই দর্শন যা জীবনকে আরও অভিজ্ঞ ও আনন্দময় করে তোলে। জীবনে চলার পথে এই জটিল সংসারে মানুষকে কত বিপদ-আপদ, প্রতিকূলতার সামনে পড়তে হয়, মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে, সম্মুখের পথ যেন মনে হয় আঁধারে ঢাকা, মুক্তির পথ নেই— এরকম

মানসিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংকট থেকে বাঁচবার জন্যই যেন সুভাষিতের প্রয়োগ। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে উজ্জ্বল আলোর নিশানা। পঞ্চতন্ত্রের পাত্র-পাত্রী হয়তো কোনো জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, কোন পথে এগোলে নিজের কল্যাণ হবে বুঝতে পারছে না— তখন একটি সুভাষিত তাকে সমাধানের পথ দেখাচ্ছে। তাই সুভাষিত জানলে অনেক সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান করা যায় বলে পঞ্চতন্ত্রকার বিশ্বাস করতেন। তিনি এই জানাকে সামাজিক গুণ হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুভাষিত সম্পর্কে যে সামাজিক মানুষ অজ্ঞ তাকে ভর্ৎসনাও করেছেন।

সুভাষিতময়দ্রব্যসংগ্রহং ন করোতিঃ যঃ।
স তু প্রস্তাবযজ্ঞেসু কাং প্রদাস্যতি দক্ষিণাম্॥
সকৃদুক্তং ন গৃহ্নাতি স্বয়ং বা ন করোতি যঃ।
যস্য সম্পুটিকা নাস্তি কুতস্তস্য সুভাষিতম্॥

এই সুভাষিত কখনও বলা হয়েছে খুব হালকাভাবে, শুনে হাসি পায়। আবার কখনও বলা হয়েছে গভীর দার্শনিক ভঙ্গিতে।

লোককথার মধ্যে কিংবদন্তি ও লোকপুরাণ অংশে কিছু কিছু ব্যক্তিনাম ও স্থাননাম থাকে। কিন্তু পশুকথা-রূপকথায় সাধারণত কোনো নাম থাকে না। এক যে ছিল রাজা, কোনো এক বনে থাকত এক সিংহ— এইরকমভাবেই পশুকথা-রূপকথা বলা হয়। লোকসমাজ থেকে যে হাজার হাজার পশুকথা রূপকথা সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে কোথাও এই নাম ব্যবহৃত হয়নি। পঞ্চতন্ত্রে রয়েছে অধিকাংশই পশুকথা, অল্প রূপকথা, তবু প্রায় প্রতিটি আখ্যানেই ব্যক্তিনাম ও স্থাননাম রয়েছে। পশুকথা-রূপকথাগুলি লোকসমাজ থেকে সংগৃহীত হলেও এগুলিকে সম্পাদনা করার সময় বিষ্ণুশর্মা নাম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সমস্ত নামই পাত্র-পাত্রীর গুণবাচক। অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষের কাব্য-সাহিত্যে এই গুণবাচক নামেরই আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, গুড়াকেশ, কৃষ্ণ, ভীম, ভীষ্ম, দুঃশাসন, সুগ্রীব প্রভৃতি। পঞ্চতন্ত্রেও এই গুণবাচক নামের ছড়াছড়ি। অনেক সময় এমন নাম ব্যবহৃত হয়েছে যা কোনোভাবেই কারও ব্যক্তিনাম হতে পারে না। পিতা কখনও তার সন্তানের নাম পাপবুদ্ধি রাখতে পারেন না। নামগুলো উচ্চারণ করলেই বোঝা যাবে নামগুলি রাখার পিছনে সম্পাদকের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। অর্থাৎ নামের মধ্যেই তার চারিত্রিক

স্বভাব বা গুণের পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে। যেমন, অমরশক্তি, উগ্রশক্তি, সঞ্জীবক, ধর্মবুদ্ধি, চণ্ডরব, মদোৎকট, কম্বুগ্রীব, অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি, যদ্‌ভবিষ্য, বজ্রদ্রংষ্ট্র, চতুরক, সূচিমুখ, লঘুপতনক হিরণ্যক, তীক্ষ্ণবিষাণ, প্রলোভক, অরিমর্দন, চতুর্দন্ত, অতিদর্প, খরনখর, রক্তমুখ, করালকেশর, ধূসরক, কামাতুর, মন্দমতি প্রভৃতি।

পঞ্চতন্ত্র সম্পাদনা করবার সময়ে বিষ্ণুশর্মা তৎকালীন সমাজ-ভাবনার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। নারীর ব্যভিচার সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রে কয়েকটি কাহিনি আছে। লোকপুরাণ অংশে নারী-পুরুষের ব্যভিচার সম্পর্কে অনেক কাহিনি রয়েছে বিশেষ করে ভারতবর্ষ গ্রিস রোম মিশর ও প্রশান্ত মহসাগরীয় বলয়ে। কিন্তু লোককথার অন্য অংশে নারীর এই বিকৃতি সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখ দেখতে পাই না। সেখানে সৎ মায়ের নিষ্ঠুরতা কিংবা ছোট রানি বা অন্য একজন রানির নির্মম হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তার বেশি কিছু নয়। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে মিশরের রূপকথাটিতে নারীর ব্যভিচারের কথা রয়েছে। কিন্তু এগুলো ব্যতিক্রম।

বিষ্ণুশর্মা মনুসংহিতা ও কিছু স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভাবে নারী সম্পর্কে কদর্য ইঙ্গিত দিয়েছেন, অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন। নারী তো একা ব্যভিচারিণী হতে পারে না, তার জন্য আর একজন ব্যভিচারী পুরুষ দরকার। কিন্তু বিষ্ণুশর্মা সেই পুরুষের বিকৃতি সম্পর্কে কোনো উক্তি করেননি। সেকালের সমাজের মানসিকতাই তাই ছিল। নইলে ভীষ্মের মতো প্রাজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কেমন করে মহাভারতের স্ত্রীপর্বে নারী সম্পর্কে অমন অপমানকর উক্তি করলেন? বিষ্ণুশর্মা নারীর ব্যভিচারের গল্প বললেন, সেটাও মেনে নেওয়া যায়। কেননা, একজন বিশেষ নারী ব্যভিচারিণী হতেই পারে, তিনি তারই কাহিনি শুনিয়েছেন। কিন্তু সেই গল্পের মাঝখানে তিনি সুভাষিত অংশে সমগ্র নারীজাতির বিরুদ্ধেই সাধারণভাবে এই উক্তি করে বসলেন। লোককথার ঐতিহ্য থেকে তিনি সরে এলেন। এই মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে সম্পাদকের।

দন্তিল ও গোরম্ভ নামে মিত্রভেদের তৃতীয় গল্পে বিষ্ণুশর্মা বলেছেন, আগুনে যতই কাঠ দাও, আগুন আরও আরও কাঠ চায়, হাজার নদী মিশে যাক সাগরে তবু সাগরের তৃপ্তি নেই— তেমনি নান্তকঃ সর্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা, সমস্ত প্রাণীকে খেয়েও যেমন অন্তক অর্থাৎ যম চির-অতৃপ্ত থাকে, যতই পুরুষ-সংসর্গ ঘটুক না কেন নারীর তৃপ্তি নেই। নারী সতী হয়

বাধ্য হয়ে, সুযোগ পেলেই সে হবে অসতী। সুযোগের অভাবে, প্রার্থীর অভাবে এবং নিভৃত স্থানের অভাবেই নারী সতী সেজে থাকে। কোনো নারী কোনো পুরুষকেই ভালোবাসে না। স্বামীর কাছাকাছি থাকলেও মনে মনে ধ্যান করে অন্য পুরুষের। সামান্য তোয়াজ করলেই নারী প্রেমে পড়ে। নারীর কোনো সীমাজ্ঞান নেই। আত্মীয়-পরিজনের ভয়েই নারী সংযত থাকতে বাধ্য হয়। তারা যে কোনো পুরুষের সঙ্গেই ব্যভিচার করতে পারে, কুৎসিত রূপবান বৃদ্ধ অর্থাৎ পুরুষ হলেই হল। প্রেমিক পুরুষকে নিয়ে মজা করতে নারীরা খুব পারঙ্গম, তাদের নিয়ে খেলা করতে তাদের খুব আনন্দ। লোকসমাজ তাদের মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে কোনোভাবেই নারী সম্পর্কে এ ধরনের মানসিকতার প্রকাশ ঘটাননি। এসব মনু-ভীষ্মের উক্তির প্রতিধ্বনি যেন।

সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুজন দুষ্টার কাহিনিতে আবার বলা হয়েছে, সব নারী জাদু জানে। দরকারমতো এরা পুরুষকে হাত করে। নারীর প্রতি বেশি আসক্ত হতে নেই, নারীর বুদ্ধি নিতে নেই। কেননা, মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হৃদয়ে হালহলং মহদ্বিষম্। ছলনা বোকামি অতিলোভ অসাধুতা নির্মমতা মিথ্যাচার দুঃসাহস প্রভৃতি দোষ নারীর স্বভাবের মধ্যেই থাকে।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী গল্পে এক পুংশ্চলী স্ত্রীর কথা আছে। দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে সে প্রার্থনা করেছিল, তার স্বামী যেন অন্ধ হয়ে যায়, কী করলে অন্ধ হবে তার পদ্ধতিও জানতে চেয়েছিল। স্বামী অন্ধ হয়ে গেলে সে অন্য পুরুষের সঙ্গে নিশ্চিন্তে মিলিত হতে পারবে। নারীর নির্মম স্বভাবের অমানবিক দিকটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

বোকা ছুতোর গল্পে অবশ্য বিষ্ণুশর্মা পরাশর-ব্যাস-বেদ-কুরুবংশ-পাণ্ডব প্রভৃতির উল্লেখ করে বেশ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে নারীর ব্যভিচারের আরও বীভৎস উলঙ্গ প্রকাশ দেখিয়েছেন বিষ্ণুশর্মা। একজন কাম-আসক্তা নারী লজ্জাহীনতার শেষস্তরে না নামলে এ ধরনের আচরণ করতে পারে না। অবশ্য কাহিনিটি বলা হয়েছে খুব লঘু চালে, পাঠক বেশ কৌতুক উপভোগ করেন।

এক ছিল ছুতোর। তার বউয়ের স্বভাব-চরিত্র মোটেই ভালো ছিল না। নানা লোকে নানা কথা বলত। ছুতোর ভাবল, বউকে পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু পরীক্ষা করবে কেমন করে?

এইখানে বিষ্ণুশর্মা কিছু দর্শনিক কথা বলেছেন, সুভাষিত লিখেছেন। তিনি বলেছেন, নদী বংশ সাধুপুরষ ও মেয়েদের পাপাচরণ পরীক্ষা করতে নেই। পাণ্ডবদের জন্মরহস্য জানতে চাওয়া উচিত নয়, কেননা তারা ক্ষেত্রজ। শুধু কি তারা?

বসোবীর্যোৎপন্নামভজত মুনির্মৎস্যতনায়াং
তথা জাতো ব্যাসঃ শতগুণনিবাসঃ কিমপরম্।
স্বয়ং বেদান ব্যস্যঞ্ছমিতকুরুবংশপ্রসবিতা
স এবাভুচ্ছ্রীমানহহ বিষমাঃ কর্মগতয়ঃ॥

এর পরেই সমগ্র নারীজাতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আগুন যদি শীতল হত, চাঁদ যদি উত্তপ্ত হত, দুর্জন মানুষ যদি হিতৈষী হত, তবেই নারীরা হত সতী। সবগুলি বিশেষণই অসম্ভব। নারীর সতীত্ব অসম্ভব।

যদি স্যাৎ পাবকঃ শীতঃ প্রোষ্ণো বা শশলাঞ্ছনঃ।
স্ত্রীণাং তদা সতীত্বং স্যাদ্ যদি সাদুর্জনো হিতঃ॥

আবার ছুতোরের কাহিনি শুরু হল।

ছুতোর ঠিক করল, সে বউকে পরীক্ষাই করবে। এই না ভেবে সে বউকে বলল, সকালে আমি অনেক দূরের গাঁয়ে যাব। সেখানে আমাকে কয়েকদিন থাকতে হবে। বেশি করে খাবার দিয়ো, লাগবে।

এই কথা শুনে বউ মনে মনে খুব খুশি হল। ভালো করে খাবার বানিয়ে দিল। ভোরবেলা উঠে ছুতোর বাড়ি থেকে রওনা দিল। একটু পরেই বউ তার প্রেমিকের বাড়ি গিয়ে বলল, ও দূর গাঁয়ে চলে গিয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাত্তিরে আমার বাড়িতে আসবে।

ছুতোর সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরে সন্ধেবেলা অন্য দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকে ঘরে খাটের তলায় লুকিয়ে থাকল।

রাত্তিরে প্রেমিক এসে খাটের ওপরে বসল। খাটের নীচে ছুতোর রাগে ফুঁসতে লাগল। ভাবল, দুজনে যখন খাটের ওপরে একসঙ্গে ঘুমোবে তখন দুজনকেই কেটে ফেলব।

বউ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। খাটে উঠতে যাবে, এমন সময় ছুতোরের গায়ে তার পা লেগে গেল। বুঝতে পারল, ছুতোর নীচে লুকিয়ে রয়েছে।

খাটে বসে বউ বলল, আমাকে ছোঁবেন না, কেননা আমি সতী নারী, আমি পতিব্রতা। যদি কিছু করেন তবে শাপ দিয়ে ভস্ম করে দেব।

তাহলে আমাকে ডেকে আনলে কেন?

বউ বলল, আজ সকালে চণ্ডীমন্দিরে গিয়েছিলাম। মা চণ্ডী বললেন, ছুতোর বউ, তুই আমার ভক্ত, কিন্তু কিছু করার নেই মা, ছ'মাসের মধ্যেই তুই বিধবা হবি। তোর বিধিলিপি।

আমি বললাম, তুমি আমায় এই বিপদ থেকে বাঁচাও। তুমি সব পার। একটা উপায় বলো, যাতে আমার স্বামীর একশো বছর আয়ু হয়। তখন মা চণ্ডী বললেন, একটা উপায় আছে। যদি আজকে পরপুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে বিছানায় থাক, তবে স্বামীর বিপদ কাটবে। সেই বিপদ গিয়ে পড়বে পরপুরুষের ওপরে। তাই আমি আপনাকে আমার ঘরে ডেকে এনেছি। তাই যা করতে মন চায় করুন। দেবীর কথা মিথ্যে হবে না।

এই কথা শুনে ছুতোর আনন্দে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল। বলল, আঃ, তুমি সত্যিকারের সতী। আমার জন্য তুমি এত করছ? আর আমি কিনা নানা লোকের কথায় তোমায় সন্দেহ করেছিলাম? আর ভাই তুমি তো মহান মানুষ, অনেক পুণ্য করেছিলাম তাই তুমি আমার ঘরে আজকে এসেছ। তোমার দয়ায় আমি একশো বছর পরমায়ু পেলাম।

ছুতোর আনন্দে নাচতে লাগল।

এই ক'টি লোককথা ঠিক পঞ্চতন্ত্রের মেজাজের সঙ্গে মেলে না। আনুমানিক দ্বাদশ শতকের শুকসপ্ততির কাহিনি হলে সামঞ্জস্য থাকত। আর শুকসপ্ততির দুটি কাহিনির সঙ্গে এর আশ্চর্য মিলও রয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের যে উদ্দেশ্য তার সঙ্গেও এই ধরনের গল্পের বিশেষ কোনো মিল নেই। মনে হয় যেন আরোপিত। প্রমাণ করবার উপায় নেই, কিন্তু সন্দেহ জাগে এই গল্পগুলি কি পঞ্চতন্ত্রের আদি সংকলকের? না পরবর্তীকালের কোনো কথক এগুলি পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়েছেন। এই গল্পগুলির মধ্যে লোকশিক্ষারও তেমন কোনো উপাদান নেই। অথচ পঞ্চতন্ত্রে লোকশিক্ষার বিষয়টিকে বারবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

লোকসমাজের মৌখিক সম্পদকে সংকলন করে সম্পাদনা করবার সময় এই ধরনের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন বিষ্ণুশর্মা, কিন্তু তবুও পঞ্চতন্ত্র মূলত লোককথার এক অনন্য উজ্জ্বল সংগ্রহগ্রন্থ।

উইলিয়াম নরম্যান ব্রাউন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'জার্নাল অব আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি' পত্রিকায় 'দ্য পঞ্চতন্ত্র ইন মডার্ন ইন্ডিয়ান ফোকলোর' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের লোককথা সংগ্রহগুলির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে ব্রাউন দেখান, পঞ্চতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য লোককথা কীভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় লোকসমাজে। যাদের কাছ থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল তারা নিরক্ষর গ্রামবাসী, অনেকেই গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে যাননি, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না, বৃহত্তর জনজীবনের ঢেউ তাদের প্রভাবিত করেনি। এইসব গ্রামীণ মানুষের মধ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকও রয়েছেন যারা ছিলেন আরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সংস্কৃত পুথি পঞ্চতন্ত্র তাদের নাগালের বাইরে ছিল, কথকের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ারও কোনো সুযোগ ছিল না। এই সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়, পঞ্চতন্ত্রের লোককথাগুলি প্রাচীন কাল থেকেই লোকসমাজে প্রচারিত ছিল— বিষ্ণুশর্মা সেগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। মৌখিক ঐতিহ্যের পথ বেয়ে আজও নিরক্ষর বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ মানুষের মধ্যে এইসব গল্প শুনতে পাওয়া যাবে। সংহত জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সহজে ভুলে যান না।

পঞ্চতন্ত্রে পশুকথা

পঞ্চতন্ত্রের ৮৪টি লোককথার অর্ধেক হল পশুকথা। সংকলক নীতিশিক্ষার জন্যই গল্পগুলো বেছেছিলেন। আর পশুকথাই হল নীতিশিক্ষার সবচেয়ে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী মাধ্যম। শিশুমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল বিষ্ণুশর্মার, তাই তিনি এই সঠিক সংকলন করতে পেরেছিলেন।

পঞ্চতন্ত্রের মিত্রভেদ-এ ১৭টি, মিত্রপ্রাপ্তি-তে ৪টি, কাকোলূকীয়-তে ১০টি, লব্ধপ্রণাশ-এ ৮টি এবং অপরীক্ষিত-কারক-এ ৩টি পশুকথা রয়েছে। এই ৪২টি পশুকথা রূপ-রীতি-পাত্র-পাত্রীতে নিটোল পশুকথা। অন্যান্য লোককথায়ও অসংখ্য পশুচরিত্র এসেছে, কিন্তু সেখানে মানুষ ও পশুচরিত্র মিলিতভাবে রয়েছে। পশুকথার মেজাজ সেখানেও লক্ষ্য করা যাবে।

পঞ্চতন্ত্রের পশুকথার একটি বিশেষত্ব রয়েছে, ঈশপের পশুকথার সঙ্গে এই বিষয়ে পঞ্চতন্ত্রের মৌলিক তফাত ঘটে গিয়েছে। সংকলক

হিসেবে এখানে বিষ্ণুশর্মা আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। অবশ্য, একথাও মনে রাখতে হবে, ভারতীয় উপ-মহাদেশের পশুকথায় এই বিশেষ গুণটি সার্বিকভাবেই লক্ষ করা যায়।

ঈশপের পশুরা নিতান্তই পশু— দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। তারা পশুর মতোই স্বাভাবিক আচরণ করে। এদের কথা ও আচরণের মধ্যে পশুপাখির চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রে সমস্ত পশুপাখি মানুষের চরিত্রের প্রতীক ও রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। হর্‌ন্‌স্টেইন সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন, The animals have all the characteristics of men— even studying the Vedas and indulging in religious disputes. Their conduct and experiences are used to point morals, both private and political.

পঞ্চতন্ত্রে কয়েকটি পশুকথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মিত্রভেদ-এর 'বানরের দল ও সূচিমুখ' পশুকথা এবং লব্ধপ্রণাশ-এর 'বানর ও চড়ুই বউ', মিত্রভেদ-এর 'সিংহ উট ও কাক' পশুকথা এবং 'সিংহ শেয়াল ও উট'; মিত্রভেদ-এর 'অনাগতবিধাতা' পশুকথা এবং অপরীক্ষিত-কারক-এর 'শতবুদ্ধি' প্রায় একই ধরনের কাহিনি— নীতিকথা ও কাহিনিবিন্যাসে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

পঞ্চতন্ত্রের 'কথামুখম্'-এর পরেই শুরু হয়েছে মিত্রভেদ তন্ত্র। মিত্রভেদ-এর ভূমিকার কাহিনিটি বণিক-সঞ্জীবক-পিঙ্গলক-করটক-দমনকের কাহিনি। কিন্তু তন্ত্রটির প্রথম শ্লোকটি পশুকে ঘিরে, কাহিনিটি সঞ্জীবক-পিঙ্গলককে ঘিরে।

বর্ধমানো মহান্ স্নেহঃ সিংহগোবৃষয়োর্বনে।
পিশুনেনাতিলব্ধেন জম্বুকেন বিনাশিতঃ॥

ভূমিকার পরে যে প্রথম কাহিনি শুরু হল সেটিও পশুকথা, খোঁটা-খুলে-যাওয়া বানরের গল্প।

পঞ্চতন্ত্রের শেষ তন্ত্র অপরীক্ষিত-কারকও শেষ হয়েছে কাঁকড়া-সাপ পশুকে দিয়ে। পঞ্চতন্ত্রের শেষ শ্লোকটিও পশুকে নিয়ে,

অপি কাপুরুষো মার্গে দ্বিতীয়ঃ ক্ষেমকারকঃ।
কর্কটেন দ্বিতীয়েন জীবিতং পরিরক্ষিতম্॥

পঞ্চতন্ত্রের অনেক পশুকথায় গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে। অহিংসার জয়, অহিংসা নিয়ে বাড়াবাড়ি, স্বদেশানুরক্তি, কূপমণ্ডূকতা প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে পশুকথার মাধ্যমে।

বিদেশ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা ও স্বদেশভূমির প্রতি আকর্ষণের হেতু সম্পর্কে একটি সুন্দর পশুকথা রয়েছে পঞ্চতন্ত্রে। পশুকথাটির অনুভূতি আজও সমানভাবে সত্য। চিরকালীন আবেদন থাকে বলেই লোককথা আন্তর্জাতিক ও সর্বজনীন মানসিকতার প্রতিভূ হয়ে ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকে।

এক যে ছিল কুকুর। সে যেখানে থাকত, সেই এলাকায় একবার দেখা দিল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। খাবার নেই, খিদের জ্বালায় সবাই শুকিয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন ধরে চলল সেই দুর্ভিক্ষ। আর তো পারা যায় না! এমন সময় কুকুর শুনল, ওই অনেক দূরের দেশে কোনো অভাব নেই, প্রচুর খাবার সেখানে। এমনিতেই গলা শুকিয়ে রয়েছে কুকুরের, পেট গিয়েছে ঢুকে। আর সেই দূর দেশের কথা শুনে তার খিদে গেল আরও বেড়ে। কুকুর রওনা দিল দূর দেশের পথে।

মস্ত শহর। অনেক বাড়ি, অনেক লোক-জন। না, যা শুনেছে তা মিথ্যে নয়— প্রচুর খাবার। কুকুর ঠাঁই পেল এক বাড়িতে। তাদের ফেলে-দেওয়া খাবার খেয়ে দিব্যি দিনরাত কাটছে তার। অল্প দিনের মধ্যেই কুকুর বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠল।

কিন্তু একটা বিপদ। বাড়ির বাইরে গেলেই অন্য কুকুর তাকে তাড়া করত, বাগে পেলে কামড়ে দিত, কখনও কখনও বেকায়দায় পড়ে গিয়ে সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। অথচ বাড়ির মধ্যেই কি সবসময় থাকা যায়? বন্দি জীবন কি আর ভালো লাগে?

এমনি করে কিছুদিন কাটল। শেষকালে কুকুর ভাবল, অনেক হয়েছে, আর নয়। আমার স্বদেশই ভালো, দুর্ভিক্ষ হোক, কষ্ট হোক— তবু নিশ্চিন্তে তো থাকতে পারব। এত আতঙ্ক আর ভালো লাগে না। সেখানে আর যাই হোক কেউ রক্ত ঝরায় না। আমি দেশেই ফিরে যাব।

দেশে ফিরে এল সেই কুকুর। বিদেশ থেকে ফিরেছে কুকুর— আত্মীয়রা আপনজনকে জিজ্ঞেস করল, বিদেশের গল্প বলো। দেশটা

কেমন? মানুষজন কী করে? তাদের খাওয়া-দাওয়া কেমন? আচার-ব্যবহার কেমন? নতুন দেশ, খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

কুকুর আস্তে আস্তে বলল, সে দেশের কথা আর কী বলব!

সুভক্ষ্যাণি বিচিত্রাণি শিথিলাশ্চৈব যোষিতঃ।
একো দোষো বিদেশস্য স্বজাতির্যদ্ বিরুধ্যতে॥

বিদেশে স্বজাতিই হল শত্রু— ঈর্ষাই কি এর কারণ? এ অভিজ্ঞতা পঞ্চম শতাব্দীর, এ অভিজ্ঞতা একবিংশ শতাব্দীর।

পঞ্চতন্ত্রের লোককথাগুলির অন্তর্নিহিত ভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ গল্পেই ফুটে উঠেছে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের হাহাকার-বেদনা-তিক্ততা-ব্যর্থতা-কান্না-প্রতিকূল জীবনসংগ্রাম-প্রতিরোধ ও অসহায়তা। এসব অভিজ্ঞতা তো লোকসমাজ ছাড়া অন্য কোনো সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়! নীলবর্ণ শৃগাল, তিনটি মাছের কাহিনি, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, সিংহচর্মাবৃত গাধা, বিশ্বস্ত বেজি, দুমুখো পাখি, সহস্রবুদ্ধির বিপদ, বোকা হাতি, শেয়ালছানার বড়াই, সমুদ্র-শাসন প্রভৃতি নীতিকথার অন্তর্নিহিত বক্তব্যই প্রমাণ করবে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনিগুলির প্রকৃত উৎসস্থান কোথায়?

পিলপের নীতিকথা

পিলপে নামটির মধ্যে রহস্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রই বিদেশে পিলপের নামে প্রচারিত হয়েছে। এ নাম সংস্কৃত ভাষায় নেই। বিদ্যাপতি— বিদপাই— পিলপে এইরকম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। হতে পারে, কিন্তু এর পেছনে কিছুটা কষ্টকল্পনা রয়েছে। নামের রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

অথচ পিলপের নামে যে নীতিকথা আরব-দুনিয়া ও ইউরোপে প্রচারিত হয়েছিল, তার অনেক কাহিনি রয়েছে পঞ্চতন্ত্রে। আবার এমন এমন অনেক কাহিনি রয়েছে যা পঞ্চতন্ত্রে নেই। পঞ্চতন্ত্রে কাহিনিগুলো যেমন একটি মালায় গাঁথা রয়েছে, পিলপের নীতিকথায়ও সেইভাবে আছে, যদিও কথামুখটির সঙ্গে কোনো মিল নেই। সেখানে রয়েছে অন্য একটি স্বতন্ত্র কাহিনি।

প্রাচীন ভারতবর্ষে কোনো কাব্য-পুরাণ জনপ্রিয় হলে তার অনুসরণে একই ধরনের অনেক কাব্য-পুরাণ লিখিত হত। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের জনপ্রিয়তার কারণে যেমন হিতোপদেশ রচিত হয়েছিল। মনে হয়, পঞ্চতন্ত্রের আদর্শে পিলপের নীতিকথা লিখিত হয়। তবে এর প্রচার বেশি হয়েছিল ভারতবর্ষের বাইরে। আর অন্য ভাষীদের উচ্চারণে সংস্কৃত নামটি বিকৃত হয়ে পিলপে হয়ে যায়। এত বেশি পরিমাণে বিকৃত হয় যে আজ আর আসল নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এটাও অনুমান। কিন্তু কিছু লোককথা অন্য কোনো লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই পিলপের নীতিকথা সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করতে হচ্ছে।

পিলপের নীতিকথাকে ঘিরে একটি 'ঐতিহাসিক' কাহিনি রয়েছে। পারস্যের বাদশাহ ছিলেন নাসিরবান। তিনি পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ। পিলপের নীতিকথার নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। বাদশাহের ইচ্ছে হল, তিনিও সেগুলি পড়বেন। এক সভাসদকে পাঠালেন ভারতবর্ষে। তিনি এই নীতিকথার পুথি সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন পারস্যে। কিন্তু সভাসদ ভারতবর্ষে এসে দেখলেন, পুথি নিয়ে যাওয়া বড় সহজ নয়। ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল ও ঈর্ষাপরায়ণ। তাদের ঐতিহ্য অন্য দেশে চলে যাবে কিংবা অন্য ভাষায় অনূদিত হবে এটা তারা সহজে ঘটতে দিতে চান না। কিন্তু সভাসদ এসেছেন সুদূর পারস্য থেকে, বাদশাহের আদেশ বহন করতে। তিনিও সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সভাসদ এমন একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন যার কাছে অনেক মানুষই নত হতে বাধ্য, রক্ষণশীলতাও সেখানে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তিনি প্রভূত অর্থ-সম্পদ উৎকোচ দিলেন। কাজ হল। অন্য কেউ জানল না, একজনকে বশ করে গোপনে তিনি সেই পুথি নিয়ে পাড়ি দিলেন পারস্যে। এর পরেই মধ্যপ্রাচ্যের বহু ভাষায় সেই নীতিকথা অনূদিত হল আর সেখান থেকে ইউরোপে।

এই কাহিনির মধ্যে কিছুটা নাটকীয়তা থাকলেও পঞ্চতন্ত্রের বিশ্বজয়ের সঙ্গে এই কাহিনির মিল রয়েছে। ইউরোপের পণ্ডিতেরা একসময় বলতেন, বাইবেল ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ নাকি পিলপের নীতিকথার মতো প্রচারিত হয়নি। এতেই সন্দেহ হয় পিলপের নীতিকথা নামে যা প্রচারিত হয়েছিল আসলে তা পঞ্চতন্ত্র।

আবার সন্দেহও জাগে এর কথামুখের কাহিনিতে। এক রাজা স্বপ্নে দেখলেন, ঐ বিশেষ স্থানে গুপ্তধন লুকনো রয়েছে। সেই গুপ্তধনের মধ্যে তিনি পেলেন মণি-মুক্তোখচিত একটি কৌটো। তার মধ্যে রয়েছে এক টুকরো রেশমি কাপড়, তার ওপরে লেখা কিছু বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানগর্ভ প্রবাদবাক্য। এই প্রবাদবাক্যগুলির রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তার নাম পিলপে। প্রবাদগুলি ব্যাখ্যা করবার জন্যই পিলপেকে কাহিনির মালা গাঁথতে হল। অসংখ্য কাহিনি বলে চললেন পিলপে। এই কথামুখের সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের কোনো মিল নেই। তবে পিলপের নীতিকথা যে পঞ্চতন্ত্রের সময়সীমায় রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ মিলেছে পারস্যের বাদশাহের প্রাসঙ্গিক নাম-ব্যবহারে।

পিলপের নীতিকথার একটি মৌলিক শিক্ষা হল: ভালোবাসাই শক্তির উৎস। এই নীতিকথাগুলি খুব সংক্ষিপ্ত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বাক্য নেই, কাহিনি-বিন্যাসে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়নি, সব পাত্র-পাত্রীর কথাবার্তা আচার-আচরণ সাদামাঠা। কিন্তু নীতিশিক্ষার বিষয়টি কোনোভাবেই উপেক্ষা করা হয়নি। এমন কোনো নীতিকথা নেই যা স্পষ্টভাবে লোকশিক্ষা দেয় না। গ্রন্থটির উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ। সব গল্পই লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত, সম্পাদক শুধু কাহিনির মালাটি গেঁথেছেন।

পিলপের নীতিকথার কয়েকটি উজ্জ্বল দীপ্ত দৃষ্টান্ত পাঠককে বিস্মিত করে। সরাসরি গল্প বলবার ভঙ্গি পিলপের বৈশিষ্ট্য। কোনো ভণিতা নেই। লোকসমাজের ভঙ্গিটি পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে।

বাজপাখি ও মুরগি। একদিন এক বাজপাখি এক মুরগিকে বলল, তোমরা বড় অকৃতজ্ঞ, উপকার স্বীকার কর না। তোমাদের কত ভালো ভালো খাবার দেওয়া হয়, থাকতে দেওয়া হয় কত সুন্দর ঘরে। শেয়াল যাতে রাতের আঁধারে তোমাদের মেরে ফেলতে না পারে তার জন্য প্রভু তোমাদের ঘরকে মজবুত করে গড়েছে। আর প্রভু যখন তোমাদের ধরতে যায়, আদর করতে চায় তখন তোমরা ডাক ছেড়ে ছুটে পালাও। আর দেখ, তোমাদের মতো এত সুযোগ আমি পাই না। তবুও মনিব যখন আমাকে ধরে, আদর করে, তখন আমি পালাই না, আদর নিই। বনে-জঙ্গলে-মাঠে শিকারের সময় আমি তাই প্রভুকে সাহায্য করি। তোমরা এমন কর কেন?

গলা নিচু করে মুরগি বলল, তুমি ভাই যা বললে তা খুব সত্যি। সত্যি কথাই বলেছ। কিন্তু বন্ধু, মনে করে দেখ তো, তুমি কোনোদিন আগুনের মধ্যে ঝলসানো বাজপাখি দেখেছ কি না। আমরা যে নিত্যিদিন অনেক অনেক মুরগিকে আগুনে ঝলসাতে দেখেছি।

এই লোককথাটি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও পাওয়া গিয়েছে।

দয়ালু রাজা। এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব নিষ্ঠুর । একদিন ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন, বনের একটা শেয়াল তাড়া করেছে একটা মুরগিকে। ঠিক সেই সময়ে একটা কুকুর তাড়া করল সেই শেয়ালকে, কামড়ে ধরল শেয়ালের পেছনের পা। শেয়াল কোনোরকমে বেঁচে গেল, কিন্তু খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। তার গর্তে ঢুকে গেল। কুকুর অন্য পথে হাঁটা দিল। এমন সময় একটা লোক কুকুরকে দেখতে পেয়ে পাথর ছুড়ল, পাথর লাগল কুকুরের মাথায়, মাথা গেল ফেটে। এমন সময় সেখান দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল একটা ঘোড়া, মানুষটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল, মাড়িয়ে দিল মানুষটার পা। একটু পরেই ঘোড়ার পা পড়ল একটা পাথরের ওপরে, পিছলে গেল পেছনের পা, ঘোড়ার পা গেল ভেঙে।

রাজা বলে উঠলেন, হায়! এসব ঘটল যেন আমায় শিক্ষা দিতে। বুঝতে পারলাম, তাদের কপালেই বিপদ ঘটে যারা অন্যের ক্ষতি করে।

সেইদিন থেকে রাজা খুব দয়ালু হয়ে গেলেন, মানুষের ওপর আর অত্যাচার করতেন না। সব মানুষকে ভালোবাসতেন।

বাঘের মুখে কালো কালো দাগ কেন। এক বনে গাছের নীচে বসে ছিল এক খরগোশ। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক বাঘ। তাকে বসে থাকতে দেখে বাঘ বলল, এখানে বসে বসে কী করছ?

খরগোশ বলল, দাদুর ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছি, বসে রয়েছি কেউ যাতে চুরি করে পালাতে না পারে।

বাঘ বলল, কোথায় সেটা?

ওই ওপরে, খরগোশ চোখ তুলে পাশের একটা গাছের ডাল দেখিয়ে দিল। সেখানে ঝুলে রয়েছে লম্বা-মতন কালো একটা কী যেন।

খরগোশ বাঘের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার যদি ইচ্ছে করে তবে ঘণ্টাটা বাজাতে পার। কী সুন্দর যে শব্দ হয়! কিন্তু ঘণ্টা বাজাবার আগে

আমাকে দূরে সরে যেতে হবে। বাব্বাঃ, যা শব্দ হয় না! কানে তালা লেগে যায়, চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।

বাঘের খুব ইচ্ছে হল, ঘণ্টাটা একবার বাজিয়ে দেখে। বাঘ উঠছে গাছে। খরগোশ লাফিয়ে লাফিয়ে অনেক দূরে চলে গেল। বাঘ পেছন ফিরে দেখল, খরগোশকে আর দেখা যাচ্ছে না। বাঘ ঘণ্টার কাছে গিয়ে সামনের ডানদিকের থাবা তুলল। গায়ের জোরে থাবা বসাল সেই ঘণ্টায়। ঘণ্টা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। ওটা তো আর ঘণ্টা ছিল না। ছিল একটা মৌচাক। শত শত মৌমাছি বাঘকে ঘিরে ধরল, কামড়াতে লাগল, মুখেই বেশি হুল ফোটাল। বাঘ ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে প্রায় পড়েই গেল গাছের নীচে।

বাঘের মুখে মৌমাছির কামড়ে কালো কালো দাগ হয়ে গেল। সেইদিন থেকেই সব বাঘের মুখে অমন কালো কালো দাগ।

ভারতের টোডা, মারিয়া, ভিল ও ধোবা আদিবাসীদের খুব প্রিয় পশুকথা।

ভারতীয় লোকসমাজে পরিকথার সন্ধান খুব বেশি পাওয়া যায় না, যেমন পাওয়া যায় ইউরোপে। পিলপের নীতিকথায় একটি পরিকথা রয়েছে।

গাছে গাছে থাকত পরিরা। কিন্তু রোদে-বৃষ্টিতে বড়ই কষ্ট। তাই তারা ঠিক করল, তারা গাছে বাসা বানাবে। কয়েকটি পরি গেল গভীর বনে, শক্ত-মজবুত গাছ দেখে সেখানেই গাছের ডালে বাসা তৈরি করল।

কয়েকটি পরি বলল,গভীর বনে যেতে যাব কেন? গাঁয়ের পাশে ফাঁকা মাঠে ওই যে একটা গাছ রয়েছে, ওখানেই বাসা বাঁধব। গাঁয়ের লোক খেতে-পরতেও দেবে।

এক রাতে শুরু হল ভীষণ ঝড়। হাওয়ার দাপটে সব যেন ওলটপালট হয়ে যেতে লাগল। গাঁয়ের পাশে ফাঁকা মাঠের মধ্যে গাছ গেল উপড়ে, পরিদের বাসা গেল ভেঙে, তারা হল গৃহহীন।

ঘন বনের মধ্যে ঝড় তেমন সুবিধে করতে পারল না, গাছে-গাছে হাওয়া বাধা পেল। বনের পরিদের বাসা গেল বেঁচে। তারা গৃহহীন হল না।

তারা বলল, সবার উচিত বনভূমির মতো একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা, একা থাকলেই বিপদ। তোমরা ছিলে একটা গাছের বাসায়, একা গাছ বিপদ

রুখতে পারল না, উপড়ে গেল। একা থাকতে নেই, তাতে শক্তি কমে। সবাই একসঙ্গে থাকলে শক্তি বাড়ে।

পিলপের নীতিকথার মূল শিক্ষা হল, ভালোবাসাই শক্তির উৎস, বন্ধুত্ব শক্তি বাড়ায়। একটি সুন্দর পশুকথায় এই ভাবনা রূপ পেয়েছে।

অনেক কাল আগে এক বনে ছিল চার বন্ধু। ছাগল, কচ্ছপ, ইঁদুর ও কাক। একদিন সকালে তিন বন্ধু বেশ চিন্তায় পড়ল। রোজ সকালে তারা একটা পাহাড়ি ছোট্ট নদীতে এসে দেখা করত। গল্পগুজব করত। কিন্তু আজ তো ছাগল আসেনি। কাক উড়ে গেল তক্ষুনি। একটু পরে দূর থেকে উড়ে এসে বলল, বন্ধু ব্যাধের ফাঁদে আটকে পড়ে রয়েছে।

ইঁদুর বলল, ফাঁদের দড়ি আমি কেটে দেব।

কাক বলল, আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যাব। চলো।

ফাঁদের কাছে নেমেই ইঁদুর ধারালো দাঁত দিয়ে শক্ত দড়ি কাটতে লাগল। শেষ দড়িটা কাটতে বাকি রয়েছে, এমন সময়ে সেখানে গুটিগুটি এসে পৌঁছল কচ্ছপ।

ছাগল আঁতকে উঠে বলল, বন্ধু, তুমি আবার কেন আসতে গেলে? এক্ষুনি হয়তো ব্যাধ চলে আসবে। তুমি পালাবে কেমন করে?

কচ্ছপ বলল, আমার জন্য ভাবছ কেন? বিপদ ঘটতে পারে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে বন্ধুর অসময়ে তার পাশে আসব না? কী যে তুমি বল?

এই কথা বলতে বলতেই ব্যাধ সেখানে এসে গেল। ছাগল তিড়িং করে লাফিয়ে দৌড় দিল, কাক উড়ে গেল, ইঁদুর গেল গর্তে ঢুকে। আর কচ্ছপ একটু এগিয়েছে, ব্যাধ তাকে ধরে ফেলল। তাকে থলের মধ্যে ভরে রাখল। ছাগল পালিয়ে যেতে ব্যাধ খুব রেগে গেল, কিন্তু যা পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট হল। আজকের দিনটা তো আর অনাহারে থাকতে হবে না।

তিন বন্ধু আবার একসঙ্গে হল। সবার মনেই খুব দুঃখ। তবু ছাগল বলল, কেঁদে তো কোনো লাভ হবে না। বন্ধুকে তো আর ছাড়ানো যাবে না? একটা উপায় বের করতে হবে। তাড়াতাড়ি। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, হয়তো বন্ধুকে বাঁচাতে পারব।

সবাই সেই বুদ্ধির কথা শুনল, মত দিল।

একটু পরেই ব্যাধ দেখতে পেল, বেশ কিছুটা দূর দিয়ে একটা ছাগল খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে। সে জোরে হাঁটতে পারছে না। ব্যাধ মুখ-বাঁধা থলেটা সেখানে নামিয়ে রেখে ছাগলের দিকে দৌড়ে চলল। ভাবল, খোঁড়া ছাগলকে ধরা এমন কিছু শক্ত হবে না।

ছাগল ব্যাধকে বেশ কাছাকাছি আসতে দিল। এমন ভাব করে রয়েছে যেন ব্যাধকে দেখতেই পায়নি।

ছাগলও চলেছে। ব্যাধও দূর থেকে তাকে তাড়া করল। ছাগল কষ্ট করে চলেছে। ব্যাধ ভাবল, দু-একবার শুধুশুধু তাড়া করি। ধরবার দরকার নেই। ও খোঁড়া, এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সহজেই চেপে ধরব। ধৈর্য ধরি।

এমনি করে মিছিমিছি তাড়া করে ব্যাধ অনেক দূর গেল। থলে যেখানে রেখেছিল, সেখান থেকে এখন অনেক দূরে চলে এসেছে ব্যাধ।

এর মধ্যে ইঁদুর থলের মুখ কেটে ফেলেছে। কচ্ছপ বেরিয়ে পড়েছে। গুটিগুটি হাঁটা দিয়েছে। ঢুকে পড়ল এক ঘন ঝোপের আড়ালে। ছাগল বুঝল, এতক্ষণে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে, বিপদ কেটেছে। আর বেশি ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই পাহাড়ের দিকে দৌড় দিল। দূরে দৌড়ে চলেছে ছাগল।

ব্যাধ অবাক হয়ে দেখল, খোঁড়া ছাগল ভালো হয়ে গিয়েছে, সে দৌড়চ্ছে প্রাণপণে। ভালো হল কেমন করে? আর তো ওকে ধরা যাবে না!

রেগে গিয়ে ফিরে চলল ব্যাধ। কপাল খারাপ, হতচ্ছাড়া কচ্ছপকে নিয়েই আজ বাড়ি ফিরতে হবে। কী আর করা যায়!

থলের কাছে এসে দেখল, থলের মুখ খোলা। ভেতরে কচ্ছপ নেই। ব্যাধ ভাবল কেমন করে কচ্ছপ পালাল? ঠিক অপদেবতার কারসাজি। আর এখানে থাকব না। পালাই।

তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল ব্যাধ। আর কোনোদিন সেই জায়গায় ফাঁদ পাততে যায়নি।

এই ধরনের অসংখ্য পশুকথা ছড়িয়ে আছে ভারতে, আফ্রিকায়, ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে এবং মধ্য আমেরিকায়। পাত্র-পাত্রী আলাদা হলেও মোটিফ এক, কাহিনি-বিন্যাস একই ধরনের।

সমাজমন বিশ্লেষণে, নীতিশিক্ষার আন্তরিক প্রকাশে এবং কথকর্তার অনন্য ভঙ্গিতে পিলপের সংগৃহীত লোককথাগুলি লোকঐতিহ্যের ভাণ্ডারে এক অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে।

হিতোপদেশ

বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রকে অবলম্বন ও মূল উৎস ধরে প্রাচীন ভারতবর্ষের যে ক'টি গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে হিতোপদেশ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। হিতোপদেশের সংকলক বিষয়টি তার গ্রন্থের মিত্রলাভ অংশে প্রস্তাবিকার নবম শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। গ্রন্থটি যে চারটি অংশে বিভক্ত তারও উল্লেখ রয়েছে।

মিত্রলাভঃ সুহৃদ্ভেদো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব চ।
পঞ্চতন্ত্রাৎ তথান্যস্মাদ্‌গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে॥

পঞ্চতন্ত্র ও অন্য একটি গ্রন্থ থেকে আহরণ করে এই গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, এই অন্য গ্রন্থটি হল 'কামন্দকীয় নীতিসার'। অবশ্য অনুমান হলেও কিছু যুক্তি রয়েছে। কেননা, নীতিসারের কিছু কাহিনি হিতোপদেশে পাওয়া যাচ্ছে। আবার এও হতে পারে, দুজনেই লৌকিক ঐতিহ্য থেকে লোককথা সংগ্রহ করেছেন।

হিতোপদেশের সংকলক হলেন নারায়ণ। ভারতবর্ষের এক ধরনের ঐতিহ্যের অনুসরণ করেই নারায়ণ অকপটে তার পূর্বসূরি দুই গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তিনি পৃষ্ঠপোষকেরও নাম উল্লেখ করেছেন, তিনি হলেন ধবলচন্দ্র। ধবলচন্দ্রের ঐতিহাসিকত্ব আজও প্রমাণিত হয়নি, যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তিটির সময়কাল নির্ধারণ করা যেত, তবে হিতোপদেশের সঠিক উদ্ভব-কাল পাওয়া যেত।

শুধু বলা যায়, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের পরবর্তী সময়ে সংকলিত। এই গ্রন্থের প্রাচীনতম যে পুথিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার তারিখ ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু এই পুথি তো মূল পুথির নকল কিংবা নকলের নকল হতে পারে। এ থেকে কালনির্ণয় করা সম্ভব নয়।

ভারততত্ত্ববিদ উইনটারনিজ বলেছেন, নারায়ণ নবম শতকের পরে ও চতুর্দশ শতকের শেষার্ধের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি চতুর্থ-পঞ্চম শতকের মানুষ। প্রাচীন ভারতবর্ষের গ্রন্থকারদের কালনির্ণয়ে সেই এক জটিলতা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বারবার দেখা গিয়েছে, একটি পুথি জনপ্রিয় হলে তাকে অনুসরণ করে সেই ধরনের কাব্য-পুরাণ লিখিত হতে থাকে। তাই মনে হয়, পঞ্চতন্ত্রের কিছু পরেই তার জনপ্রিয়তায় প্রভাবিত হয়ে নারায়ণ হিতোপদেশ লিখেছিলেন, যেমন পঞ্চতন্ত্রের পরে ও হিতোপদেশের আগে লেখা হয়েছিল 'কামন্দকীয় নীতিসার।'

একসময় মনে করা হত, বিষ্ণুশর্মাই হিতোপদেশের রচয়িতা। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ একই মানুষের রচনা একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে। কেননা, যিনি পঞ্চতন্ত্র লিখলেন, তিনিই আবার হুবহু আর একটি গ্রন্থ কেন লিখতে যাবেন? পঞ্চতন্ত্রের অর্ধেকেরও বেশি কাহিনি রয়েছে হিতোপদেশে। বিশেষ করে, প্রস্তাবিকায় সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, পঞ্চতন্ত্র এবং অন্য একটি গ্রন্থ আমার এই গ্রন্থের উৎস। তবু দীর্ঘকাল বিষ্ণুশর্মার নামটি এই গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিল। পিটারসন প্রথম এই ভুল ভেঙে দিলেন। তিনি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন, হিতোপদেশের সংকলক হলেন নারায়ণ।

হিতোপদেশ অন্য ভাষায় অনুবাদ করবার সময় ম্যাক্সমুলার, ফ্রিট্জ, চার্লস উইলকিন্স্, ল্যাঙলে, হারটেল প্রভৃতি সকলেই একটি বিষয়ে একমত যে, গ্রন্থকার লৌকিক ঐতিহ্যের মৌখিক সম্পদগুলির লিখিত রূপ দেন। এই গ্রন্থেরও মূল উৎসভূমি লোকসমাজ।

হিতোপদেশ গ্রন্থটির নামের মধ্যেই এর উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে। নারায়ণ নিজেও সচেতনভাবে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে। সাধারণ নীতিশিক্ষার পাশাপাশি গ্রন্থে সমাজনীতি ও রাজনীতির বিষয়টিও এসেছে। অবশ্য এগুলিও বৃহত্তর অর্থে নীতি, তবে অল্পবয়স্কদের জন্য নিশ্চয়ই নয়। তাই এই গ্রন্থ বয়স্কদেরও সমানভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

নারায়ণ হিতোপদেশকে চারটি ভাগে সাজিয়েছেন, মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ্, বিগ্রহ ও সন্ধি। অন্য তিনটির ওপর পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু সন্ধি অংশের পরিকল্পনা নারায়ণের নিজস্ব। চারটি অংশেই নারায়ণ নতুন লোককথা সংকলিত করেছেন।

হিতোপদেশের প্রস্তাবিকার কাহিনিটি পঞ্চতন্ত্রের আদলে তৈরি। মিলই বেশি। এখানে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার নামের উল্লেখ রয়েছে, তিনিই অপগণ্ড ছেলেদের দায়িত্ব নিয়েছেন। রাজা, রাজধানী প্রভৃতির নাম এখানে পরিবর্তিত হয়েছে।

হিতোপদেশ গ্রন্থ সংকলনের ইতিহাসটি নারায়ণ এইভাবে বলেছেন: ভাগীরথী নদীর তীরে ছিল এক নগর, নাম পাটলিপুত্র। সেখানকার রাজার নাম ছিল সুদর্শন। সেই রাজা একদিন শুনতে পেলেন, কে একজন দুটি শ্লোক আবৃত্তি করছে, শাস্ত্র সকলের চক্ষু-স্বরূপ, এই শাস্ত্রজ্ঞান যার নেই সে অন্ধ। যৌবন, প্রভুত্ব, ধনসম্পদ ও বিবেকহীনতা, এদের মধ্যে মাত্র একটিই অনর্থ ঘটাতে পারে, আর চারটি একত্রিত হলে তো কথাই নেই।

এই শ্লোক শুনে রাজা চিন্তিত হলেন, তার পুত্রেরা শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও উচ্ছৃঙ্খল। রাজা ভাবতে বসলেন, অধিকাংশই দার্শনিক ভাবনা যদিও উদাহরণগুলি বাস্তব জগতের। এই ভাবনা রয়েছে ২৯টি শ্লোকে, ১২ থেকে ৪০তম শ্লোক পর্যন্ত।

এইসব ভেবে রাজা সভায় পণ্ডিতদের ডাকলেন। রাজা বললেন, আমার ছেলেরা নিত্য-উন্মার্গগামী ও শাস্ত্রপাঠে বিমুখ। আপনাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন যিনি ছেলেদের নীতিশিক্ষা দেবেন, তাদের শিক্ষিত করে তুলবেন? এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের পুনর্জন্ম ঘটে।

তখন সকল নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা বৃহস্পতির মতো বলতে লাগলেন, মহারাজ, রাজপুত্ররা বিশাল বংশে জন্মেছে। আমার মনে হয়, এদের নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করে তুলতে পারব। কেননা, অযোগ্য পাত্রে বিহিত কর্ম কখনও সফল হয় না, শত চেষ্টা করলেও বককে শুকপাখির মতো শেখানো যায় না। আর মনে রাখতে হবে, আপনার বংশে কখনও গুণহীন পুত্র জন্ম নিতে পারে না। পদ্মরাগমণির খনিতে কাচের উদ্ভব সম্ভব নয়। তাই, আমি ছয় মাসের মধ্যে আপনার পুত্রদের নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করে তুলতে পারব বলে বিশ্বাস করি।

রাজা বললেন, তাহলে আমার এই পুত্রদের নীতিশাস্ত্র উপদেশের ব্যবস্থা আপনিই করুন। সতের সংসর্গে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও দীপ্তিলাভ করতে পারে।

এই বলে রাজা সুদর্শন বিষ্ণুশর্মার হাতে তার পুত্রদের সমর্পণ করলেন।

তারপর প্রাসাদপৃষ্ঠে রাজপুত্রেরা যখন সুখে উপবিষ্ট, তখন সেই পণ্ডিত ভূমিকা হিসেবে বললেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কাব্য ও শাস্ত্রপাঠে আনন্দ লাভ করে, আর মূর্খ ব্যক্তি নিদ্রায় কলহে অথবা কুক্রিয়ায় আসক্ত হয়ে সময় কাটায়। তোমাদের আনন্দের জন্য আমি কাক কচ্ছপ হরিণ ও ইঁদুরের বিচিত্র কাহিনি বলব। এদের উপকরণ ছিল না, ধনসম্পত্তিও ছিল না, কিন্তু এরা ছিল পরম বন্ধু ও বুদ্ধিমান, তাই এদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।

হিতোপদেশের এই প্রস্তাবিকার সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের কথামুখের খুব সাদৃশ্য রয়েছে, রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। এখানে অবশ্য বিষ্ণুশর্মা রাজা সুদর্শনের একজন সভাপণ্ডিত। বিষ্ণুশর্মার জনপ্রিয়তার কারণেই নারায়ণও তার গ্রন্থের প্রথমেই এই নাম ব্যবহার করেছেন। তবে একথা মানতেই হবে, পঞ্চতন্ত্রের কথামুখের মতো হিতোপদেশের প্রস্তাবিকা অত মনোগ্রাহী নয়।

ভাবে-ভাবনায়-রূপরীতিতে-আদর্শে ও উদ্দেশ্যে পঞ্চতন্ত্রের অনুসরণ হলেও হিতোপদেশের মধ্যে আমরা নতুন কিছু লোককথার সন্ধান পাই। লোকসমাজের লৌকিক ঐতিহ্যের আরও কিছু সংগ্রহ লিখিত আকারে পাওয়া গেল বলেই হিতোপদেশের ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। সম্পাদক হিসেবে নারায়ণ হয়তো স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারেন না, বিষ্ণুশর্মার বৈদগ্ধ্যও তাঁর নেই, সৃজনী শক্তিও তুলনায় কম— তবু সংগ্রাহক হিসেবে নারায়ণ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

হিতোপদেশের একটি বড় ত্রুটি শ্লোকের আধিক্য। পঞ্চতন্ত্রেও শ্লোক রয়েছে, কিন্তু বিষ্ণুশর্মা জানতেন কোথায় থামতে হবে। সম্পাদক হিসেবে তাই তিনি অনন্য। কিন্তু নারায়ণ নীতিশিক্ষার তাগিদে হৃদয়গ্রাহিতার কথা উপেক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই গ্রন্থ পাঠ করলে সংস্কৃত-উক্তিতে নৈপুণ্য জন্মাবে, সকল ক্ষেত্রেই বাক্যের বৈচিত্র্য জন্মাবে, তা ছাড়া এই গ্রন্থ নীতিবিদ্যাও দান করবে। 'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে,' কিন্তু শিশু-কিশোরকে শিক্ষাদানের সময় উপদেশের আধিক্য যে বিরক্তি উৎপাদন করে নারায়ণ তা উপলব্ধি করেননি। এর ফলে আর একটি ত্রুটি ঘটে গিয়েছে। লৌকিক কাহিনিটির গতিময়তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। লোককথা বলতে বলতে মাঝখানে এত শ্লোক বললে রসভঙ্গ ঘটে। শ্লোকগুলি নিঃসন্দেহে

অসাধারণ নীতিমূলক, কিন্তু লোকঐতিহ্যের মূল বিষয়টির রসগ্রহণে তা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, সুহৃদ্‌ভেদ অংশের প্রথম পশুকথাটিতে আছে, সিংহ পিঙ্গলকের কাছে এল শেয়াল দমনক, পশুরাজের কাছে বিনয় প্রকাশের জন্যই দমনক ১৪টি শ্লোক বলল। শ্লোকগুলির ভাবার্থ সুন্দর, কিন্তু পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এইরকম দৃষ্টান্ত গ্রন্থের আগাগোড়া ছড়িয়ে রয়েছে। এর ফলে হিতোপদেশের কাহিনি-বর্ণনায় কৃত্রিমতা প্রকাশ পেয়েছে। বিষ্ণুশর্মার মতো সংযত হলে এই ত্রুটি ঘটত না। অথচ নারায়ণের ভাষাভঙ্গি সুন্দর, সহজ। তাই হিতোপদেশের অন্তর্ভুক্ত লোককথাকে লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসারী করে সাজিয়ে তুলতে বেশ পরিশ্রম করতে হয়। অনেক কিছু বাড়তি বক্তব্য ও মন্তব্য ছেঁটে ফেলেই লোককথাকে উদ্ধার করতে হয়। কিন্তু এই কাজটি করবার পরেই একটি নিটোল লোককথা আত্মপ্রকাশ করে। এখানেই পঞ্চতন্ত্রের মতো হিতোপদেশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

এই গ্রন্থের মিত্রলাভ সুহৃদ্‌ভেদ ও বিগ্রহ অংশগুলি পঞ্চতন্ত্রের অনুরূপ, কিন্তু চতুর্থ ভাগ সন্ধির পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ নতুন, নারায়ণের নিজস্ব সৃষ্টি।

নারী সম্পর্কে নারায়ণও অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন। গল্পচ্ছলে অল্পবয়সীদের নীতিকথা শেখানো হচ্ছে— নারায়ণ একথা বলেও বণিকের কাহিনি শুনিয়েছেন যার মধ্যে ছোটদের নীতিশিক্ষার কী থাকতে পারে তা উপলব্ধি করা যায় না।

বিক্রমপুরে এক বণিক ছিল। তার নাম সমুদ্রদত্ত, তার বউয়ের নাম রত্নপ্রভা। বউ তার ভৃত্যদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সব সময় ফষ্টিনষ্টি করত। কেননা, নারীদের প্রিয়-অপ্রিয় বলে কিছু নেই, গোরু যেমন বনে নতুন ঘাস কামনা করে, নারীরাও তেমনি নতুন নতুন পুরুষ চায়।

একদিন বণিক দেখল, বউ সেই ভৃত্যকে চুম্বন করছে। স্বামীকে দেখতে পেয়ে বউ সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে এসে বলল, ও চোর, চুরি করে জিনিস খায়, আমি ওর মুখের গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারলাম ও কর্পূর চুরি করে খেয়েছে।

শাস্ত্রে বলে, নারীর আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ, বুদ্ধি চারগুণ, শ্রমের শক্তি ছয়গুণ, কামস্পৃহা আটগুণ।

বউয়ের কথা শুনেই ভৃত্য বলল, এ বাড়িতে থাকা যায় না। প্রভুর বউ যদি সবসময় ভৃত্যের মুখের গন্ধ শোঁকে, তাহলে সে বাড়িতে থাকব কেমন করে?

এই বলে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বোকা বণিক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনল, কাজে বহাল করল।

পঞ্চতন্ত্রের প্রভাবেই কি নারায়ণ এই ধরনের কাহিনি শুনিয়েছেন? নাকি এটাও প্রক্ষিপ্ত কাহিনি? সমাধান সম্ভব নয়। মিত্রলাভের পঞ্চম কথায় কৌশাম্বী নগরীর বৃদ্ধ বণিকের যৌবনবতী স্ত্রীর কাহিনি রয়েছে। বক্তব্য একই। সুহৃদ্‌ভেদ-এর ষষ্ঠ কাহিনি হল গোপ ও কুলটা স্ত্রী। একটি বিকৃত মানসিকতার কুৎসিত কাহিনি। কোন নীতি উপদেশ দিলেন নারায়ণ?

পঞ্চতন্ত্র শেষ হয়েছে পশুকথা দিয়ে। কিন্তু হিতোপদেশের শেষাংশ বেশ অভিনব।

বিষ্ণুশর্মা বললেন, বলো, তোমাদের আর কী বলব?

রাজপুত্রেরা বলল, গুরুদেব, আপনার অনুগ্রহে আমরা রাজ্য পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছি।

বিষ্ণুশর্মা বললেন, যদি তাই হয়, তবে সৎ জন বিপদ থেকে মুক্ত হোক, পুণ্যবানদের কীর্তি আরও বাড়ুক। রাজ্যনীতি বারবিলাসিনীর মতো সবসময় মন্ত্রীদের বুকে থেকে মুখচুম্বন করুক, রাজ্যে নিত্য মহোৎসব হোক।

যতদিন হিমালয়কন্যা পার্বতী চন্দ্রমৌলে বিরাজিতা, যতদিন বিষ্ণুর বক্ষে লক্ষ্মী লীলা করবেন, যতদিন স্বর্ণাচল মেরু অক্ষয় থাকবে— ততদিন প্রচারিত থাকবে নারায়ণ রচিত 'সংগ্রহোহয়ং কথানাম।'

যিনি সযত্নে এই 'সংগ্রহ' রচনা করিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন, সেই শ্রীমান ধবলচন্দ্র শত্রুর ওপর বিজয়লাভ করুন।

গ্রন্থশেষের এই দুটি শ্লোক খুব তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রন্থকারের নাম, পৃষ্ঠপোষকের নাম লিখিত রয়েছে। তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গ্রন্থকার নিজের গ্রন্থকে দুবারই 'সংগ্রহ' বলে উল্লেখ করেছেন। হিতোপদেশের কাহিনিগুলির রূপ-রীতি-মোটিফ বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, এগুলি লোককথা। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীতেও এগুলির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। আর গ্রন্থকার নিজেই গ্রন্থটিকে সংগ্রহ-গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

কয়েকটি ক্ষেত্রে নারায়ণ শ্লোকের আধিক্য ঘটাননি। এগুলির সংখ্যা কম হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এখানে কথক নারায়ণের বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। লোকঐতিহ্যের মৌলিক রীতিটিও রক্ষিত হয়েছে।

সুহৃদ্‌ভেদ-এর তৃতীয় কথার পশুকথাটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এক পাহাড়ে থাকত এক সিংহ। সে ক্লান্ত হয়ে যখন গুহায় শুয়ে থাকত, তখন এক ইঁদুর এসে তার কেশরের আগা কেটে দিত। প্রতিদিনই এভাবে ইঁদুর সিংহকে বিরক্ত করত। আর কেশরের আগা কাটা সিংহও ভীষণ রেগে যেত কিন্তু ইঁদুরকে ধরতে পারত না। সিংহ একটু নড়লে কিংবা চোখ মেলে চাইলেই ইঁদুর টুক করে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ত।

সিংহ ভাবল, এভাবে তো হবে না। অত ছোট প্রাণীকে আমি মারব কেমন করে? ওকে মারতে হলে ওর সমান একজন যোদ্ধা দরকার। এই মনে করে সে পাশের এক গাঁয়ে গেল। সেখানে এক বেড়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাকে গুহায় নিয়ে এল। বেড়ালকে গুহায় থাকতে বলল। প্রতিদিন তাকে প্রচুর মাংস খেতে দিত! মহা সুখে রয়ে গেল বেড়াল।

যেদিন বেড়াল এল, সেদিন থেকে আর ইঁদুরের দেখা নেই। সে গর্ত থেকে উঁকিও দেয় না, সিংহের কেশরও ঠিক রইল। কেশর দুলিয়ে সিংহ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগল। ইঁদুরের খুট্‌খুট্ শব্দ যদি কখনও সিংহের কানে যেত, অমনি সিংহ বেড়ালকে বেশি বেশি মাংস দিত।

কিন্তু আর কতকাল সহ্য করা যায়! পেটের ভেতরে যে আগুন জ্বলছে। এভাবে গর্তের মধ্যেই কি মরে পড়ে থাকতে হবে! শেষকালে খিদে সহ্য করতে না পেরে ইঁদুর গর্ত থেকে বের হল, মাথা ঘুরছে, শরীর বড় ক্লান্ত। খাবারের খোঁজে এদিক-ওদিকে চাইল। হঠাৎ বেড়াল ধেয়ে এল, ইঁদুর মরে গেল।

সিংহ আর ইঁদুরের শব্দ পায় না। অনেকদিন হয়ে গেল। সিংহ বুঝতে পারল। তার তো আর বেড়ালকে প্রয়োজন নেই! তাকে আর আগের মতো খেতে দিত না, তার দিকে তাকিয়েও দেখত না। বড় দুর্বল হয়ে পড়ল বেড়াল।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের চুক্‌চা, নানাই ও নেনেত্ আদিবাসী, উত্তর আমেরিকার এস্কিমো, আফগানিস্তানের কাফির ও উত্তর ভারতে

বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যে এই পশুকথা রয়েছে। অবশ্য ভারতের বাইরের পশুকথায় সিংহ নেই, আছে শেয়াল। ইঁদুর তাকে বিরক্ত করত।

নারায়ণ যে অপরূপ মনোগ্রাহী লোককথা সংকলন করে লিখিত রূপ দিতে জানেন তার পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থের কয়েকটি কথায়। লোককথা সংগ্রাহক হিসেবে হিতোপদেশের সম্পাদক নারায়ণও তার ভাবগুরু বিষ্ণুশর্মার মতোই স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট

ওল্ড টেস্টামেন্ট

জুডাইজ্‌ম অর্থাৎ ইহুদিধর্ম ও খ্রিস্টীয়ধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত নিঃসন্দেহে, কিন্তু এই ধর্মীয় গ্রন্থের ভেতরে যেসব অপরূপ কাহিনি রয়েছে গবেষকদের কছে তার আকর্ষণও কম নয়। এবং সেইসঙ্গে এই গ্রন্থের অসংখ্য কাহিনির মূল উৎস যে লৌকিক সমাজের লোককথা তারও প্রমাণ মিলেছে।

নিউ টেস্টামেন্ট খ্রিস্টানদের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। তাই সহজেই এই দুই গ্রন্থের তুলনা এসে যায়। কাহিনিমালার বৈচিত্র্যে ওল্ড টেস্টামেন্টের কোনো তুলনা হয় না। আমেরিকার আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি. ডি. পারসি বলেছেন, The Old Testament is longer and richer in literary types than the New, presenting, besides the tremendous sweep of its histories, the minute detail of its low

codes and the high ethical doctrines of its prophetic books, the lyric poetry of Psalms and the song of Solomon, the wisdom literature of Proverbs and Ecclesiastes, the dramatic dialogue of Job, the apocalyptic vision of Daniel and the tale or short story, nowhere developed more perfectly than in Ruth.

এই গ্রন্থ প্রথম লেখা হয় হিব্রু ভাষায়। এই গ্রন্থের প্রাথমিক সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকে। আর বহু সময় পেরিয়ে একশো খ্রিস্টাব্দে বর্তমান রূপ পায়। মনে করা হয়, এই গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি অংশের রচয়িতা মোজেস। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসবিদরা এটাকে শুধুমাত্র বিশ্বাস বলেই মনে করেন।

এই গ্রন্থের মধ্যে লোককথার অনুসন্ধানই আমাদের লক্ষ্য। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতিবিদ এরমিনি ডাবলিউ ভোয়েগলিন বলেছেন— The Old Testament contains stories of folk heroes, cosmographic tales, etiological tales, folk-tales, — in fact it is a store house in its literary and inspirational power.

পৃথিবীখ্যাত সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী জেমস জি ফ্রেজার 'ফোকলোর ইন দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট' গ্রন্থের তিনটি খণ্ডে এই গ্রন্থের মধ্যে লৌকিক উপাদানের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপের উপনিবেশবাদী দেশগুলো পশ্চিম এশিয়ায় আসতে শুরু করে। সেইসঙ্গে আসতে থাকেন নৃবিজ্ঞানী ও লোকসংস্কৃতির গবেষকবৃন্দ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে স্বদেশীয় ও ইউরোপীয় গবেষকবৃন্দ সিরিয়া তুরস্ক ইরাক ইরান লেবানন জর্ডন এবং সাম্প্রতিককালের ইজরেল-প্যালেস্টাইন এলাকায় লোককথা সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে আফ্রিকার মিশরসহ কয়েকটি দেশের সঙ্গে এশিয়ার পশ্চিম অংশের সম্পর্ক একসময় ঘনিষ্ঠ ছিল। মিশরের ফারাও-এর রাজত্বকালেই বিশাল সংখ্যক মানুষকে নিয়ে মোজেস পৌছন এই এশীয় ভূখণ্ডে।

এই গ্রন্থের প্রথম দিকে 'লোককথার মাইগ্রেশান' অংশে যে আদম-ইভের লোককথা লিখেছি, তার একটি রূপ তো পাওয়া গিয়েছে আফ্রিকায়।

ওল্ড টেস্টামেন্ট শুরু হচ্ছে 'আদিপুস্তক' দিয়ে। প্রথমে রয়েছে 'জগৎ-সৃষ্টির বিবরণ।'— "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল..."

সব সৃষ্টির পরে ঈশ্বর 'আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।' প্রথম নরনারীর বিবরণ, মানবজাতির পাপে পতন-এর পরে রয়েছে জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত।

পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশে এই জলপ্লাবনের মিথ রয়েছে। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের কাহিনির আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। প্রত্নবিজ্ঞানীরা মনে করেন, সভ্যতার বিবর্তনে কোনো এক সময়ে এই ধরনের বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল। আর তারই স্মৃতি রয়ে গিয়েছে লোকসমাজে। লোকসমাজের সেই অভিজ্ঞতাই যেমন দেশে দেশে প্লাবনের মিথ সৃষ্টি করেছিল, তারই একটি লিপিবদ্ধ রয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্টে।

ওল্ড টেস্টামেন্টে 'নোহ ও জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত' কাহিনিটির সঙ্গে মিল রয়েছে মধ্য আমেরিকার পানামা, গ্রিস, আইসল্যান্ড, ওয়েলস. অস্ট্রেলিয়া, মায়ানমার, চিন, ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্‌স, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের প্লাবনের লোকপুরাণের। দেশভেদে কিছু কিছু ভিন্নতা অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু সাদৃশ্য এত বেশি যে বিস্মিত হতে হয়।

'নোহ ও জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত' কাহিনিটি হল:

"এইরূপে যখন ভূমণ্ডলে মনুষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও অনেক কন্যা জন্মিল, তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া, যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল। তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যদের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবেন না, তাহাদের বিপথগমনে তাহারা মাংসমাত্র। তাই সদাপ্রভু পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্মাণ প্রযুক্ত অনুশোচনা করিলেন ও মনঃপীড়া পাইলেন। আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব, মনুষ্যের সহিত পশু. সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও উচ্ছিন্ন করিব কিন্তু নোহ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন।

নোহ তৎকালিক লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। শেম হাম ও যেফৎ নামে তার তিন পুত্র ছিল। তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্ট, পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ছিল। আর ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন। আর দেখ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে, কেননা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল।

তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, আমার গোচরে সকল প্রাণীর অন্তিমকাল উপস্থিত, কেননা তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, আর দেখ, আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব।

তুমি গোফর কাষ্ঠ দ্বারা এক জাহাজ নির্মাণ কর। সেই জাহাজের মধ্যে কুঠরি নির্মাণ করিবে ও তাহার ভিতরে ও বাহিরে ধুনা দিয়া লেপন করিবে। এই প্রকারে তাহা নির্মাণ করিবে— জাহাজ দীর্ঘে তিন শত হাত, প্রস্থে পঞ্চাশ হাত ও উচ্চতায় ত্রিশ হাত হইবে। আর তাহার ছাদের এক হাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখিবে ও জাহাজের পার্শ্বে দ্বার রাখিবে, তাহার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা নির্মাণ করিবে। আর দেখ আকাশের নীচে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জীবজন্তু আছে, সকলকে বিনষ্ট করণার্থে আমি পৃথিবীর ওপরে জলপ্লাবন আনিব, পৃথিবীস্থ সকলে প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু তোমার সহিত আমি আপনার নিয়ম স্থির করিব। তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ করিবে। আর মাংসবিশিষ্ট সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রীপুরুষ জোড়া জোড়া লইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার্থে আপনার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবে, সর্বজাতীয় পক্ষী, সর্বজাতীয় পশু ও সর্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ জোড়া জোড়া প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকটে প্রবেশ করিবে। আর তোমার ও তাহাদের আহারার্থে তুমি সর্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে সঞ্চয় করিবে।

তাহাতে নোহ সেইরূপ করিলেন, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম করিলেন।

আর সদাপ্রভু নোহকে কহিলেন, তুমি সপরিবারে ও পশুপক্ষীদের লইয়া জাহাজে প্রবেশ কর। কেননা সাত দিনের পর আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্র বৃষ্টি বর্ষাইয়া আমার নির্মিত যাবতীয় প্রাণীকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব। তখন নোহ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সকল কর্ম করিলেন।

পরে সেই সাত দিন গত হইলে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল। আকাশের বাতায়ন সকল মুক্ত হইল, তাহাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্র মহাবৃষ্টি হইল। আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল, তাহাতে জল বৃদ্ধি পাইয়া জাহাজ ভাসাইলে তাহা মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠিল। পরে জল প্রবল হইয়া পৃথিবীতে অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, এবং জাহাজ জলের উপরে ভাসিয়া গেল। আর পৃথিবীতে জল অত্যন্ত প্রবল হইল, আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত সকল মহাপর্বত মগ্ন হইল। ভূচর যাবতীয় প্রাণী— পক্ষী, গ্রাম্য ও বন্য পশু, ভূচর সরীসৃপ সকল এবং মনুষ্য সকল মরিল।

আর চল্লিশ দিন গত হইলে নোহ আপনার নির্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলিয়া একটা দাঁড়কাক ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে সে উড়িয়া ভূমির উপরিস্থ জল শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত ইতস্তত গতায়াত করিল। আর ভূমির উপরে জল হ্রাস পাইয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য তিনি আপনার নিকট হইতে এক কপোত ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে সমস্ত পৃথিবী জলে আচ্ছাদিত থাকাতে কপোত পদার্পণের স্থান পাইল না, তাই জাহাজে ফিরিয়া আসিল।

সাত দিন বিলম্ব করিয়া জাহাজ হইতে সেই কপোত পুনর্বার ছাড়িয়া দিলেন এবং কপোতটি সন্ধ্যাকালে তাহার নিকটে ফিরিয়া আসিল, আর দেখ, তাহার চঞ্চুতে জিতবৃক্ষের একটি নবীন পত্র ছিল। ইহাতে নোহ বুঝিলেন, ভূমির উপরে জল হ্রাস পাইয়াছে। সাত দিন পরে সেই কপোত আবার ছাড়িয়া দিলেন। তখন সে আর তাহার নিকটে ফিরিয়া আসিল না।

পৃথিবীর উপরে জল শুষ্ক হইল। নোহ জাহাজের ছাদ খুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন ভূতল নির্জল।

পরে ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি আপনার স্ত্রী, পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজ হইতে বাহিরে যাও। আর তোমার সঙ্গী পশু, পক্ষী ও ভূচর সরীসৃপ প্রভৃতি মাংসময় যত জীবজন্তু আছে, সেই সকলকে তোমার সঙ্গে বাহিরে আন। তাহারা পৃথিবীকে প্রাণময় করুক এবং পৃথিবীতে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হউক।"

এই লোকপুরাণটি বহু আগেই লিখিত আকারে নথিভুক্ত রয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্টে। অন্য আরও যেসব প্লাবনের লোককথা সংগৃহীত হয়েছে যার সঙ্গে নোহর কাহিনির আশ্চর্য মিল রয়েছে। সেগুলিও এই গল্পের মতোই সুগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। নোহর কাহিনি যে

লোকসমাজের লৌকিক মৌখিক ঐতিহ্য থেকেই ধর্মগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সে বিষয়ে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ।

পৃথিবীর ব্যাপ্ত এলাকা জুড়ে একটি লৌকিক মোটিফের সন্ধান পাওয়া যায়। অত্যাচারী নিষ্ঠুর সর্দার বা রাজার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী হয়— তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। লোকসমাজের এই অনাগত উদ্ধারকারী হল একজন পুত্রসন্তান। সমস্ত পুত্রসন্তানকে বধ করার আদেশ জারি হয়। কিন্তু দৈবক্রমে বেঁচে যায় একজন, নইলে ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলবে কেমন করে?

ওল্ড টেস্টামেন্টের 'এক্‌সোডাস' বা 'যাত্রাপুস্তকে' লৌকিক এই মোটিফকে কেন্দ্র করে লোককথার ধাঁচে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে:

"—ইস্রায়েলের পুত্রগণ, যাহারা মিশর দেশে গিয়াছিলেন, সপরিবারে যাকোবের সহিত গিয়াছিলেন, তাহারা ফলবন্ত, অতি বর্ধিষ্ণু ও বহুবংশ হইয়া উঠিল ও অতিশয় প্রবল হইল এবং তাহাদের দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইল।

পরে মিশরের উপরে এক নূতন রাজা উঠিলেন। তিনি আপন প্রজাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমাদের অপেক্ষা ইস্রায়েল-সন্তানদের জাতি বহুসংখ্যক ও বলবান। আইস, আমরা তাহাদের সহিত বিবেচনাপূর্বক ব্যবহার করি, পাছে তাহারা বাড়িয়া উঠে এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারাও শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে এবং এ দেশ হইতে প্রস্থান করে।

অতএব তাহারা ভার বহন দ্বারা উহাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য উহাদের কার্যশাসকদিগকে নিযুক্ত করিল। আর উহারা ফরৌনের নিমিত্ত ভাণ্ডারের নগর, পিথোম ও রামিসেস গাঁথিল। কিন্তু উহারা তাহাদের দ্বারা যত দুঃখ পাইল, ততই বৃদ্ধি পাইতে ও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তাই ইস্রায়েল-সন্তানদের বিষয়ে তাহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। আর মিশরীয়রা নির্দয়তাপূর্বক ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে দাস্যকর্ম করাইল। তাহারা কর্দম, ইষ্টক ও ক্ষেত্রের সমস্ত কার্যে কঠিন দাস্যকর্ম দ্বারা উহাদের প্রাণ তিক্ত করিতে লাগিল। তাহারা উহাদের দ্বারা যে যে দাস্যকর্ম করাইত, সে সমস্ত নির্দয়তাপূর্বক করাইত।

পরে মিশরের রাজা শিফ্রা ও পূয়া নামে দুই ইব্রিয়া ধাত্রীকে এই কথা কহিলেন, যে সময়ে তোমরা ইব্রীয় স্ত্রীলোকদিগের ধাত্রীকার্য করিতে ও

তাহাদিগকে প্রসব-আধারে দেখিবে, যদি পুত্রসন্তান হয়, তাহাকে বধ করিবে, আর যদি কন্যা হয়, তাহাকে জীবিত রাখিবে।

কিন্তু ওই ধাত্রীরা ঈশ্বরকে ভয় করিত, সুতরাং মিশর রাজের আজ্ঞানুসারে না করিয়া পুত্রসন্তানদিগকে জীবিত রাখিত। তাই মিশর রাজ সেই ধাত্রীদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, এ কর্ম কেন করিয়াছ? পুত্রসন্তানগণকে কেন জীবিত রাখিয়াছ?

ধাত্রীরা ফরৌনকে উত্তর করিল, ইব্রীয় স্ত্রীলোকেরা মিশরীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় নহে, তাহারা বলবতী, তাহাদের কাছে ধাত্রী যাইবার পূর্বেই তাহারা প্রসব হয়। অতএব ঈশ্বর ঐ ধাত্রীদের মঙ্গল করিলেন এবং লোকেরা বৃদ্ধি পাইয়া অতিশয় বলবান হইল।

পরে ফরৌন আপনার সকল প্রজাকে এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা ইব্রীয়দের নবজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু প্রত্যেক কন্যাকে জীবিত রাখিবে।

আর লেবির কুলের এক পুরুষ গিয়া এক লেবীয় কন্যাকে বিবাহ করিলেন। আর সেই স্ত্রী গর্ভধাবণ করিয়া পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুটিকে সুশ্রী দেখিয়া তিন মাস গোপনে রাখিলেন। পরে আর গোপন করিতে না পারাতে তিনি এক নলের পেটরা লইয়া মেটিয়া তেল ও আলকাতরা লেপন করিয়া তাহার মধ্যে বালকটিকে রাখিলেন ও নদীতীরস্থ নলবনে তাহা স্থাপন করিলেন। আর তাহার কি দশা ঘটে তাহা দেখিবার জন্য তাহার ভগিনী দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরে ফরৌনের কন্যা স্নানার্থে নদীতে আসিলেন এবং তাহার সহচরীগণ নদীতীরে বেড়াইতেছিলেন আর তিনি নলবনের মধ্যে ঐ পেটরা দেখিয়া আপন দাসীকে তাহা আনিতে পাঠাইলেন। পরে পেটরা খুলিয়া শিশুটিকে দেখিলেন, আর দেখ, ছেলেটি কাঁদিতেছে। তিনি তাহার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন, এটি ইব্রীয়দের ছেলে। তখন তাহার ভগিনী ফরৌনের কন্যাকে কহিল, আমি গিয়া কি আপনকার নিমিত্ত এই ছেলেকে দুগ্ধ দিবার জন্য স্তন্যদায়ী একটি ইব্রীয় স্ত্রীলোককে আপনকার নিকটে ডাকিয়া আনিব?

ফরৌনের কন্যা কহিলেন, যাও। তখন সেই মেয়েটি গিয়া ছেলের মাকে ডাকিয়া আনিল। ফরৌনের কন্যা তাহাকে কহিলেন, তুমি এই ছেলেটিকে লইয়া আমার নিমিত্ত দুগ্ধ পান করাও, আমি তোমাকে বেতন দিব।

তাহাতে সেই স্ত্রী ছেলেটিকে লইয়া দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। পরে ছেলেটি বড় হইলে তিনি তাহাকে লইয়া ফরৌনের কন্যাকে দিলেন—তাহাতে সে তাহারই পুত্র হইল। আর তিনি তাহার নাম মোশি (টানিয়া তোলা) রাখিলেন, কেননা তিনি কহিলেন, আমি তাহাকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়াছি।

মোশি বড় হইলে বুঝিতে পারিলেন তাহার পরিচয় প্রমাণ হইয়া পড়িয়াছে। পরে ফরৌন ঐ কথা শুনিয়া মোশিকে বধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মোশি পলায়ন করিয়া মিদিয়ন দেশে বাস করিতে লাগিলেন।"

এর পরে অনেক ঘটনা ঘটল। মোশির কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটল। মোশি মিশর দেশে ফিরে ফরৌনকে ঈশ্বরের কথা জানান। মোশি ইস্রায়েল-সন্তানদের মিশর থেকে বের করে আনবার জন্য দশবার আঘাত করেন—তারপরেই মিশর থেকে ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা শুরু হল।

"—কিন্তু ফরৌন ও তাহার সৈন্যরা মোশির পশ্চাৎধাবন করিল। সদাপ্রভুর আজ্ঞায় মোশি সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করিল। মোশির সকলে ওপারে পৌঁছিয়া গেল। মিশ্রীয়রা সমুদ্র পার হইতে যাইবার সময়ে সদাপ্রভুর আজ্ঞায় সমুদ্র জল তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল।"

লোকসমাজের লোককথায় সারা বিশ্বের যে মোটিফটি ছড়িয়ে আছে অর্থাৎ অত্যাচারীকে হত্যা করবে এমন একজন, হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 'দৈবক্রমে' সে বেঁচে থাকবে এবং প্রতিশোধ নেবে।

পৃথিবীজোড়া লোককথায় রয়েছে, ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন। তখন ঈশ্বরের কাছেই মানুষ থাকত। অর্থাৎ পৃথিবীতেই দেবতা বাস করতেন। দিনে দিনে মানুষের হিংসা ক্রোধ সংকীর্ণতা ও দেবতাকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখে দেবতা বিস্মিত হলেন। শেষকালে মানুষের অত্যাচারে তিনি আকাশে চলে গেলেন। মানুষ তো ছাড়বার পাত্র নয়। আকাশে পৌঁছবার কৌশল করতে লাগল। শেষপর্যন্ত মানুষের এই ব্যবহারে পিতা দেবতা মানুষের মধ্যে নানা ধরনের বিভেদ তৈরি করলেন। মানুষের গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ঝগড়া বেধে গেল। আর দেবতাও রেহাই পেয়ে আকাশে শান্তিতে থাকতে লাগলেন।

এই লোককথার নানান রকমফের রয়েছে। কিন্তু মোটিফ এক।

ওল্ড টেস্টামেন্টে এই লোককথা কিছুটা পরিশীলিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ যে সংগঠিত হয়ে দেবতার চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে তা এই ধর্মগ্রন্থেও রয়েছে। আর আশ্চর্যের বিষয়, পরম করুণাময় ঈশ্বর সদাপ্রভু তাঁর অপরূপ সৃষ্টি মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করলেন। শুধু তাই নয়, সদাপ্রভু সমস্ত ভূমণ্ডলে মানুষকে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন। এই চিন্তা তো লৌকিক সমাজ থেকেই লিখিত ধর্মগ্রন্থে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

"—বাবিলে ভাষা-ভেদ। সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ কথা ছিল। পরে লোকেরা পূর্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শিনিয়র দেশে এক সমস্থলী পাইয়া সে স্থানে বসতি করিল। আর পরস্পর কহিল, আইস, আমরা ইস্টক নির্মাণ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করি, পরে তাহারা কহিল, আইস, আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগনস্পর্শী এক উচ্চগৃহ নির্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি, পাছে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন হই। পরে মনুষ্য সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নির্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে সদাপ্রভু নামিয়া আসিলেন।

আর সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, তাহারা সকলে এক জাতি ও এক ভাষাবাদী, এখন এই কর্মে প্রবৃত্ত হইল, ইহার পরে যে কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহা হইতে নিবারিত হইবে না। আইস, আমরা নীচে গিয়া সেই স্থানে তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই যেন তাহারা এক জন অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে। আর সদাপ্রভু তথা হইতে সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং তাহারা নগর পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল। এই জন্য সেই নগরের নাম বাবিল (ভেদ) থাকিল, কেননা সেই স্থানে সদাপ্রভু সমস্ত পৃথিবীর ভাষার ভেদ জন্মাইলেন এবং তথা হইতে সদাপ্রভু তাহাদিগকে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন।"

লৌকিক ঐতিহ্যের এরকম লোককথা কিছুটা পরিবর্তিত রূপে ওল্ড টেস্টামেন্টের লিখিত ঐতিহ্যে রয়ে গিয়েছে।

নিউ টেস্টামেন্ট

এই ধর্মগ্রন্থে জিশুখ্রিস্টের জীবন ও উপদেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে। খ্রিস্টই হলেন এই বাইবেলের অনন্য বিষয়। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মানুষ মনে করেন— বাইবেলে সন্নিবেশিত আছে ঈশ্বরের মনন, মানবের অবস্থা, মুক্তির পথ, পাপীদের বিচার এবং বিশ্বাসীদের সুখ। এর অনুশাসনগুলি পবিত্র। এর নীতিমালা বাধ্যতামূলক। এর কাহিনিগুলি সত্য। এর সিদ্ধান্তগুলি অবিচ্ছেদ্য।

যতদূর জানা যায় নিউ টেস্টামেন্ট প্রথম লেখা হয় গ্রিক ভাষায়। তারপরে ল্যাটিন ভাষায়। উপনিবেশবাদের যুগ থেকে এই গ্রন্থটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ওল্ড টেস্টামেন্টে অনেক লৌকিক কাহিনির আংশিক পরিবর্তিত রূপ রয়েছে। কিন্তু সেসব কাহিনিতে নীতিশিক্ষার কোনো বিষয় নেই। কিন্তু নিউ টেস্টামেন্টে জিশুখ্রিস্ট এমন অনেক লোককথা বলেছেন যেগুলির মধ্যে নীতিশিক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি শিষ্যদের কাছে সদুপদেশ দেওয়ার সময় এইসব 'প্যারাব্‌ল' বলেছেন। যেমন মহাভারতে পিতামহ ভীষ্ম শুনিয়েছেন লোককথা।

জিশুর এইসব নীতিকথার ধরন ও মোটিফ বিশ্লেষণ করে জানা যায় এগুলি লৌকিক ঐতিহ্য থেকেই সংগ্রহ করা। আরও বড় প্রমাণ হল, এশিয়ার পশ্চিম অংশে জেরুজালেমকে ঘিরে যেখানে জিশু তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সেইসব স্থানের লোককথা যখন সংগৃহীত হল উনিশ বিশ শতকে তখন সেইসব এলাকার কৃষক-পশুপালক গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে এমন সব লোককথা-পশুকথা পাওয়া গেল যার সঙ্গে বাইবেলের নীতিকথার আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। আর এইসব জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই খ্রিস্টান নয়, বাইবেল তাদের ধর্মগ্রন্থও নয়। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা অনেক বিশ্লেষণের পরে সিদ্ধান্তে এসেছেন, নিউ টেস্টামেন্টের নীতিমূলক গল্পগুলির উৎস লৌকিক ঐতিহ্যের মধ্যেই রয়েছে।

'মার্কলিখিত সুমসাচারে' জিশুর 'কয়েকটি দৃষ্টান্ত' রয়েছে। সেইসব দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি লোককথা রয়েছে: "পরে তিনি আবার সমুদ্রের তীরে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার নিকটে এত অধিক লোক একত্রিত হইল যে, তিনি একখানি নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে বসিলেন

এবং সমাগত লোকসকল সমুদ্রের তীরে স্থলে থাকিল। তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশের মধ্যে তাহাদিগকে বলিলেন,—

শুন, দেখ, বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল। বপনের সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক বীজ পাষাণময় স্থানে পড়িল, যেখানে অধিক মটি পাইল না, তাহাতে অধিক মাটি না পাওয়াতে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সূর্য উঠিলে পর পুড়িয়া গেল এবং তাহার মূল না থাকাতে শুকাইয়া গেল। আর কতক বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কাঁটাবন বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল, তাহার ফল ধরিল না। আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ও বাড়িয়া উঠিয়া ফল দিল। কতক ত্রিশ গুণ, কতক ষাট গুণ ও কতক শত গুণ ফল দিল।"

এই পর্যন্ত এটি লোককথা। যদিও শিক্ষিত প্রাজ্ঞ মার্ক-এর হাতে ভাষায় পরিবর্তন এসেছে। তবু লোককথা বলে চিনতে অসুবিধে হয় না।

কিন্তু তারপরেই কাহিনির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন জিশু।— "পরে তিনি কহিলেন, যাহার শুনিবার কান থাকে, সে শুনুক। পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই দৃষ্টান্ত কি বুঝিতে পার না? সেই বীজবাপক বাক্য-বীজ বুনে। পথের পার্শ্বে যাহারা তাহারা এমন লোক যাহাদের মধ্যে বাক্য-বীজ বুনা যায় আর যখন তাহারা শুনে তৎক্ষণাৎ শয়তান আসিয়া তাহাদের মধ্যে যাহা বপন করা হইয়াছিল, সেই বাক্য হরণ করিয়া লইয়া যায়। আর সেইরূপ যাহারা পাষাণময় ভূমিতে উপ্ত তাহারা এমন লোক যাহারা বাক্যটি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আহ্লাদপূর্বক গ্রহণ করে আর তাহাদের অন্তরে মূল নাই কিন্তু তাহারা অল্প কালমাত্র স্থির থাকে, পরে সেই বাক্যহেতু ক্লেশ কিংবা তাড়না ঘটিলে তৎক্ষণাৎ বিঘ্ন পায়। আর অন্য যাহারা কাঁটাবনের মধ্যে উপ্ত তাহারা এমন লোক যাহারা বাক্যটি শুনিয়াছে কিন্তু সংসারের চিন্তা ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়া ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে তাহাতে তাহা ফলহীন হয়। আর যাহারা উত্তম ভূমিতে উপ্ত তাহারা এমন লোক যাহারা সেই বাক্য শুনিয়া গ্রাহ্য করে এবং কেহ ত্রিশ গুণ, কেহ ষাট গুণ ও কেহ শত গুণ ফল দেয়।"

সেকালের জেরুজালেম এলাকার অনুর্বর জমিতে ফসল ফলাবার সময়ে কৃষকসমাজের বীজ ছড়ানো ও ফল পাওয়াকে কেন্দ্র করে অভিজ্ঞতা ছিল, লোককথায় তারা সেই অভিজ্ঞতাকেই প্রকাশ করেছে। লৌকিক ঐতিহ্যের এই লোককথাকে ধর্মীয় একজন দার্শনিক অন্য তাৎপর্যে বিশ্লেষণ করলেন। এই দার্শনিক ভাবনা কিন্তু লোককথাটির লৌকিক ঐতিহ্যেকে অস্বীকার করতে পারেনি।

লোকসমাজে কোনো ব্যক্তিমানুষের অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশের জন্য একটি মোটিফ ব্যবহৃত হয় এবং বিশ্বজোড়া এর ব্যাপ্তি। অতি সামান্য খাদ্যবস্তু থেকে প্রচুর খাদ্যবস্তু তৈরি হয় ব্যক্তিমানুষের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে। ভারতের আঞ্চলিক মহাভারতে থালায় একটিমাত্র অন্ন থেকে দ্রৌপদীর বহু মানুষকে খাওয়ানোর কাহিনি অতি পরিচিত।

নিউ টেস্টামেন্টে এ বিষয়ে তেমন কোনো সুস্পষ্ট লোককথা নেই, কিন্তু জিশুর জীবনকে ঘিরে একটি অলৌকিক কাজের সুবাদে এই মোটিফটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

'লুকলিখিত সুসমাচারে'র অন্তর্ভুক্ত 'যীশু পাঁচ হাজার লোককে আহার দেন' এমনই একটি দৃষ্টান্ত।

"—পরে প্রেরিতেরা যাহা যাহা করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তাহার বৃত্তান্ত জিশুকে কহিলেন। আর তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিরলে বৈৎসৈদা নামক নগরে গেলেন। কিন্তু লোকেরা তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পশ্চাৎগমন করিল। আর তিনি তাহাদিগকে সদয়ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় কথা কহিলেন এবং যাহাদের সুস্থ হইবার প্রয়োজন ছিল তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। পরে দিবা অবসান হইতে লাগিল আর সেই বারো জন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি এই লোকসমূহকে বিদায় করুন যেন ইহারা চারিদিকে গ্রামে ও পল্লীতে গিয়া রাত্রিবাস করে ও খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া লয়। কেননা, এখানে আমরা নির্জন স্থানে আছি। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই ইহাদিগকে আহার দাও। তাহারা বলিলেন, পাঁচখানা রুটি ও দুইটি মাছের অধিক আমাদের কাছে নাই। তবে কি আমরা গিয়া এই সমস্ত লোকের জন্য খাদ্য কিনিয়া আনিতে পারিব? কারণ তাহাদের অনুমান পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল। তখন তিনি আপন

শিষ্যদিগকে কহিলেন, পঞ্চাশ জন করিয়া উহাদিগকে সারি সারি বসাইয়া দাও। তাহারা সেইরূপ করিলেন, সকলকে বসাইয়া দিলেন। পরে তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দুইটি মাছ লইয়া স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া সেইগুলিকে আশীর্বাদ করিলেন ও ভাঙিলেন। আর লোকদের সম্মুখে রাখিবার জন্য শিষ্যগণকে দিতে লাগিলেন। তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল এবং তাহারা যাহা অবশিষ্ট রাখিল সেই সকল গুঁড়াগাঁড়া কুড়াইলে বারো ডালা হইল।"

এই সুসমাচারে আর একটি লোককথা রয়েছে— "আর তিনি কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ আপন পিতাকে কহিল, পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে তাহা আমাকে দাও। তাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে ধন বিভাগ করিয়া দিলেন। অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র করিয়া লইয়া দূরদেশে চলিয়া গেল। আর তথায় সে অনাচারে নিজ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। সে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলে পর সেই দেশে ভারী আকাল হইল, তাহাতে সে কষ্টে পড়িতে লাগিল। তখন সে গিয়া সেই দেশের এক জন গৃহস্থের আশ্রয় লইল। আর সে তাহাকে শূকর চরাইবার জন্য আপনার মাঠে পাঠাইয়া দিল। তখন শূকরে যে শুঁটি খাইত, তাহা দিয়া সে উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা করিত আর কেহই তাহাকে দিত না। কিন্তু চেতনা পাইলে সে বলিল, আমার পিতার কত মজুর বেশি বেশি খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব। তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই। তোমার একজন মজুরের মতো আমাকে রাখ। পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল। সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন। তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই। কিন্তু পিতা আপন দাসদিগকে কাহিলেন,শীঘ্র করিয়া সব চেয়ে ভালো কাপড়খানি আন, আর ইহাকে পরাইয়া দাও এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দাও ও পায়ে জুতা দাও। আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি

আসিয়া মার, আমরা ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি। কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল। হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল। তাহাতে তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল।

—তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল, পরে সে আসিতে আসিতে যখন বাড়ির নিকটে পৌঁছিল, তখন বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। আর সে একজন দাসকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সকল কি? সে তাহাকে বলিল, তোমার ভাই আসিয়াছে এবং তোমার পিতা হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিয়াছেন, কেননা তিনি তাহাকে সুস্থ পাইয়াছেন।

—তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, ভিতরে যাইতে চাহিল না। তখন তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উত্তর করিয়া পিতাকে কহিল, দেখ, এত বৎসর আমি তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, কখনও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই। তথাপি আমাকে কখনও একটি ছাগবৎস দাও নাই যেন আমি নিজ মিত্রগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারি। কিন্তু তোমার এই যে পুত্র বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন খাইয়া ফেলিয়াছে, সে যখন আসিল তাহারই জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিলে। তিনি তাহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে আছ আর যাহা যাহা আমার সকলই তোমার। কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা উচিত হইয়াছে, কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল, হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।"

উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে আরব দুনিয়ার অনেক দেশে এই একই লোককথা সংগৃহীত হয়েছে। ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেন। সেই লোককথায় বলা হয়েছে পিতৃস্নেহের কথা, যে সন্তান দূরে গিয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে তার প্রতি পিতার স্নেহের আধিক্যের কথা। কিন্তু সেই লৌকিক কাহিনি যখন ধর্মগ্রন্থে বিশেষ উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ হল তখন বাড়তি মাত্রা যুক্ত হল— স্বর্গের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, পাপবোধের কথা একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে। লোককথায় তা নেই। আর একটি পার্থক্য রয়েছে। এই ধর্মগ্রন্থ লেখার সময়ে সেখানকার মানুষ শুয়োর পালন করত, শুয়োর খেত। কিন্তু দীর্ঘদিন পরে সমস্ত এলাকা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়। শুয়োর হারাম হয়ে যায়। তাই পরবর্তীকালের

লোককথায় দেখছি, ছোট ছেলে উট চরাত কিংবা ভেড়ার পাল চরাত। শুয়োরের কথা নেই।

নিউ টেস্টামেন্টের শেষে 'যোহনের নিকটে প্রকাশিত বাক্য' অংশে এমন কিছু অতিলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয়-গ্রিক-ল্যাটিন-মিশরীয়-চিনা-ইউরোপীয় ঐতিহ্যের মোটিফগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এই অংশের অতিলৌকিক বিষয়সমূহের সঙ্গে মূল নিউ টেস্টামেন্টের সম্পর্ক নির্ণয় করা খুবই দুরূহ।

অতিলৌকিক বিষয়গুলি হল: "ঐ দূত ধূপদানী লইয়া বেদির অগ্নিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে মেঘগর্জন, রব, বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল। ওই পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত অশ্বগণের ন্যায়, তাহাদের মস্তকে যেন সুবর্ণের তুল্য মুকুট ছিল, তাহাদের দন্ত সিংহ-দন্তের ন্যায়। পরে আমি আর এক শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া অসিতে দেখিলাম, তাঁহার পরিচ্ছদ মেঘ, তাঁহার মস্তকের উপরে মেঘধনুক, তাঁহার মুখ সূর্যতুল্য, তাঁহার চরণ অগ্নিস্তম্ভতুল্য এবং তাঁহার হস্তে খোলা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক।..." এই ধরনের অনেক অলৌকিক বিশ্বাসের কথা এই ধর্মগ্রন্থে রয়েছে। পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থেই এই জাতীয় উক্তি অসংখ্য রয়েছে। প্রাচীন সভ্যতার মিথকথা বা লোকপুরাণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যার ঐতিহ্য লুকিয়ে রয়েছে লোকসমাজের মৌখিক সংস্কৃতিতে।

আসিরীয় ঐতিহ্য ও একটি ব্যতিক্রমী লোককথা

আসিরিয়ার একটি লোককথা সারা পৃথিবীর লোককথা সংগ্রহের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। ৩০০০ বছর আগে লোককথাটি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার সীমান্ত পেরিয়েও এই লোককথার কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ রক্ষিত রয়েছে মিশরের আমার্‌না প্রত্নশালায়। এই লোককথার ব্যাবিলনীয় রূপটি যে ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে তা আবিষ্কৃত হয়েছে মিশরে। মিশরীয় পুরোহিতরা এই ফলক থেকেই কিউনিফর্ম লিপি শিক্ষা করত। সমস্ত পৃথিবীর লোককথা-লোকপুরাণে দেখতে পাই, মানুষ অমরত্বের সন্ধানে চলেছে। আর এই লোককথার নায়ক অমরত্বকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরে এসেছে মর্তে। জীবনের প্রতি এমন প্রগাঢ় ভালোবাসা ও আকর্ষণ যে কী করে সেই প্রাচীনকালের মানুষের ঐতিহ্যে রূপ পেল তা আজও এক বিস্ময়। পৃথিবীর জীবনে অনেক কষ্ট, তবু সে স্বর্গের অমৃত চায় না। কেননা, পৃথিবী সুন্দর। দেবরাজের ভিক্ষা ফিরিয়ে দেবার মতো বলিষ্ঠ মানসিকতা যে জনগোষ্ঠী প্রকাশ করতে পারেন, তাদের জীবনবোধ কত গভীর ছিল তা সহজেই অনুভব করা যায়।

লোককথার নায়কের নাম আদাপা, যার হিব্রু নাম আদম। তাঁই মেসোপটেমীয় সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আদাপার এই লোকপুরাণটি 'প্রথম মানুষের' কাহিনি। লোকপুরাণ থেকে জানা যায়, মানব আদাপা জ্ঞানের দেবতা ইয়া-র সন্তান। তিনি ছিলেন ব্যাবিলনের সবচেয়ে পুরনো শহর এরিডু-র পুরোহিত-সম্রাট। ইয়া আদাপাকে 'মানুষের আদর্শ' রূপে সৃষ্টি করেন। দেবতার সন্তান হলেও ইয়া তাকে জ্ঞানী করে তোলেন কিন্তু অমর জীবন দান করেননি। সাধারণত দেখা যায়, দেবতারা কোনো মানুষকে কখনও অমরত্ব দান করেন না, কিন্তু এই গল্পে আদাপাকে তারা অমরত্বের বর দিতে চেয়েছিলেন। সব দিক থেকেই 'আদাপা ও দখিনা বাতাস' একটি আশ্চর্য লোককথা।

এক যে ছিল কিশোর। নাম তার আদাপা। একদিন ভোরবেলায় সে গিয়েছে মাছ ধরতে। কী শান্ত সমুদ্র! আজ অনেক মাছ ধরা যাবে। কিশোর আদাপা খুব খুশি। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ঝড়ের বেগে দখিনা বাতাস বয়ে গেল। নৌকোর পাল হেলে পড়ল জলে, নৌকো কাত হয়ে উলটে গেল। আদাপা ছিটকে পড়ল জলে। সাঁতার কেটে তীরে এল। বালির ওপরে বসে হাঁপাতে লাগল। আর দখিনা বাতাস তার কানের চারপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বইছে আর হা হা করে হাসছে। হঠাৎ লাফিয়ে আদাপা অর্ধেক নারী অর্ধেক পাখি বিরাট দানবী দখিনা বাতাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জড়িয়ে ধরল তাকে, কিছু বুঝবার আগেই তার ডানাদুটো দুমড়ে ভেঙে দিল। হাওয়ায় দখিনা বাতাসের আর্তনাদ ভেসে আসছে। আদাপা দাঁড়িয়ে রয়েছে বীরের মতো।

দিন যায়, রাত বয়ে যায়। দখিনা বাতাস ফিরছে না। দেবতাদের রাজা আনু বসে আছেন স্বর্ণ-সিংহাসনে। সব দরজা-জানালা খোলা, তবু কেন দখিনা বাতাস ফিরছে না! অনেক সময় বয়ে গেল। দেবরাজ অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষকালে আনু একজন দেবদূতকে পৃথিবীতে পাঠালেন। দূত দেখল, দখিনা বাতাস বালুতীরে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। দূত তাকে তুলে নিয়ে দেবরাজের কাছে উড়ে গেল।

দেবরাজ তার ভৃত্যের এই দশা দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন। দেহ কাঁপছে, চোখ জ্বলছে। আদেশ দিলেন, যে মানুষ আমার ভৃত্যের এই দশা করেছে, তাকে নিয়ে এসো, এখুনি।

রাতের আঁধার। ঘুমিয়ে রয়েছে আদাপা। চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় তার ঘুম গেল ভেঙে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক আলোকিত দেহ, তার ডানাদুটো অল্প অল্প কাঁপছে।

আলোকিত দূত বলল, দেবরাজ আনু তোমায় ডেকেছেন। তোমায় যেতে হবে স্বর্গের বিচারসভায়।

আলোকিত দূত অদৃশ্য হল। বাবাকে জাগিয়ে তুলে আদাপা বলল, দেবরাজ আনু ভীষণ রেগে গিয়েছেন। আমি নাকি মস্ত অপরাধ করেছি। তিনি আমায় বিচারসভায় ডেকেছেন, আমার বিচার হবে।

বাবার বুক কেঁপে উঠল। তার যে আর কেউ নেই! চোখের কোল ভিজে উঠল। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাছা, দেবরাজ যখন ডেকেছেন তখন যেতেই হবে। শোকের পোশাক পরে তুমি যাবে। বিনয়ী হয়ে কথা কইবে। উদ্ধত হবে না। আবার অকারণে মাথাও নত করবে না। মধুর কথায় তার কাছে ক্ষমা চাইবে। কেন তুমি ডানা ভেঙেছ তা-ও বলবে। দেবরাজ যদি ক্ষমা করেন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে আমাদের এই পৃথিবীতে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। স্বর্গের কোনো খাবার খাবে না, কোনো পানীয় স্পর্শ করবে না। পৃথিবীকে যদি ভুলতে না চাও, তবে এই নিষেধের কথা মনে রেখো। পৃথিবী বড় সুন্দর।

অল্পক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবার দিকে, তারপরে রওনা দিল আদাপা। এক আশ্চর্য উপায়ে আদাপা স্বর্গের পথ পেয়ে গেল। পৌঁছে গেল মেঘের রাজ্যে। মেঘরাজ্যে দেবরাজের বিচারসভা। বিচারসভার দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন দৈত্য। তাদের দুপাশে বিশাল ডানা। মাথা নামিয়ে আদাপা তাদের অভিবাদন জানাল। বাঃ, বড় বিনয়ী মানুষ তো! তারা পথ ছেড়ে দিল।

বিচারসভার ঐশ্চর্য দেখে আদাপার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দেবতারা বসে রয়েছেন, তাদের পোশাক আকাশের তারায় খচিত। অপরূপ সুন্দর দেবতারা। মাঝখানে রয়েছেন দেবরাজ। সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল তিনি, চারিদিকে আভা। আদাপা হাঁটু ভেঙে বসে দেবরাজ ও দেবতাদের প্রণাম জানাল। আলোর ছটায় চোখ খুলে রাখা যায় না।

বাজ পড়ার শব্দ হল। দেবরাজ বললেন, মানুষ হয়ে এত সাহস কোথায় পেলে? আমার ভৃত্যের ডানা ভেঙেছ? কোথায় পেলে এমন সাহস?

আদাপা ভয় পেল না। কথা জড়িয়ে গেল না। বিনয়ী হয়ে মিষ্টি সুরে বলল, হে দেবরাজ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। দখিনা বাতাস আমার নৌকো উলটে দিয়েছিল। আমি মাছ ধরছিলাম। মাছ ধরতে না পারলে আমরা যে অনাহারে থাকব। হঠাৎ রেগে গেলাম, তার ডানাদুটো ভেঙে দিলাম। হ্যাঁ, আমিই ভেঙেছি। কিন্তু সত্যি বলছি, দখিনা বাতাস যে আপনার ভৃত্য রাগের মাথায় আমি সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। রাগ মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। সেই ভুলে আমি স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দার গায়ে হাত তুলেছিলাম। আমি অনুতপ্ত, আমায় ক্ষমা করুন।

তাকিয়ে রয়েছে আদাপা। চোখের সামনে ভেসে উঠল বাবার সেই সুন্দর মুখখানি। না, সে ভয় পায়নি। না, সে উদ্ধত হয়নি। না, সে মাথা নত করেনি।

দেবতারা বলে উঠলেন, ছোট্ট মানুষটি সত্যিই অনুতপ্ত। সে অপরাধ করেছে, অপরাধ বুঝে সে স্বীকারও করেছে। সে অনুতপ্ত।

দেবরাজ কথা বললেন। বাজ পড়ার শব্দ হল না। মধুর সংগীত ভেসে এল, ছোট্ট মানুষ তোমায় ভালো লেগেছে, কেননা তুমি অনুতপ্ত, তুমি ক্ষমা চেয়েছ। তোমায় ক্ষমা করলাম। কিন্তু তুমি আর পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না। স্বর্গরাজ্যে যা দেখে গেলে, পৃথিবীর মানুষকে তা জানাতে পারবে না, জানাতে দেব না। এটাই নিয়ম। আজ থেকে তুমি স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা হবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে। চিরকালের জন্য। অমর হয়ে রইবে তুমি। পৃথিবীর মানুষের মতো মৃত্যু তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না। স্বর্গীয় সুরা পান করে অমরত্ব লাভ কর। দূত, ওকে সুরার পাত্র এগিয়ে দাও।

মেঘের আড়াল থেকে দূত এগিয়ে আসছে। আলোকিত দূতের হাতে সুরার পাত্র। স্বর্গীয় সুরা। বাবার মুখ ভেসে উঠল। দূত আরও এগিয়ে আসছে। আরও কাছে। সুরার পাত্রে বাবার মুখ ভেসে উঠছে। আদাপা দেবরাজের পায়ের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাতরভাবে বলে উঠল, ওগো দেবরাজ, তুমি রুষ্ট হয়ো না, তুমি আমায় ক্ষমা করো। তোমার তুচ্ছ সৃষ্টিকে ক্ষমা করো। আমি তোমার স্বর্গীয় সুরা পান করতে পারব না। কিছুতেই পারব না।

বাজ পড়ার শব্দ হল। প্রতিধ্বনি তুলে সে শব্দ শতগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আগুনের মতো রাঙা হয়ে দেবরাজ বললেন, আমার দেওয়া প্রসাদ তুমি ফিরিয়ে দিলে? স্বর্গীয় সুরা পান করতে অস্বীকার করলে? বুঝেছি, তুমি

ভেবেছ আমি তোমায় বিষ পান করতে দিয়েছি? এ সুরা পান করলে তুমি বুঝি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে? হতচ্ছাড়া খুদে মানুষ কোথাকার! মনে শুধুই বদ বুদ্ধি। আমি তোমায় দেবতার আসনে বসাতে চেয়েছিলাম, অমরত্বের স্বাদ পেতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সহ্য হল না।

বাজের শব্দ থেমে গেল। মাথা নত করে আদাপা বলে চলল, ওগো দেবরাজ, তা নয়। আমি ভুল বুঝিনি। তুমি সত্যের পিতা, তুমি সত্যকে জানো। আমি তা ভাবিনি। আমি করুণার দানকে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দেবরাজ, আমি যে তার উপযুক্ত নই। আমি সামান্য মানুষ। তোমার বিচারসভায় আসবার আগে আমি আমার বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি তুমি আমায় ক্ষমা কর, তবে আমি তাড়াতাড়ি বাবার কাছে ফিরে যাব। তুমি ক্ষমা করেছ, তাই আমি ফিরে যেতে যাই। বাবা বলেছে, পৃথিবী বড় সুন্দর। তুমি আমায় ফিরে যেতে আদেশ দাও দেবরাজ।

আদাপা করুণ চোখে চেয়ে রইল দেবরাজের মুখের দিকে। দেবরাজের রাগ মিলিয়ে গেল, অদ্ভুত হাসি ফুটল মুখে। তার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, তিনি বললেন, পৃথিবী বড় সুন্দর! ফিরে যেতে চাও সেখানে? বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ? অমরত্ব চাও না? বেশ তাই হবে। ফিরে যাও পৃথিবীতে। সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, দুঃখ, কষ্ট, রোগজ্বালা, বার্ধক্যে নুয়ে পড়া, কান্না আর ভয়াবহ মৃত্যু। এই তো মানুষের ভাগ্য! এ যদি তোমার ভালো লাগে, ফিরে যাও তোমার সুন্দর পৃথিবীতে।

আদাপার মুখে হাসি। সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আদাপা পৃথিবীর পথে রওনা দিল।

হ্যাঁ, আদাপা পৃথিবীতে ফিরে এল। সে অমরত্ব চায়নি। সে দেবরাজের ভিক্ষা মাথা পেতে নেয়নি। তার প্রসাদ ফিরিয়ে দিয়ে বাবার আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে। দেবরাজের চেয়েও আদাপার কাছে তার বাবা অনেক বড়। অমর হয়ে মেঘরাজ্যে দেবলোকে সে শান্তিতে থাকতে চায়নি। সে মেনে নিয়েছে মানুষের সহজ আনন্দকে, মানুষের দুঃখ-কষ্টকে— সব মানুষ যেভাবে বাঁচবে মরবে, সেও হবে তার অংশীদার। অনেক কষ্ট জীবনে, তবু পৃথিবী বড় সুন্দর। আদাপার পৃথিবী, মানুষের পৃথিবী।

অপরাজেয় মানুষের, অপরূপ পৃথিবীর অনন্য এক সজীব চিত্রশালা হল হাট-বাটের মানুষের এইসব লোককথা। লোকপুরাণের কল্পনায় আদাপা

যদি আদি মানব হন, তাহলে আদাপার পার্থিব ভালোবাসার কাহিনিটি বোধহয় যুক্তিবাদী মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন উজ্জ্বল সম্পদ।

এই সময়কালের একটি আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় ফলকে একটি অসাধারণ পশুকথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। 'এটানা'র কাহিনির সঙ্গে এটি যুক্ত রয়েছে। একটি ঈগল ও সাপের পশুকথা।

সেই আদ্দিকালে ছিল এক ঈগল আর এক সাপ। তারা শপথ করল, তাদের বন্ধুত্ব কোনোদিন নষ্ট হবে না। এক গাছের মগডালে থাকত সেই পাখি, বাসায় তার অনেক ছানাপোনা। সাপ থাকত গাছের গোড়ায় এক কোটরে, তারও ছিল অনেক ছানাপোনা। তারা দুজনে দুজনের ছেলে-মেয়েকে দেখাশোনা করত, খাবার এনে খাওয়াত। খুব মিল দুই বন্ধুতে। এমনি করে সুখে-শান্তিতে দিন কাটতে লাগল।

কেটে গেল অনেক দিন। হঠাৎ ঈগলের মনে পাপ ঢুকল, তার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলল। সে পুরনো শপথ ভুলে গেল। একদিন সাপ বেরিয়েছে শিকারে, তখন তার কোটরে পাহারা দেবার কথা ঈগলের। কিন্তু ঈগল লোভে পড়ে সাপের সব বাচ্চা খেয়ে ফেলল। সাপ ফিরে এসে দেখে, তার কোটর শূন্য, সেখানে তার কোনো বাচ্চা নেই। সাপ সব বুঝল।

সাপ সূর্যদেবতা শামাশ-এর কাছে প্রার্থনা জানাল, ঈগলের এই কাজের প্রতিশোধ চাই। দেবতার পরামর্শে সাপ একটা মরা গোরুর পেটের মধ্যে লুকিয়ে রইল। ঈগল মরা গোরু দেখে উড়ে এসে তার ওপরে বসল। বসার সঙ্গে সঙ্গে সাপ ঈগলকে জড়িয়ে ধরল এমনভাবে যে তার ডানা গেল ভেঙে। তারপরে তাকে বন্দি করে একটা গর্তে রেখে দিল। ঈগল কাঁদতে কাঁদতে সূর্যদেবতার করুণা চাইল। চাইলেই কি করুণা পাওয়া যায়? কোনো ফল হল না।

এদিকে এটানার বউয়ের ছেলে জন্মাবার সময় এমন অবস্থা হল, এই বুঝি বউ মারা যায়। শামাশ-এর পরামর্শে এটানা ঈগলকে মুক্ত করে দিল, তার আঘাত ভালো করে দিল, কেননা এই বিশাল পাখি তাকে বয়ে নিয়ে স্বর্গে যাবে। স্বর্গে এটানা পাবে একটি সঞ্জীবনী গাছ যা বউকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে। ঈগল মুক্ত হয়ে কৃতজ্ঞতায় এটানাকে নিয়ে চলল স্বর্গের পথে, স্বর্গরানি ইশটার-এর সিংহাসনের দিকে। ওপরে, ওপরে, আরও ওপরে উঠছে ঈগল, তার ডানায় বসে রয়েছে এটানা। পৃথিবীকে মনে হচ্ছে

এই এতটুকু, সমুদ্রকে মনে হচ্ছে যেন ছোট্ট একটা ঝুড়ি। কিন্তু ইশটার-এর সিংহাসনের কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই ঈগল ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল, পাক খেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল। পড়ে গেল নীচের পৃথিবীতে।

পুরোহিতদের হাতে পড়ে এই পশুকথায় কিছু পৌরাণিক দেবদেবীর নাম ঢুকে গিয়েছে। শেষদিকে এটানাকে এনে কাহিনিরও রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। কিন্তু কাহিনির প্রথমাংশে একটি নিটোল পশুকথা রয়েছে। ইউরোপ ও এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারতে এই ধরনের পশুকথাব বিভিন্ন রূপ পাওয়া গিয়েছে।

এই সময়ের কিছু পরবর্তীকালে একটি ব্যাবিলনীয় লোককথা পাওয়া গিয়েছে, স্বর্গরানি ইশটার-এর সমুদ্রতলে অভিযান। এই কাহিনির অনুরূপ অনেক লোককথা হাঙ্গেরি, ইউগোশ্লাভিয়া, পোর্তুগাল ও স্পেনে পাওয়া গিয়েছে। রানি চলেছেন সমুদ্রতলে মৃত্যুর রাজ্যে। দূরে জলের স্তরে স্তরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরী। রানি যেই আসেন একজনের সামনে প্রহরী তার কাছে একটি পোশাক চায়। রানি পোশাক খুলে তাকে দেন, নইলে যে প্রবেশের অধিকার পাবেন না! পোশাক দিচ্ছেন রানি, আরও নীচে চলেছেন তিনি। শেষকালে রানি যখন একেবারে নীচে মৃতের রাজ্যে পৌঁছলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাবরণ। ফিরবার সময় রানি আবার এক এক করে তার সব পোশাক ফিরে পেলেন। ভারত-আফ্রিকার কিছু রূপকথায় নিষিদ্ধ এলাকায় যাওয়ার সময় প্রহরীর কাছে দেহের গয়না খুলে দেবার কথা রয়েছে।

বৃহৎকথা-বৃহৎকথামঞ্জরী-কথাসরিৎসাগর

বৃহৎকথা

প্রাচীন ভারতবর্ষের লোককথা সংগ্রাহকদের মধ্যে গুণাঢ্য একটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি লোকসমাজের মৌখিক ভাষায় লোককথা সংকলন করেছিলেন। যে ভাষায় পিতামহ পিতামহী উত্তরপুরুষকে প্রাণের আপন সম্পদ লোককথা শোনান, হুবহু সেই লৌকিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন গুণাঢ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষে লিখিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রভাবের যুগে তিনি পৈশাচী ভাষাতেই তার লোককথা লিপিবদ্ধ করে যান। এ এক সাহসিক ব্যতিক্রম। অবশ্য তার ফলও তাকে ভোগ করতে হয়েছে। তার সম্পাদিত বৃহৎকথার কোনো পুথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। বস্তুবাদী চার্বাক-পন্থীদের যেমন সমস্ত পুথি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, জনগণের মৌখিক ভাষায় লিখিত গুণাঢ্যের গ্রন্থেরও কি সেই একই দশা ঘটেছিল? অন্তত গুণাঢ্যকে কেন্দ্র করে যে কিংবদন্তি রয়েছে তার মধ্যে এই সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যায়।

চার্বাক-পন্থীদের বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্যই তাদের কিছু বক্তব্য পরবর্তী কালের গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাদের মূল গ্রন্থগুলি ভস্মীভূত হয়েছিল। গুণাঢ্যের পুথির কি পরিণতি ঘটেছিল তার কোনো ইতিহাস নেই। তবে, পিতার মৃত্যুর পরে যেমন তার চিন্তা-ভাবনা-আদর্শ পুত্রের মধ্যে সার্থক হয়ে ওঠে, তেমনি গুণাঢ্যের বৃহৎকথার 'মৃত্যু'র পরে অনেক গ্রন্থে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে। চার্বাক-পন্থীদের যেমন বিরূপতা সহ্য করতে হয়েছিল পরবর্তী যুগে, গুণাঢ্যকে তা সইতে হয়নি। সকলেই পরম শ্রদ্ধায় গুণাঢ্যের নামের উল্লেখ করেছেন।

এক সময় কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত গুণাঢ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। এরা বাল্মীকি-বেদব্যাস সম্পর্কেও একই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু গুণাঢ্য সম্পর্কে সংশয়ের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৃহৎকথার উল্লেখ রয়েছে বারবার, গুণাঢ্য সম্পর্কে রয়েছে সভক্তি উক্তি। কবি বাণভট্ট জানিয়েছেন, সেকালে উজ্জয়িনীর অধিবাসীবৃন্দের অতিপ্রিয় গ্রন্থ ছিল রামায়ণ মহাভারত ও বৃহৎকথা। কবি গোবর্ধন রামায়ণ মহাভারত ও বৃহৎকথার তিন কবিকে প্রণাম জানিয়ে তার গ্রন্থ সপ্তশতী শুরু করেছেন। গুণাঢ্যের প্রতি এই কবির যে কী অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল তা উপলব্ধি করা যায় যখন তিনি বলেন, ব্যাসদেব ও গুণাঢ্য একই ব্যক্তি, ব্যাসদেবই পরবর্তী জন্মে গুণাঢ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই জন্মান্তর গ্রহণের বিষয়টিতে হয়তো আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু কবি হিসেবে গুণাঢ্যকে যে সম্মান জানানো হল তাতেই প্রাচীন ভারতবর্ষে গুণাঢ্যের সামাজিক অবস্থান অনুভব করা যায়। 'নেপাল মাহাত্ম্য' গ্রন্থে রয়েছে, গুণাঢ্য বাল্মীকির মতো মহান কবি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক সময় ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করেছিল। কম্বোজ দেশের একটি শিলালিপি এই সূত্রে স্মরণীয়। নবম শতাব্দীর এই শিলালিপিটি সংস্কৃতে উৎকীর্ণ। এতে প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত কবিদের নাম লিখিত রয়েছে আর এইসব কবির নামের মধ্যে একটি নাম রয়েছে, সে নাম গুণাঢ্যের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য ভারতীয় সংস্কৃতি-বলয়েও গুণাঢ্যের খ্যাতি যে ছড়িয়ে পড়েছিল তারও অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। দশরূপ ও নলচম্পা গ্রন্থে এবং বাসবদত্তা গ্রন্থের কুসুমপুর বর্ণনায় বৃহৎকথার উল্লেখ

আছে। আর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী ও সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগর।

এত সব লিখিত প্রমাণের পরে গুণাঢ্যের অস্তিত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। শুধু কষ্ট হয় এই ভেবে, এই মহৎ জনদরদি কবির কোনো পুথি আজও আবিষ্কৃত হল না। লোকসমাজের ভাষাকে, ব্রাত্যজনের লৌকিক সংস্কৃতিকে যিনি এমনভাবে মর্যাদা দিলেন তার সংকলিত পুথি কোথায় হারিয়ে গেল!

যে কবির পুথি পাওয়া যায়নি তার অস্তিত্বের সময়সীমা নির্ধারণ করা বড় সহজ নয়। কিন্তু অন্যান্য উৎস থেকে গুণাঢ্যের কাল নির্ণয় করেছেন পণ্ডিতেরা। বাণভট্ট ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমবয়সি। হর্ষের জন্ম ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে, বাণভট্টেরও কাছকাছি সময়ে। সেই বাণভট্ট যখন গুণাঢ্যের উল্লেখ করেছেন তখন তিনি নিঃসন্দেহে বাণভট্টের পূর্ববর্তী কবি। বাণভট্টের কাদম্বরীতে উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনায় রয়েছে, বৃহৎকথাকুশলেন, আর হর্ষচরিতে রয়েছে, হরলীলেবলোকস্যাবিস্ময়ায় বৃহৎকথা। পণ্ডিতেরা বলেছেন, কবি গুণাঢ্য খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন।

কবি গুণাঢ্য ও বৃহৎকথা সম্পর্কে সেইকালে যে কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল তার বিস্তৃত কাহিনি রয়েছে সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে।

গুণাঢ্য শাপগ্রস্ত একজন মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবী পার্বতী এই শাপ দিয়েছিলেন।

নগাধিরাজ হিমালয়ের এমন মহিমা ছিল যে ত্রিজগতের জননী পার্বতী তার কন্যাত্ব স্বীকার করেছিলেন। সেই পার্বতী একদিন একান্তে শিবের কোলে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছেন, এমন সময় পার্বতী বললেন, আমি একটা নতুন কাহিনি শুনতে চাই। শিব বললেন, বর্তমান, ভূত এবং ভবিষ্যতের এমন কোনো কাহিনি নেই যা পার্বতী জানে না। শিবের সোহাগে শিবপ্রিয়া প্রীতা হলেন, বারবার অনুরোধ জানালেন। শিব তখন ব্রহ্মা-নারায়ণ-দক্ষ প্রভৃতির কথা শোনালেন। কিন্তু এসব কাহিনি পার্বতীর জানা । তখন শিব বললেন, এইবার তোমাকে সেই নতুন কথা শোনাব। আদেশ দেওয়া হল, তারা যেখানে আছেন সেই রুদ্ধদ্বারে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। নন্দী দ্বার রক্ষা করতে লাগলেন আর শিব একান্তে কাহিনি বলতে লাগলেন।

শিব ভেতরে গল্প করছেন, তখন তার প্রিয় সহচর পুষ্পদন্ত সেখানে এল। নন্দী তাকে ভেতরে যেতে নিষেধ করল। আর তখনই পুষ্পদন্তের কৌতূহল গেল বেড়ে। সে যোগবলে অদৃশ্য হয়ে ঘরে ঢুকল ও সব কাহিনি শুনল। এমন সুন্দর কাহিনি কি কাউকে না বলে থাকা যায়? পুষ্পদন্ত স্ত্রী জয়াকে সেইসব কাহিনি বলল। মেয়েরা তো কোনো কথাই গোপন করতে পারে না। জয়া পার্বতীকে সব কাহিনি বলল। পার্বতী ভাবলেন, তাহলে শিব তো তাকে অজানা কোনো কাহিনি বলেননি? শিব বললেন, পুষ্পদন্ত অদৃশ্য হয়ে ঘরে ঢুকে কাহিনি শুনেছে, তারপরে বলেছে জয়াকে। জয়া ও পুষ্পদন্ত ছাড়া ওসব কাহিনি কেউ শোনেনি।

দেবী পার্বতী পুষ্পদন্তকে ডাকলেন, কাঁপতে কাঁপতে সে এল। দেবী অভিসম্পাত দিলেন, তুই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবি।

শিবের অন্য সহচর মাল্যবান পুষ্পদন্তের হয়ে কথা বললে দেবী তাকেও অভিশাপ দিলেন।

শেষে রাগ পড়ে এলে পার্বতী বললেন, কুবের শাপ দিয়েছিলেন যক্ষ সুপ্রতীককে, সে এখন পিশাচ-যোনি প্রাপ্ত হয়ে কাণভূতি নামে বিন্ধ্যপর্বতে বাস করছে। তার সঙ্গে দেখা হলে আগের কথা স্মরণ করে এই কথা তাকে বললে পুষ্পদন্ত তুমি শাপমুক্ত হবে। আর মাল্যবান যখন এই কাহিনি কাণভূতির কাছে শুনবে তখন কাণভূতির শাপমুক্তি ঘটবে এবং মাল্যবান তুমি এই কাহিনি পৃথিবীতে প্রচার করলে তোমারও শাপমুক্তি ঘটবে।

একদিন গৌরী শিবকে বললেন, যে দুজন শ্রেষ্ঠ প্রমথকে অভিশাপ দিয়েছিলাম, পৃথিবীতে তারা কোথায় জন্মেছে?

শিব বললেন, প্রিয়ে, পুষ্পদন্ত কৌশাম্বী মহানগরে বররুচি নামে আর অন্য জন মাল্যবান সুপ্রতিষ্ঠিত নামক নগরে গুণাঢ্য নামে জন্মগ্রহণ করেছে।

অনুচরদের অবমাননার কথা মনে পড়াতে বিষণ্ণ চিত্তে এই কথা বলে কল্পতরু বৃক্ষশাখা দ্বারা আচ্ছাদিত কৈলাস পর্বতের সানুদেশে লীলাকুঞ্জে শিব আপন দয়িতার সঙ্গে বাস করতে লাগলেন।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে গুণাঢ্য পিশাচদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। তিনি পিশাচদের ভাষা শিখলেন। তারপরে পৈশাচী ভাষায় সাত লক্ষ শ্লোকে সপ্তবিদ্যাধর কাহিনি রচনা করলেন। সাত বছর সময় লাগল। বিদ্যাধরেরা যাতে এইসব শ্লোক চুরি করতে না পারে তার জন্য কালির

অভাবে মহাকবি নিজের রক্ত দিয়ে এ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ভাবলেন, এই বৃহৎকথা আমাকে পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে। তখন গুণদেব ও নন্দীদেব নামে তার দুই শিষ্য বললেন, কেবলমাত্র শ্রুতকীর্তি রাজা সাতবাহনই এই কাব্য প্রচার করতে পারবেন। কেননা, তিনি রসগ্রাহী, অনিল-চালিত পুষ্পের সুগন্ধির মতো তিনি এই কাব্য দিকে দিকে প্রেরণ করতে পারবেন।

তখন গুণাঢ্য এই দুজন শিষ্যের হাতে পুথি দিয়ে রাজার কাছে পাঠালেন। বিদ্যামদগর্বে গর্বিত রাজা বললেন, সাত লক্ষ শ্লোক খুবই মূল্যবান, কিন্তু এ নীরস পৈশাচী ভাষায় লিখিত, এই পৈশাচিক কাহিনিকে ধিক।

শিষ্যেরা পুথি নিয়ে ফিরে এল। গুণাঢ্য জনবিহীন রম্য শৈলে গিয়ে প্রথমে একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করলেন। তারপর পশু ও পাখিদের কাছে এক এক পাতা পড়েন আর আগুনে ফেলে দেন। পুথির আয়তন কমতে লাগল। শিষ্য দুজন নীরবে কাঁদছেন ও সেই করুণ দৃশ্য দেখছেন। কিন্তু শিষ্যেরা খুব পছন্দ করেছিল বলে নরবাহনদত্তের চরিত অংশটি অবশিষ্ট রাখলেন, গুরু এই এক লক্ষ শ্লোক আগুনে দিলেন না। গুরুদেব যখন এই দিব্যকাহিনি পাঠ করতেন তখন বনের সব পশু-পাখি আহার ভুলে গোল হয়ে সেখানে বসে থাকত আর চোখের জলে সিক্ত হয়ে সেই সব কাহিনি শুনত।

এখন হয়েছে কী, রাজা সাতবাহন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বৈদ্যরা বললেন, অপুষ্ট মাংস খেয়েই রাজার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যারা রান্না করে তাদের বকাবকি করা হল, তারা বলল, ব্যাধেরা আমাদের এই মাংসই দিচ্ছে। ব্যাধদের তিরস্কার করা হলে তারা জানাল, অল্পদূরে ওই যে পাথর রয়েছে, তার ওপরে বসে একজন ব্রাহ্মণ এক এক পাতা কী যেন পড়ছে আর আগুনে দিচ্ছে। সব জন্তু-জানোয়ার ওখানেই বসে থাকে, তারা খাওয়া-দাওয়া ভুলে গিয়েছে। না খেয়ে খেয়ে পশু-পাখিরা অমন অপুষ্ট হয়ে পড়েছে।

ব্যাধদের কথা শুনে তাদের দেখানো পথ দিয়ে রাজা চললেন বনে। রাজা গুণাঢ্যকে চিনতে পারলেন। গুণাঢ্য সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে বললেন। শেষে জানালেন, ছয় লক্ষ শ্লোক সমন্বিত ছয়টি কাহিনি আমি দগ্ধ করেছি, রয়েছে আর এক লক্ষ শ্লোক। আপনি গ্রহণ করুন। আমার দুই শিষ্য আপনার কাছে শ্লোকের ব্যাখ্যা করবে।

রাজা নিজের কাজের জন্য অনুশোচনা করলেন এবং সপ্তম বিদ্যাধর নরবাহনদত্তের কাহিনিযুক্ত এক লক্ষ শ্লোকের পুথি গ্রহণ করলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করে পৃথিবীতে প্রচার করলেন।

কিংবদন্তির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কিছু সত্য লুকিয়ে থাকে। বৃহৎকথার মাধুর্য বোঝাতে এখানে মুগ্ধ পশু-পাখিকে শ্রোতা করা হয়েছে, এমন অপরূপ কাহিনি যা শুনে তারা খাওয়া-দাওয়ার কথাও ভুলে যায়। গুণাঢ্যের অসাধারণত্ব বোঝাতে তাকে শাপগ্রস্ত দেব-সহচর হিসেবে দেখানো হয়েছে। এসব কিংবদন্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু এর মধ্যে একটি সত্য অন্তত লুকিয়ে রয়েছে, গুণাঢ্য সেকালের ব্রাত্যজনের মৌখিক ভাষাকে তার পুথির ভাষার মাধ্যম করেছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় নয়, গুণাঢ্য কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তৎকালীন সমাজে ধিক্কৃত এক ভাষায়। তথাকথিত অন্ত্যজ লোকসমাজের মৌখিক লোকসাহিত্যের ভাষা ছিল এই পৈশাচী। সেইকালে পৈশাচী ভাষায় জনগোষ্ঠীতে প্রচারিত রূপকথা পশুকথা প্রেমকাহিনি সংগ্রহ করেছিলেন গুণাঢ্য। লৌকিক মানসিকতার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ ছিল বলেই তিনি এই ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। এই পৈশাচী ভাষার সঙ্গে গান্ধারীর খুব মিল ছিল। পৈশাচী ভাষী মানুষ সম্পর্কে সেকালের ধারণা ছিল খুব খারাপ, আট রকমের বিবাহের মধ্যে পৈশাচ বিবাহ অধম। পিশাচ-পৈশাচিক-পৈশাচী শব্দগুলির মধ্য দিয়ে অমানবিক নির্মম পাশবিক ভাবনাই প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সময়েই গুণাঢ্য এই ভাষাকেই অবলম্বন করলেন। এই ভাষার প্রতি প্রীতি তাকে সাহসী করে তুলেছিল। আর বিদ্যামদগর্বে গর্বিত রাজা অপবিত্র ভাষাকে শোধন করে নিয়ে তবেই তাকে গ্রহণ করলেন। অপবিত্র ধিক অসংস্কৃত পুথিকে সংস্কার করে সংস্কৃত বৃহৎকথার জন্ম দিলেন।

স্টেন কোনো মন্তব্য করেছেন,গুণাঢ্যের বৃহৎকথা বিন্ধ্যপ্রদেশেই বেশি জনপ্রিয় ছিল। এই এলাকায় প্রাচীন জনবসতি আর্য নয়, এখানে সেই কালে দ্রাবিড় অথবা কোল গোষ্ঠী কিংবা দ্রাবিড়-কোল মিশ্রিত জনজাতির বসতি ছিল। তাই মনে হয় বৃহৎকথার অনেক লোককথা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে।

কোনোর এই অনুমানের কিছু ভিত্তি রয়েছে। গুণাঢ্যের দুই শিষ্যের দৈহিক যে বর্ণনা রাজা দিয়েছেন ও সেই সঙ্গে পৈশাচী ভাষা ব্যবহারের যে প্রসঙ্গ এসেছে তাতে আদিবাসী উৎসটির সম্পর্কে ধারণা করা চলে।

সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত এই বৃহৎকথার কোনো পুথি যদি আবিষ্কৃত হত, তাহলেও আমরা গুণাঢ্যের সংকলিত লোককথার সন্ধান পেতাম। কিন্তু সে পুথিও আবিষ্কৃত হয়নি। গুণাঢ্যের গ্রন্থের পরিচয় পেতে হচ্ছে মূলত অন্য তিনটি গ্রন্থের মাধ্যমে।

প্রথম গ্রন্থটি হল বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ, রচয়িতা বুদ্ধস্বামী। নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে পুথিটি আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই খণ্ডিত পুথিতে রয়েছে ৮৫৩৯ টি শ্লোক। পুথিটি সম্ভবত লেখা হয় অষ্টম-নবম শতকে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হল একাদশ শতকের বৃহৎকথামঞ্জরী, পুথিকার ক্ষেমেন্দ্র। তৃতীয় গ্রন্থটি হল একাদশ শতকের কথাসরিৎসাগর, রচয়িতা সোমদেব ভট্ট। অন্য উপায় নেই, বুদ্ধস্বামী-ক্ষেমেন্দ্র-সোমদেবের গ্রন্থ থেকেই গুণাঢ্যের বৃহৎকথার ভাষান্তরিত রূপের কিছু পরিচয় পেতে হবে।

বৃহৎকথামঞ্জরী

বৃহৎকথার কাশ্মীরী রূপকে অবলম্বন ও অনুকরণ করে সংস্কৃত ভাষায় বৃহৎকথামঞ্জরী লেখেন কবি ক্ষেমেন্দ্র। গ্রন্থটি ছন্দে রচিত। একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে (১০৪০ খ্রিস্টাব্দে) পুথিটি সংকলিত হয়। সেইকালে কাশ্মীরে বৃহৎকথার যে পুথি প্রচলিত ছিল তার আয়তন নাকি ছিল বিশাল। ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন, সাধারণ মানুষ এই গ্রন্থের রস সঠিকভাবে উপভোগ করতে পারত না, তাই মূল গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ করে রচিত হল তার গ্রন্থ। এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ক্ষেমেন্দ্র চেয়েছিলেন তার পুথি সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়ে প্রচারিত হোক। সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পর্কে এই ধরনের আশা পোষণ করা বেশ অভিনব। কেননা, অধিকাংশ গ্রন্থাকারই চাইতেন তার পুথি বিদগ্ধজনের মন জয় করুক। গুণাঢ্যের মানসিকতার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন ক্ষেমেন্দ্র।

ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে আঠারোটি লম্বক বা অধ্যায় রয়েছে, এই একই সংখ্যক লম্বক রয়েছে সোমদেবের গ্রন্থে। প্রথম পাঁচটি লম্বক দুই গ্রন্থেই একই রকমের কিন্তু পরবর্তী লম্বকগুলিতে দুজন একই পারম্পর্য রক্ষা করেননি। তবে দুটি গ্রন্থের কাহিনি, পাত্র-পাত্রী, সমাজচিত্র, বিন্যাস-পদ্ধতি প্রভৃতি আলোচনা করলে অনুভব করা যায়, দুজনের গ্রন্থের

উৎস একই। সম্পাদনার সময় স্বাভাবিকভাবেই দুজন সংকলক দুভাবে তাদের গ্রন্থকে সাজিয়েছেন। ব্যক্তিরুচি সক্রিয় ছিল।

ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থ তিরিশ বছর আগে সংকলিত। তাই মনে হয়, তিনি গুণাঢ্যকে বেশি অনুসরণ করেছেন। তার গ্রন্থ প্রচারিত হবার পরে সোমদেব স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা স্বতন্ত্র হতে চাইবেন। বিশাল ভারতবর্ষের দুপ্রান্তে এই দুটি গ্রন্থ সংকলিত হলে মাত্র তিরিশ বছরের মধ্যে হাতেলেখা পুথি অন্যজনের নজরে নাও আসতে পারে। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব দুজনেই কাশ্মীরের মানুষ। তাই মনে হয় ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থ থেকে তার গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সোমদেব যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

দুজনের সম্পাদিত গ্রন্থেই আমরা পাচ্ছি একই নামের আঠারোটি লম্বক। কথাপীঠ কথামুখ লাবানক নরবাহনদত্তজনন চতুর্দারিকা সূর্যপ্রভ মদনমঞ্চুকা বেলা শশাঙ্কবতী বিষমশীল মদিরাবতী পদ্মাবতী পঞ্চ রত্নপ্রভা অলঙ্কারবতী শক্তিযশ মহাভিষেক সুরতমঞ্জরী। দুজনের সাজানো ক্রম অবশ্য এক নয়।

তাই লোককথাগুলির বিশ্লেষণ করবার সময় দুটি গ্রন্থ একই সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, সোমদেব অনেক পরিণত সম্পাদক।

কথাসরিৎসাগর

গুণাঢ্যের বৃহৎকথাকে অবলম্বন করে যে ক'টি গ্রন্থ পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে, কথাসরিৎসাগর তাদের মধ্যে আয়তনে যেমন সবচেয়ে বড় তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সোমদেব তার গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলেছেন, অশেষ পদার্থ যার আলোকবর্তিকায় দীপ্ত হয়, সেই বাগ্‌দেবীকে প্রণাম করে 'বৃহৎকথার' সার সংগ্রহ করে এই আখ্যায়িকা রচনা করছি। পূর্বসূরির প্রতি অকপট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন সোমদেব।

আঠারোটি লম্বকের নাম বলার পর বৃহৎকথা সম্পর্কে সোমদেব আবার বলেছেন, এই গ্রন্থ মূলানুযায়ী। মূল গ্রন্থকে কোথাও লংঘন করা হয়নি। এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে মূল গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রথিত হতে পারে। অন্বয়ের ঔচিত্য এবং কাব্যাংশের যোজনা দ্বারা গল্পের রস যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। নিজের

পাণ্ডিত্য দেখাবার প্রয়াস না করে যাতে নানা গল্পের সমন্বয় করা যায় সেই চেষ্টাই করেছি।

এই স্বীকারোক্তির মধ্যে রয়েছে বিনয়, অন্যধারে গ্রন্থকারের সততাও প্রকাশ পেয়েছে— তিনি মূল গ্রন্থকে লঙ্ঘন করতে চাননি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, গুণাঢ্যের গ্রন্থ সোমদেবের কাছে ছিল। তৃতীয় শতকের পুথি একাদশ শতকেও বর্তমান ছিল। সোমদেবের উক্তি থেকেই গুণাঢ্য ও তার বৃহৎকথার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। একাদশ শতকেও যে গ্রন্থের বাস্তব উপস্থিতি জানা গেল, তার বিনষ্টির ইতিহাস বড় বিস্ময়কর।

এই স্বীকারোক্তির পরেই সোমদেব শুনিয়েছেন শিব-পার্বতী-পুষ্পদন্ত-মাল্যবান-গুণাঢ্যের কিংবদন্তি। শুরু হল কথাসরিৎসাগর।

বৃহৎকথামঞ্জরীর তিরিশ বছর পরে ১০৭০ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত হয় কথাসরিৎসাগর। কাশ্মীরে তখন রাজত্ব করছেন রাজা অবন্তীবর্মা। কিংবদন্তি রয়েছে, রাজা অবন্তীবর্মার রানি বিদুষী সূর্যবতীর অনুপ্রেরণায় সোমদেব কথাসরিৎসাগর সংকলন করেন। রাজমহিষী নাকি বলেছিলেন. বৃহৎকথামঞ্জরী সুখপাঠ্য গ্রন্থ নয়, আর অতি সংক্ষিপ্ত। তাই সুখপাঠ্য ও বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করলেন সোমদেব। কাশ্মীরে তখন চরম বিশৃঙ্খলা; রাজপুত্র পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পারিপার্শ্বিক আরও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে রানি চরম মানসিক অশান্তির মধ্যে দিনরাত কাটাচ্ছেন। এই অবস্থায় রানির চিত্ত বিনোদনের জন্য সভাকবি সোমদেব রচনা করলেন তার অমর গ্রন্থ। শোনা যায়, প্রথম বারে পিতা পুত্রকে দমন করেছিলেন, কিন্তু সুযোগ বুঝে পুত্র আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পুত্রের এই আচরণে মর্মাহত হয়ে রাজা আত্মহত্যা করেন। রানি হন সহমৃতা।

সোমদেব তার গ্রন্থে বলেছেন, গুণাঢ্যের বৃহৎকথার কাহিনিগুলি লোকের মুখে মুখে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিশ্লেষণ সঠিক নয়। লোকের মুখের কাহিনি সংকলন করেছিলেন গুণাঢ্য, তাই কয়েকশো বছর পরে সেইসব কাহিনির প্রচার দেখে সোমদেবের এই ভুল ধারণা জন্মেছিল। যে পুথি সংস্কৃতে লেখা কিংবা পৈশাচীতেও যদি লেখা হয় তা সেইকালে ব্যাপকভাবে প্রচারের কোনো অনুকূল পরিবেশ বা মাধ্যম ছিল না। আসলে, লোকসমাজের সম্পদ ও মানসিকতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও

তাচ্ছিল্য থেকেই এই বিপরীত ধারণা জন্মায়। এই গ্রন্থের প্রথমাংশে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

কথাসরিৎসাগরে রয়েছে বাইশ হাজার শ্লোক। ছোট-বড় প্রায় নশোটি কাহিনি এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, বৌদ্ধ জাতক, পঞ্চতন্ত্রে এমন কাহিনি রয়েছে যা পাওয়া যাবে পরবর্তীকালের কথাসরিৎসাগরে। মূল উৎস লোকসমাজ থেকেই এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল।

বৃহৎকথামঞ্জরী কিংবা কথাসরিৎসাগরের মূল কাহিনি হয়তো উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের বিষয়। সোমদেব মূল কাহিনি যে বিষয়কে কেন্দ্র করে গ্রথিত করেছেন তা হল উদয়ন-বাসবদত্তা-পুত্র নববাহনদত্ত-পুত্রবধূ মদনমঞ্চুকার কাহিনি। কিন্তু এই কাহিনির মালা গাঁথতে গিয়ে তিনি অসংখ্য রূপকথা পশুকথা কিংবদন্তিকে সংকলন করেছেন। লোকসংস্কৃতি আলোচনার প্রসঙ্গে তাই বৃহৎকথা-বৃহৎকথামঞ্জরী-কথাসরিৎসাগর এত গুরুত্বপূর্ণ। কথাসরিৎসাগরে বীরত্ব ও প্রেমই মূল চালিকাশক্তি, কিন্তু লোকজীবনের মৌখিক সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জনমানসের অপরূপ দর্পণ হিসেবেও গ্রন্থটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই গ্রন্থে বৎসরাজ উদয়ন ও চণ্ডমহাসেনের কন্যা রানি বাসবদত্তার যে অপরূপ প্রেমকাহিনি হাজার বছর ধরে ভারতীয়, ইরানীয়, আরবীয় ও ইউরোপীয় রসিক পাঠককে মুগ্ধ করে এসেছে, সেই কাহিনির প্রাচীনতম ও সরল রূপটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী অথবা তারও পূর্ববর্তী পালি 'জাতকত্থাকথা'য়।

এই উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনি সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, এই আখ্যায়িকা প্রথম থেকেই প্রাচীন যুগে ভারতীয় জনগণের হৃদয় অধিকার করে অতিমাত্রায় সর্বজনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে স্থাপত্যশিল্পের ও অন্যান্য শিলাপটের ক্ষোদিত চারুকলায় যে সমস্ত ভারতীয় কাহিনি রূপলাভ করেছিল, এই আখ্যায়িকা থেকে গৃহীত বিষয়বস্তুসমূহ তার সুপ্রাচীন নিদর্শন। আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কালিদাস তার মেঘদূত কাব্যে এই প্রাচীন কাহিনির জনপ্রিয়তার উল্লেখ করেছেন। রামায়ণ কাহিনির সাম্প্রতিক গবেষকদের

কারও মতে এই আখ্যায়িকাটি হয়তো রামসীতার কাহিনির পূর্ণ আকার পাওয়ার আগেই প্রচলিত ছিল।

তাহলে কি এই অনুমান সত্য যে, উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনির আদি বীজ নিহিত ছিল লৌকিক ঐতিহ্যে? লৌকিক উৎস থেকে এই কাহিনি যখন বিদগ্ধ নাগরিক কবিদের হাতে পড়ল, তখন থেকেই এর বিবর্তন শুরু হল? 'জাতকত্থাকথা'য় রয়েছে বলেই শুধু নয়, এর সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তার জন্যও বিষয়টি একেবারেই অনুমান-নির্ভর নয় বলেই মনে হয়।

সোমদেব ভট্ট ছিলেন রাজসভার কবি, বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাই তার গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে কবির সমশ্রেণিভুক্ত ও সমমানসিকতাভাবাপন্ন পাত্র-পাত্রী। নাগরিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে, বারাণসী-পাটলিপুত্র-উজ্জয়িনী-কৌশাম্বী-শ্রাবস্তী নগরীর অধিবাসীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। রাজা-রানি-অমাত্য-বণিক-সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী-বৌদ্ধ ভিক্ষু-পতিতা-জুয়াড়ি প্রভৃতির অংসখ্য কাহিনি রয়েছে। কিন্তু এসবের মধ্যেই লৌকিক কাহিনিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজসভার বিদগ্ধ পণ্ডিত-কবি আমাদের যখন লৌকিক ঐতিহ্যের কাহিনি শুনিয়েছেন তখন তার মধ্যে সংকলক-সম্পাদকের পরিশীলিত ভাবনা কাজ করেছে। অনেক সময়েই লৌকিক মানসিকতার মধ্যে নাগরিক বোধ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তবুও লোকঐতিহ্যের স্বরূপটি চিনে নিতে খুব অসুবিধা হয় না। কাহিনির মূল কাঠামোটি বিশ্লেষণ করলেই তা ধরা পড়ে।

জাতকের আলোচনায় চুল্লকশ্রেষ্ঠি-জাতক গল্পটি বলেছি। কথাসরিৎ-সাগরে 'মূষিক-বণিকের কথা' রয়েছে প্রথম লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গে। কাহিনিটি হল:

এক বণিক ছিল। তার জন্মের আগেই তার বাবা মারা যায়। শরিকরা তার মায়ের সব কিছু দখল করে নিল। বণিক তখন মায়ের পেটে, ছেলের যদি কোনো ক্ষতি করে ওরা এই ভেবে তার মা তার বাবার এক পুরনো বন্ধুর বাড়ি চলে গেল। সেখানে বণিকের জন্ম হল। দিনরাত খাটত সেই মা, অনেক কষ্টে আধপেটা খেয়ে মা ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করল। বণিক লেখাপড়া শিখল। একদিন শিক্ষক বললেন, তুমি বণিকের ছেলে, এবার ব্যাবসা-বাণিজ্যে মন দাও। বিশাখিল রাজ্যে এক মহাধনী বণিক আছে। তুমি তার কাছে যাও, তার কাছ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে বাণিজ্য করো।

বণিক গেল মহধনী বণিকের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকেই সে শুনতে পেল, মহাধনী অন্য এক বণিকপুত্রকে রেগে বলছে, যার চেষ্টা আছে সে এই মরা ইঁদুরকে নিয়েও ধনলাভ করতে পারে। তোমাকে যে এত টাকা দিলাম, তা দিয়ে আরও অর্থ উপার্জন করতে পারলে না, উলটে সবই খরচ করে ফেললে? অপদার্থ কোথাকার!

এই কথা শুনে গরিব বণিক বলল, আগাম কিছু অর্থ দিয়ে আমি এই ইঁদুরটা আপনার কাছ থেকে কিনে নিলাম।

এক বণিকের বেড়ালের জন্য দরকার পড়ল একটা ইঁদুরের। বণিক দু'মুঠো ছোলা নিয়ে মরা ইঁদুর তাকে দিয়ে দিল। সেই ছোলা গুঁড়িয়ে এক কলসি জল নিয়ে বণিক নগরের বাইরে এক গাছের নীচে বসে রইল। কাঠুরিয়ারা সেই ছোলা-জল খেয়ে তাকে দু'টুকরো কাঠ দিল। সেই কাঠ বিক্রি করে আরও বেশি ছোলা কিনে জল বয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে বসে রইল। কাঠুরিয়ারা আরও কাঠ দিল। এমনি করে তার পুঁজি বাড়তে লাগল। শেষকালে সে নিজেই অনেক কাঠ কিনল। হঠাৎ বর্ষা নামল। বৃষ্টি আর থামে না। কাঠের খুব অভাব দেখা দিল। আকালের দিনে সেই কাঠ বিক্রি করে বণিক অনেক টাকা পেল। সেই টাকা দিয়ে বণিক একটা দোকান খুলে ব্যাবসা করতে লাগল। ধীরে ধীরে সেই দোকান থেকে সে খুব ধনী হয়ে উঠল। একদিন সে একটা সোনার ইঁদুর তৈরি করে মহাধনীকে উপহার দিল। মহধনী সব শুনে নিজের মেয়ের সঙ্গে বণিকের বিয়ে দিল।

চুল্লকশ্রেষ্ঠি-জাতক কাহিনিটি বেশ জটিল, আর এই কাহিনিটি খুব সরল। সোমদেব যদি জাতকের কাহিনিটি থেকে এই কাহিনি গ্রহণ করতেন তাহলে এত পরিবর্তন ঘটত না। অথচ বোঝা যাচ্ছে, দুটি কাহিনির গড়ন, পাত্র-পাত্রী, বিন্যাস ও মূল বক্তব্য একই। আসলে, একই লোককথার দুটি ভিন্ন রূপ, অঞ্চলভেদে দুরকম কাহিনি গড়ে উঠেছে। জাতককার একটি এলাকা থেকে তার কাহিনি সংগ্রহ করেছেন আর সোমদেব অন্য এলাকা থেকে তার কাহিনি সংগ্রহ করেছেন। যদি গুণাঢ্যের গ্রন্থ এই কাহিনির উৎস হয়, তবে গুণাঢ্যই অন্য এলাকার গল্প সংগ্রহ করেছিলেন। লোককথার বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সংগ্রাহক এভাবেই সংকলন করে থাকেন।

প্রথম লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গে 'মায়া উদ্যানের কাহিনি'টি একটি কিংবদন্তি। এ ধরনের অসংখ্য কিংবদন্তি ভারতীয় লোকসমাজে ছড়িয়ে আছে।

উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল এলাকায়, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার তুম্বুনি এলাকায় ও বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার ঈশ্বরদিতে এই ধরনের কিংবদন্তি শুনেছি। অনেক গ্রন্থেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই একইরকম কাহিনি।

নর্মদা নদীর তীরে একজন লোক ছিল। সে ছিল যেমন কুঁড়ে তেমনি গরিব। তাকে কেউ ভিক্ষেও দিত না। বেঁচে থেকে লাভ কী? সে বেরিয়ে পড়ল। নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন এল এক পাহাড়ি জঙ্গলে। সেখানে ছিল দেবী দুর্গার এক মন্দির। সে ভাবল, লোকেরা দেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এখানে পশু বলি দেয়। আমি তো পশুরও অধম; আমি নিজেকেই বলি দেব। এই ভেবে সে একটা খড়্গ তুলে নিল, নিজের গলায় কোপ বসাতে যাবে এমন সময় দেবী তাকে বললেন, তুমি আত্মঘাতী হয়ো না, আমার কাছেই থাকো। সেইদিন থেকে তার খিদে-তেষ্টা চলে গেল। সেখানে থাকতে থাকতে একদিন দেবী বললেন, তুমি অন্য কোথাও গিয়ে একটা সুন্দর বাগান তৈরি করো, এই নাও গাছের বীজ। সে গোদাবরী নদীর পাশে গিয়ে সুন্দর বাগান তৈরি করল। আসলে এই বাগান দেবী দুর্গার কৃপায় এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

প্রথম লম্বকের সপ্তম তরঙ্গে 'ইন্দ্র ও শিবিরাজার কাহিনি' শুনিয়েছেন সোমদেব। মহাভারত কিংবা জাতকের কাহিনির অনুরূপ, কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সোমদেব বলেছেন, পৃথিবীতে কখনও কখনও এইরকম ঘটে থাকে। যথা:

অনেক কাল আগে শিবি নামে এক রাজা ছিলেন। তাকে বঞ্চনা করবার জন্য ইন্দ্র বাজপাখির রূপ ধরে মায়াকপোতরূপী ধর্মের পেছনে ধাওয়া করলেন। ভয় পেয়ে কপোত শিবির কোলে লুকিয়ে পড়ল। বাজপাখি মানুষের গলায় বলল, কপোত আমার খাদ্য, আমি ক্ষুধার্ত, কপোতকে আমার হাতে দাও। ওকে না পেলে খিদের জ্বালায় এক্ষুনি আমি মরে যাব। তোমার ধর্ম তখন কোথায় থাকবে?

শিবি বললেন, ওকে আমি আশ্রয় দিয়েছি, এর পরিবর্তে সমান মাংস তোমায় দিচ্ছি।

বাজ বলল, বেশ তাই হবে। কিন্তু তোমার নিজের দেহের মাংস আমাকে দিতে হবে।

রাজা রাজি হয়ে নিজের দেহের মাংস কেটে তুলাদণ্ডে চাপালেন। কিন্তু কপোতের সমান ওজন আর কিছুতেই হয় না। তখন রাজা নিজেই তুলাদণ্ডে চেপে বসলেন। দৈববাণী হল, সাধু, এবার সমপরিমাণ মাংস হল।

তখন ইন্দ্র ও ধর্ম ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজেদের রূপ ধরলেন, রাজাকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন। শিবি আগের দেহ ফিরে পেলেন।

অন্য যে দুটি গ্রন্থে শিবি বা উশীনরের উপাখ্যান রয়েছে তা কিছুটা জটিল। এই সরল কাহিনিটি অনেক বেশি লৌকিক।

প্রথম লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গে শিবশর্মার যে কাহিনি রয়েছে তার মূল অংশটি ভারতীয় লোকসমাজে খুব জনপ্রিয়। বোকা রাজার দেশে সন্ন্যাসী ও শিষ্য গিয়েছিল, শিষ্য কীভাবে বিপদে পড়েছিল, তার কাহিনি ছড়িয়ে আছে প্রায় সর্বত্র। গ্রামীণ মানুষের কাছে গল্পটি অতি পরিচিত। কথাসরিৎসাগরে একটু অন্যভাবে কাহিনিটি বলা হয়েছে। কিন্তু বক্তব্য এক। উপস্থাপনের নতুনত্ব ঘটাতে গিয়ে সোমদেব লৌকিক ঐতিহ্যকে কিছুটা ব্যাহত করেছেন।

বহুকাল আগে আদিত্যবর্মা নামে এক রাজা ছিলেন। তার মন্ত্রীর নাম ছিল শিবশর্মা, সে খুব বুদ্ধিমান। রাজার ছিল অনেক রানি। এক রানি গর্ভবতী হল। রাজা রক্ষীকে জিজ্ঞেস করল, দুবছর অন্তঃপুরে ঢুকিনি, তাহলে রানি গর্ভবতী হল কেমন করে?

রক্ষী বলল, আপনার মন্ত্রী শিবশর্মা ছাড়া কোনো পুরুষ অন্তঃপুরে ঢুকতে পারে না, আপনার আদেশ নেই। তিনিই অবাধে অন্তঃপুরে ঢোকেন।

রাজা মনে মনে চিন্তা করলেন, এই মন্ত্রী রাজদ্রোহী। কিন্তু সবার সামনে আমি যদি একে হত্যা করি, তবে আমার নিন্দে রটবে।

তখন রাজা মন্ত্রীকে পাঠালেন তার বন্ধু এক রাজার কাছে। সেই রাজার নাম ভোগবর্মা। সেইসঙ্গে গোপনে এক দূতকেও ভোগবর্মার কাছে পাঠালেন একটা চিঠি দিয়ে। চিঠিতে লেখা রয়েছে— শিবশর্মাকে হত্যা করবে।

শিবশর্মা সেই রাজ্যে গেল। দূতও উপস্থিত হল। শিবশর্মা তক্ষুনি বলল, আমাকে এখুনি বধ করুন। যদি আপনি আমাকে বধ না করেন, তবে আমি নিজেই আমার মৃত্যু ঘটাব।

ভোগবর্মা এই কথা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, সে কী কথা? এর তাৎপর্য কী? যদি খুলে না বল তবে আমি তোমায় অভিশাপ দেব।

শিবশর্মা বলল, রাজা, যে দেশের মাটিতে আমাকে বধ করা হবে, বিধির বিধানে সেই দেশে বারো বছর ধরে একটানা খরা হবে, একফোঁটাও বৃষ্টি হবে না।

রাজা ভোগবর্মা নিজের মন্ত্রীর সঙ্গে অনেক আলোচনা করে বললেন, ওই রাজা আদিত্যবর্মা আমার রাজ্যের ধ্বংস কামনা করছে। ইচ্ছে করলে মন্ত্রী শিবশর্মাকে হত্যা করবার জন্য সে কি গুপ্তঘাতককে নিয়োগ করতে পারত না? এই মন্ত্রীকে আমরা কোনোভাবেই হত্যা করব না, নিজে যাতে আত্মঘাতী না হয় তাও দেখতে হবে।

রাজা রক্ষী নিয়োগ করলেন, শিবশর্মাকে দেশান্তরে পাঠিয়ে দিলেন। নিজের বুদ্ধিবলে শিবশর্মা বেঁচে গেলেন।

তৃতীয় লম্বকের প্রথক তরঙ্গে 'ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথা' রয়েছে। একটি সুপরিচিত লোককথা। কালিম্পং শহর থেকে মাইল দুয়েক দুরে ফালুকোট নামে একটি গ্রাম রয়েছে। ডা. গ্রেহাম্‌স্ স্কুলের পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পাহাড়ি পথে বেশ কিছুদূরে হাঁটলে পড়বে এই গ্রাম। সেখানে এক নেপালি বৃদ্ধার মুখে এই কাহিনি শুনেছি। বৃদ্ধা তুঁতগাছে রেশমগুটির চাষ করেন। ওড়িশার চাঁদিপুরে নুলিয়াদের মুখে এবং নদিয়া জেলার শান্তিপুরে একজন মুসলমান কৃষকের মুখে এই 'কিস্‌সা' শুনেছি। বাংলার গ্রাম-গঞ্জে প্রকাশিত 'কিস্‌সা কাহিনির' অনেক হেটো বইতে এই কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে। সোমদেবের হাতে পড়ে কাহিনি কিছুটা পরিশীলিত হয়েছে।

জাহ্নবীতীরে এক নগরী আছে, তার নাম মাকন্দিকা। পুরাকালে সেখানে থাকত এক সন্ন্যাসী। সে ছিল মৌনব্রতধারী। ভিক্ষা করে তার জীবন চলত। তার ছিল কিছু সন্ন্যাসী শিষ্য।

একদিন মৌনী সাধু ভিক্ষা করতে এসেছে এক বণিকের বাড়িতে। বণিকের সুন্দরী কুমারী মেয়ে ভিক্ষা দিতে দোরে এল। তার রূপ দেখে সাধুর মনে কুচিন্তা জেগে উঠল। বলে ফেলল, হায়! কী কষ্ট!

তার কথা বণিকের কানে গেল। বণিক অবাক হল। বেরিয়ে এসে বলল, আপনি মৌনব্রত ভেঙে কথা বলে উঠলেন কেন?

সাধু বলল, তোমার ওই মেয়ের অনেক অশুভ লক্ষণ আছে। এই মেয়ের বিয়ে দিলে তুমি, তোমার বউ, তোমার ছেলেরা সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। তুমি আমার ভক্ত বলে তোমার মঙ্গল চিন্তা করেই আমি ওই

কথা বলেছি, তোমার জন্যই আমার ব্রত ভেঙেছি। আজ রাতে তুমি তোমার মেয়েকে একটা কাঠের সিন্দুকে ভরে তার ওপরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবে। যদি বাঁচতে চাও।

তাই করব সাধুবাবা— এই কথা বলে বণিক ঘরে চলে এল। খুব কষ্ট হতে লাগল, তবু সাধুর কথামতো বণিক তাই করল।

এদিকে আশ্রমে ফিরে এসে সাধু শিষ্যদের বলল, তোমরা গঙ্গাতীরে যাও। দেখবে, একটা কাঠের সিন্দুক ভেসে যাচ্ছে, তার ওপরে প্রদীপ জ্বালানো। গোপনে সেই সিন্দুক এখানে নিয়ে আসবে। সিন্দুকের ভেতরে যদি কোনো শব্দ শুনতেও পাও সিন্দুক খুলবে না।

আদেশ পেয়ে শিষ্যেরা গঙ্গার তীরে পৌঁছবার আগেই এক রাজপুত্র এল গঙ্গার তীরে। সে এসেছিল স্নান করতে। প্রদীপ-জ্বালা সেই সিন্দুককে দেখতে পেয়ে রাজপুত্র তার পরিচারকদের আদেশ দিল, ওটাকে তীরে নিয়ে এসো। সিন্দুকের ডালা খুলে রাজপুত্র অবাক হয়ে গেল। মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজাপুত্র গান্ধর্বমতে বিয়ে করল। তারপরে সিন্দুকের মধ্যে দুর্দান্ত এক বানরকে ঢুকিয়ে আবার ভাসিয়ে দিল।

রাজপুত্র-মেয়ে সেখান থেকে চলে গেলে শিষ্যেরা গঙ্গাতীরে এল। সিন্দুক দেখতে পেয়ে তীরে নিয়ে এল, তারপরে নিয়ে গেল সাধুর কাছে।

সাধুর মনে আর আনন্দ ধরে না। সে বলল, আমি এই সিন্দুককে নিয়ে আশ্রমের ওপরের তলায় যাচ্ছি, একে মন্ত্র পড়ে শুদ্ধ করতে হবে। তোমরা সবাই নীচের তলায় থাকো।

বণিকের সুন্দরী মেয়েকে দেখবার জন্য সাধু ছটফট করতে লাগল। তাড়াতাড়ি সিন্দুকের ডালা খুলে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে এল দুর্দান্ত বানর। বানর রেগে গিয়ে আক্রমণ করল সাধুকে, দাঁত দিয়ে কামড়ে তার নাক কেটে নিল, নখ দিয়ে খামচে তার কান ছিঁড়ে নিল। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সাধু নীচে নেমে এল। তার অবস্থা দেখে শিষ্যেরা অতিকষ্টে হাসি চেপে রইল। তার পরের দিন সাধুর অবস্থা শুনে সবাই হাসতে লাগল। বণিক খুব খুশি হল— যাক, তার মেয়ে খুব ভালো বর পেয়েছে।

সোমদেবের বলা এই কাহিনি বেশ পরিশীলিত। কিন্তু লোককথায় যা শুনেছি ও হেটো বইতে যা পড়েছি তা অনেক বেশি স্থূল। সেইসব কাহিনিতে

সাধু বা ফকিরের দেহগত কামনার কথা অতি স্পষ্টভাবে অশালীন ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ লম্বকের সপ্তম তরঙ্গে একটি পশুকথা রয়েছে, 'বেজি-প্যাঁচা-বেড়াল ও ইঁদুরের কাহিনি'। এই গ্রন্থের 'মহাভারতের পশুকথা-রূপকথা' অংশে ইঁদুর পলিত-বেড়াল লোমশ-বেজি হরিত-প্যাঁচা চন্দ্রকের যে কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছি, সেই একই পশুকথা রয়েছে কথাসরিৎসাগরের এই কাহিনির মধ্যে। শুধু মহাভারতে গভীর তত্ত্বকথার প্রাধান্য রয়েছে, ইঁদুর-বেড়ালের কথাবার্তার মধ্যে রাজনীতি-ব্যবহারনীতি প্রকাশ পেয়েছে আর সোমদেবের গ্রন্থে সরলভাবে পশুকথাটি শোনানো হয়েছে। শেষে রয়েছে নীতিকথার একটি বাক্য— অবস্থাবশে শত্রু কখনও মিত্র হয়, কিন্তু চিরকাল সে মিত্র থাকে না। মহাভারতে ইঁদুর-বেড়ালের সংলাপের মাধ্যমে এক ধরনের নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন মহাভারতকার, আর সোমদেব লৌকিক পশুকথাটি সোজাসুজি বলেছেন। সোমদেবের সংকলিত কাহিনিটি বেশি লৌকিক।

কথাসরিৎসাগরে লিপিবদ্ধ এই ধরনের অসংখ্য কাহিনি বিশ্লেষণ করে ও তাদের মোটিফ-রূপরীতি বিচার করে বোঝা যায়, সোমদেব লৌকিক ঐতিহ্যের সম্পদের ওপরে ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায়, গুণাঢ্য যে লোক-ঐতিহ্যের মৌখিক সম্পদকে তার গ্রন্থে সংকলিত করেছিলেন, সোমদেব 'মূলানুযায়ী' সেই গ্রন্থের 'সার সংগ্রহ' করে এবং মূল কাহিনিগুলিকে কোথাও 'লঙ্ঘন' না করে এইসব কাহিনি 'গ্রথিত' করেছেন।

প্রাচীন গ্রিস ও ঈশপের নীতিকথা

প্রাচীন গ্রিস

প্রাচীন গ্রিসের ইলিয়াড ও ওডিসির লোককথা-মিথ ছাড়াও ক্লাসিক্যাল অনেক মিথের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলো প্রাথমিক অবস্থায় গ্রিসের পশুপালক-মৎস্যজীবীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরে শিক্ষিত কথক ও চারণকবিদের হাতে পড়ে সেগুলি পরিশীলিত আকারে লিপিবদ্ধ হয়। লোকসমাজের লৌকিক সম্পদ যে কীভাবে প্রাজ্ঞ মানুষের হাতে পরিবর্তিত হয়েছে, উনিশ বিশ শতকের গ্রিসের নৃবিজ্ঞানীরা তার অনেক প্রমাণ দিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি মিথের উল্লেখ করব যেটি নৃবিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছিলেন গ্রিসের দক্ষিণ অংশের একটি দ্বীপ করিন্থের সর্ব দক্ষিণের কালামাই অঞ্চল থেকে। মিথটি প্রমিথিউসের। অনেক সাদৃশ্য থাকলেও প্রমিথিউসের ক্লাসিক্যাল মিথের সঙ্গে পার্থক্যও অনেক। এই অংশের আলোচনার শেষে মিথটি দেওয়া হল।

মিথ বা লোকপুরাণের সঙ্গে ধর্মীয় ভাবনার যোগ রয়েছে বলে অনেকের ধারণা। ধারণার পেছনে তথ্য রয়েছে। কিন্তু গ্রিসের লৌকিক মিথে ধর্মের কোনো বিষয় ছিল না। পরবর্তীকালে ক্লাসিক্যাল মিথে রূপান্তরের সময় ধর্মীয় ভাবনা যুক্ত হয়। গ্রিক পুরাণ-বিশেষজ্ঞ এডিথ হ্যামিলটন বলেছেন— Greek mythology is largely made up of stories about gods and goddesses, but it must not be read as a kind of Greek Bible, an account of the Greek religion. According to the most modern idea, a real myth has nothing to do with religion.

মিথের কাহিনিগুলি যে প্রাথমিক বিজ্ঞান তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় রয়েছে গ্রিসের মিথসমূহে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক জগতে যা কিছু ঘটছে— সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র, বৃক্ষ-ফুল-পাতা, মানুষ-পশু-পাখি, বন্যা-ভূমিকম্প-বজ্র-বিদ্যুৎ-আগ্নেয়গিরি সবের কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্নে একের পর এক মিথকথার জন্ম হয়েছে। বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতা অবশ্যই ছিল কিন্তু গল্পগুলোর মধ্যে লোকসমাজ নির্ভেজাল আনন্দ পেতে চেয়েছে। শীতকালের দীর্ঘ সন্ধ্যায় পরস্পর পরস্পরকে এসব গল্পগাছা বলে নিজে আনন্দ পেয়েছে, অন্যকে আনন্দ দিতে সচেষ্ট হয়েছে।

অনেক গবেষণার পরে নৃবিজ্ঞানী ও পুরাণতত্ত্ববিদেরা জেনেছেন, গ্রিসের মিথকথার অসংখ্য সংকলন করেন অ্যাপোলোডোরাস নামে একজন লেখক। বিপুল মিথকথা সংগ্রহ করেছিলেন, নিঃসন্দেহে সেসবের ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে, কিন্তু অনেকেই বলেছেন তাঁর লিখবার ভঙ্গি একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু সত্যিকার গবেষক সংগ্রাহকের কাছে এই বিষয়টিই চান। তিনি যেভাবে শুনেছেন লোকসামাজের কাছে, সেভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কারণে আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদদের কাছে অ্যাপোলোডোরাসের গুরুত্ব অন্য মাত্রা পেয়েছে।

তাঁর সংকলনে যেমন ইলিয়াড-ওডিসির মিথ রয়েছে তেমনি এই দুই গ্রন্থের বাইরের অনেক মিথও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেবতা, বিশ্বসৃষ্টি, প্রাচীন বীরেরা, বারোজন মহান অলিম্পিয়ান, জলদেবতা, পাতাল, অল্পখ্যাত দেবতারা, ইউরোপা, পুষ্পকেন্দ্রিক মিথ— নারসিসাস হায়াসিন্থ অ্যাডেনিস্, প্রেমিকদের আটটি সংক্ষিপ্ত কাহিনি— অনেক মিথের সংকলন।

অ্যাপোলোডোরাসের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ১৮০ অব্দে। শুধু মিথ নয় নানাবিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল। এই গুণ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু ও শিক্ষক অ্যারিস্‌টারকাসের কাছ থেকে। অ্যাপোলোডোরাস খ্রিস্টপূর্ব ১৪০ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে পারগামাম শহরের দিকে যাত্রা করেন। শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এথেন্স শহরে। গ্রিক ইতিহাসের 'ক্রনিক্‌ল্'-এর লেখক হিসেবে তিনি আজও পরম শ্রদ্ধেয়।

অন্য একজন গ্রিক মিথকথার সংগ্রাহক হলেন পাউসানিয়াস। ইনি ছিলেন একজন অতি উৎসাহী অভিযাত্রী, ভ্রমণের নেশা ছিল তার স্বভাবে। তিনি দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের মানুষ। অভিযানের নেশা তাঁকে একদিন প্রখ্যাত ভূগোল-বিশেষজ্ঞ করে তোলে। তিনি ছিলেন লিডিয়ার আদি বাসিন্দা।

গ্রিস সম্পর্কে ও সেখানকার লোককথা মিথকথা লিখবার আগে তিনি ভ্রমণ করেন এশিয়া মাইনর, সিরিয়া প্যালেস্টাইন, মিশর, ম্যাসিডোনিয়া, এপিরাস ও ইতালির একাংশ। 'ডেসক্রিপশান অব গ্রিস'-এর দশটি গ্রন্থে সেই বিবরণ রয়েছে। অনন্য পাণ্ডিত্যের প্রকাশ।

পরবর্তী সময়ে তিনি গ্রিসের অতীত গৌরব বিষয়ে উৎসাহী হন। লিখতে শুরু করেন অলিম্পিয়া ও ডেলফির শিল্প ও স্থাপত্য, ম্যারাথন ও প্লাটিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র, বিখ্যাত মানুষের সমাধি, গৌরবগাথা, লোককথার বীরদের বীরত্বকথা— যেন প্রাচীন গ্রিস মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর লেখায়। তাই বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী জে. জি. ফ্রেজার বলেছেন— without him the ruins of Greece would for the most part be a labyrinth without a clue, a riddle without an answer. এই উক্তি থেকেই পাউসানিয়াসের অনন্যতা অনুভব করা যায়।

গ্রিসের মিথকথার সে সংকলন পাউসানিয়াস করেছেন তা শুধুই খেয়ালখুশির সংকলন নয়। তিনি অত্যন্ত সচেতন সংগ্রাহক ছিলেন, কোথাও কোনো শিথিলতা নেই। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর আন্তরিকতা।

পিন্‌ডার— গ্রিসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। কিন্তু তাঁর গীতিকবিতার মাধ্যমে তিনি গ্রিসের লোকপুরাণের কথা শুনিয়েছেন। তাঁর মিথকথার বর্ণনা বড় হৃদয়গ্রাহী।

পিন্‌ডার-এর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৫১৮ অব্দে এবং মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ৪৩৮ অব্দে। তিনি সেকালের গ্রিসের একজন অনন্য বিচিত্রগামী প্রতিভাধর মানুষ

ছিলেন। সংগীতজ্ঞ হিসেবে ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাঁর জীবিতকালে তিনিই ছিলেন গ্রিসের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। কাব্যের মাধ্যমে গ্রিসের মিথগুলির কাহিনিগুলিকে এমন অনন্য হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে আর কেউ পারেননি।

গ্রিক কবি হেসিওড সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম অব্দের মানুষ। পিতার মৃত্যুর পরে ছোট ভাই পারসেস-এর সঙ্গে সম্পত্তির বিবাদে বঞ্চিত হন হেসিওড। কিন্তু শুধুমাত্র বুদ্ধি ও পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি জীবনে সফল হন। আর আলস্যের কারণে ছোট ভাই হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত।

হেসিওডের 'ওয়ার্কস অ্যান্ড ডেজ' একটি নীতিমূলক শিক্ষামূলক কাব্য। কিন্তু সেই কাব্যের মধ্যে গ্রিসের মিথের অনেক কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে। টাইটান প্রমিথিউস কীভাবে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করলেন, লুকিয়ে রাখলেন নলখাগড়ার মধ্যে, জিউস শাস্তি দিলেন, প্রথম নারী প্যানডোরার সৃষ্টি— অনেক মিথকথা বলেছেন অনন্য কাব্যিক ভঙ্গিতে।

হেসিওডের বর্ণিত মিথকথার বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো লেখকের বর্ণনায় পাওয়া যায় না। তিনি অন্যভাবে গ্রিসের ইতিহাস ও মিথকে দেখেছেন। তিনি ছিলেন সবসময় শ্রমজীবী ও অত্যাচারী মানুষের সপক্ষে। গ্রিসের মিথকথার মধ্যে যেখানে সাধারণ অবমানিত মানুষ রয়েছেন, তিনি তাদের গৌরবগাথা বলেছেন— Hesiod has nothing to tell of the glorious deeds of godlike kings. His theme is the hard life of the peasants, a life made harder still by the injustice of a decadent aristocracy.

হেসিওডের এই মানসিকতা বিশ শতকের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধাদের মানসিকতার সঙ্গে মিলে যায়। বিস্ময়কর লাগে হেসিওডের সেদিনের ব্যতিক্রমী উচ্চারণ।

গ্রিসের লোককথা-লোকপুরাণ-মিথের লিখিত উৎস সম্পর্কে স্টিথ টমসন বলেছেন,— All show us that we are here very close to a narrative form and to narrative material familiar to us in modern folktale of the European peasant.

গ্রিসের কৃষকসমাজ থেকে সংগৃহীত প্রমিথিউসের কাহিনিটি জানলে আমরা বুঝতে পারব ক্লাসিক্যাল মিথের সঙ্গে আদি রূপের ভিন্নতা কোথায়।

লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য থেকে কীভাবে লিখিত রূপ পায়, কীভাবে পরিবর্তিত হয় তার দৃষ্টান্ত হিসেবে এই গ্রিক মিথটি নীচে দেওয়া হল।

প্রাচীন পৌরাণিক দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও পরিচিত 'কালচার হিরো' হলেন প্রমিথিউস ও হারকিউলিস। দুজনের জীবনের সঙ্গেও একটি মহান কর্তব্য জড়িয়ে রয়েছে। প্রমিথিউসের কাহিনি নানা কবি নানাভাবে বলেছেন। আজ আমরা যেসব কাহিনিসূত্র থেকে মূল গল্পটি পেয়েছি তা গ্রিসের ঈস্‌কাইলাস থেকে তার সাড়ে চারশো বছর পরের রোমান কবি ওভিদ পর্যন্ত বয়ে এসেছে। অবশ্য ওভিদের কাহিনি বর্ণনা অনেক লঘু ও কিছুটা মজার। যত কবিই প্রমিথিউসের এই কাহিনিটি বলুন না কেন এর মূল স্রষ্টা গ্রিসের লোকসমাজ। লোকজীবনের এই কাহিনিই পরবর্তীকালে উচ্চতর সাহিত্যের কবিকুল লিপিবদ্ধ করেন, অবশ্য কিছুটা নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে।

মৌখিক লোকসাহিত্য লিখিত রূপ ধারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতকারণেই পরিবর্তিত হয়েছে। সেকালে সেটাই ছিল স্বাভাবিক।

প্রমিথিউস-এর আত্মত্যাগ বড় সুন্দরভাবে বলেছিল আইও। শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের দিকে এগিয়ে আসছে একটি গো-শাবক, কিন্তু তার কণ্ঠ 'মনুষ্য-কন্যার' মতো। সে আইও। সে প্রমিথিউসকে জানত, সে তার কথা জানত। সে বলেছিল,

You, he who succored the whole race of men?
You, that Prometheus, the daring, the enduring?

প্রমিথিউস সংক্ষেপে তার পরিচয় দিয়েছিলেন:

You see Prometheus who gave mortals fire. এই আইও-র উত্তরপুরুষ হলেন হারকিউলিস, বীরশ্রেষ্ঠ। দেবতারাও তার কাছে নিষ্প্রভ। প্রমিথিউস যন্ত্রণাকাতর হয়েও কোনোদিন আশাহত হননি। শৃঙ্খলিত জীবনের শেষে মুক্তির আকাশের স্বপ্ন দেখেছেন। সেই বলিষ্ঠ উত্তরসূরি একদিন আসবে যে শৃঙ্খলিত পরাধীন পূর্বপুরুষের গ্লানি ধুয়ে দেবে। একথা প্রমিথিউস জানতেন।

Know this, that from your race will spring
One glorious with the bow, bold-hearted,
And he shall set me free.

প্রমিথিউসের সেই উদ্দীপনাময় কাহিনি একটু আগে থেকে জানা দরকার। প্রমিথিউসের গোটা চরিত্র ও মহানুভবতা তাতে স্পষ্ট হবে। তার আত্মত্যাগের অতীত ঐতিহ্য রয়েছে, হঠাৎ উত্তেজনার বশে তিনি একাজ করেননি। এখানেই প্রমিথিউস চরিত্রের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

দেবরাজ জিউস স্বর্গ ও পৃথিবীর অধীশ্বর হলেন। তিনি নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। আগে ছিল অনন্ত বসন্ত। তিনি সেই কালকে বিভক্ত করলেন। অসহ্য গ্রীষ্ম, হাড়-কাঁপানো শীত, তার মাঝে আরও দুটো মনোরম সহনীয় ঋতু। এর ফলে আরও পরিবর্তন ঘটল। মানষ তীব্র গরম ও তুষার-পড়া শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বাড়ি তৈরি করল, কোথাও বা গুহায় আস্তানা বাঁধল। ঋতুর পরিবর্তনে কিছু গুল্ম-গাছ জন্মাল। আবার কিছু শুকিয়েও গেল। মানুষ কৃষিকাজ শিখল, মানুষ সঞ্চয় শিখল। ফসলের বাড়তি অংশ তারা রেখে দিত, চারিদিকে যখন বরফের আস্তরণ পড়ত, জমির মাটি যখন আর দেখা যেত না— তখনও জমানো ফসলে ফসলের জীবন বেঁচে থাকত। মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শিখল।

এতদিন ঘন অরণ্যে পশুরা ছিল মুক্ত ও নির্ভীক। কেউ তাদের দেহে কোনোদিন আঘাত করেনি। মানুষ শিকার করতে শিখল। পশুরা মারা পড়তে লাগল, মানুষ তাদের মাংস খেতে শিখল। নতুন এক ধরনের যুদ্ধ শুরু হল। মানুষ ও পশুতে লড়াই। মানুষ যে সবসময়েই জয়ী হত তা নয়, মাঝেমধ্যে সে হত পশুর শিকার। বনের এখানে-ওখানে মানুষের মাংসহীন সাদা পরিষ্কার হাড় দেখা যেতে লাগল। পশুরা তো সবসময় হেরে যাওয়ার জন্য জন্মায়নি!

কোনো কোনো মানুষের পোশাক ছিল উত্তম, কোনো কোনো মানুষের খাদ্য ছিল উৎকৃষ্ট। ফলে, স্বাভাবিক নিয়মে দেখা দিল ঝগড়া, দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে যুদ্ধ। এই প্রথম মানুষ মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করল, একের সঙ্গে অন্যের বৈষম্যের জন্য এই প্রথম ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরল।

অনন্য পুরুষ প্রমিথিউস মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। কেমন করে? একটু অতীতের কথা বলি।

যখন থেকে সময় শুরু হয়েছে তারও আগের কথা— তখন দেবতার জন্ম হয়নি, মানুষেরও জন্ম হয়নি। সারা পৃথিবী জুড়ে ছিল বিশৃঙ্খলা। জল,

বায়ু আর মেঘ আকারহীন হয়ে ঘুরে বেড়াত যথেচ্ছ, তাদের প্রবলতায় সব আচ্ছন্ন। এই মহাশূন্যতার মধ্যে কোনো জীবজন্তু ছিল না।

এমন সময় এক সর্বশক্তিমান বিদেহী আত্মা বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। আজ যে পৃথিবীকে আমরা দেখছি তার আদিরূপ গঠিত হতে লাগল। নিচু জমিগুলোতে জল জমে সমুদ্র, সরোবর, নদী আর পুকুরের সৃষ্টি হল। তারা এক জায়গায় স্থিত হয়ে রইল। পাহাড়-পর্বত সুউচ্চ চূড়া তুলে প্রশান্ত হয়ে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রইল, তাদের নড়াচড়া বন্ধ হল। আর সুন্দর প্রশস্ত ভূমিময় এলাকা হল পৃথিবী।

বাষ্পময় আবহাওয়া কোথায় মিলিয়ে গেল, শুদ্ধ বায়ু পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল, নিচু জমি থেকে পর্বতের চূড়া সর্বত্র তার অবাধ গতি। তাকে ও তার গতিকে কেউ চোখে দেখতে পায় না। এই সময় চন্দ্র ও অসংখ্য তারা আকাশে তাদের ঘর বাঁধল। এরপরে এল এক চঞ্চল গোলাকার বস্তু, সে সূর্য। স্বর্গের ওপর দিয়ে সে যাতায়াত করে আর তাই উজ্জ্বল আলো নিয়ে দিন হয়, ভয়-জাগানো অন্ধকার নিয়ে রাত হয়। সে যে কিছুতেই এক জায়গায় থাকবে না।

দিন আর রাত ঘুরে ঘুরে আসে। এবার গজিয়ে উঠল ঘাস, তারপর গাছ আর ফুল। ঘাস-গাছ-ফুলে পৃথিবী সুন্দর হল। নদীতে-সমুদ্রে মাছ সাঁতার কাটতে লাগল— কতরকমের বিচিত্র সব মাছ। বনভূমির ছায়ায় স্যাঁতসেঁতে জমিতে ছোটবড় জন্তু-জানোয়ার ঘুরে বেড়াতে লাগল, কেউ শান্ত, কেউ হিংস্র। তারা কখনও কখনও বন থেকে বেরিয়ে নদীর তীরে পাহাড়ের ঢালুতে রোদ পোয়াত।

এর পরে এল টাইটানরা। এক মহা-শক্তিশালী জাতি, বিরাট দেহ কিন্তু দেহে রয়েছে সুন্দর সামঞ্জস্য, অপরূপ দেখতে। এই সুদর্শন টাইটানদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কী রূপবান! তারা তখন সংখ্যায় ছিল বারোজন।

সেসময় দৈত্যাকৃতি প্রাণীও ছিল, টাইটানদের মতোই আকার, তাদের মতোই মহাশক্তিমান। কিন্তু তারা দেখতে কুৎসিত আর স্বভাবে ভয়ানক। তাদের কাউকে কাউকে বলা হত সাইক্লোপ। বিরাট কপাল, মধ্যিখানে একটিমাত্র বিশাল আকৃতির চোখ।

আর এক ধরনের দৈত্য ছিল যাদের একশোটা করে হাত। তাদের স্বভাব ছিল নৃশংস প্রকৃতির,তাদের শক্তি ছিল পাশবিক। তাই তাদের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবার অধিকার দেওয়া হয়নি। পৃথিবীর গভীর তলদেশে টারটারাস্ নামে এক জায়গায় তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছিল।

পৃথিবীর প্রাণীদের মধ্যে টাইটানরাই হল প্রথম সুন্দর বাসিন্দা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর বুদ্ধিমান ছিল ক্রোনাস। সেই ছিল দলনেতা। কিন্তু ক্রোনাস যাদের ওপর প্রভুত্ব করতেন তারা সবাই জন্তু-জানোয়ার ও ভাষাহীন প্রাণী। তাই তিনি অন্য এক টাইটান প্রমিথিউসকে ডাকলেন, তাকে নির্দেশ দিলেন মহৎ ও সুন্দর আনন্দময় প্রাণী সৃষ্টি করতে। প্রমিথিউস অনেক চিন্তা করলেন, অনেক পরিশ্রম করলেন— অবশেষে নরম মাটি দিয়ে নিজের প্রতিরূপ গড়ে তুললেন। তার মতোই তার সৃষ্টি সবকিছু পেল। পেল না দুটি বস্তু। একটি প্রমিথিউসের রূপ আর প্রমিথিউসের দৈহিক শক্তি।

এই প্রথম মানুষটিকে নিয়ে প্রমিথিউস গেলেন ক্রোনাসের কাছে। ক্রোনাস আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।

এমনি করে ক্রোনাসের আনন্দময় সম্মতি পেয়ে প্রমিথিউস এমনি অনেক মানুষ সৃষ্টি করলেন। ক্রোনাস সবাইকে জীবন দান করলেন, পৃথিবীতে বিচরণ করবার সম্মতি জানালেন— তারা অনুকূল পরিবেশে জীবন বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হল। প্রমিথিউসের হাতে-গড়া, হৃদয়ের আপনজন মানুষেরা প্রাণময় পৃথিবীতে সুন্দরভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সে যুগ তো ছিল স্বর্ণযুগ। সেকালে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ছিল না, ঘৃণা ছিল না, ছিল না ঈর্ষা। ফলে-ভরা, শস্যভরা পৃথিবীতে তারা আপন প্রশান্তিতে বাস করত, তারা ছিল আত্মতুষ্ট। তাই তাদের মধ্যে কদর্য কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না। ঋতুর কোনো পরিবর্তন ঘটত না— বয়ে যেত অনন্ত বসন্ত।

অলিম্পাস পর্বত থেকে প্রমিথিউস অবাক বিস্ময় আর আনন্দে পৃথিবীর মানুষকে দেখতেন। এরা তো সে নিজেই, এরা তো তারই প্রতিরূপ প্রতিবিম্ব। সৃষ্টির আনন্দে প্রমিথিউস বিভোর হয়ে যেতেন। মানুষদের দেখে দেখে তার আশা মিটত না— এরা যে তারই হাতে-গড়া, হৃদয় নিঙড়ানো অমূল্য জীবন।

তবু মহান প্রমিথিউস মাঝে মধ্যে কেমন বিমর্ষ হয়ে যেতেন। প্রাণ কেঁদে উঠত। তিনি দেখতেন, দিনের আলোয় মানুষগুলো কেমন উচ্ছল থাকে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে চারিদিক ঝলমল করে। কিন্তু সূর্য যখন ওদিকে ঢলে পড়ে, আকাশ যখন লাল রঙে হাবুডুবু খায়, তখন মানুষেরা কেমন ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে ওঠে। রাতের বিভীষিকা তাদের ব্যাকুল করে তোলে। উচ্ছলতা বিলীন হয়। দিনের বেলায় যাদের মাথা থাকে উন্নত, সন্ধ্যার শুরুতেই তা কেমন নুয়ে পড়ে। তার সৃষ্টির এ কী অবমাননা!

প্রমিথিউস তার প্রভু দেবরাজ জিউসের কাছে গেলেন। তিনি নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো শান্তস্বরে দেবরাজের কাছে আগুন চাইলেন। মানুষকে দিতে হবে এই আগুন— সে অন্ধকার-শীত-বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। তাদের যে আগুন নেই।

জিউস জানতেন, একটি প্রজাতি কীভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে, সেই মানুষ কীভাবে বলিষ্ঠ ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে, সে আরও অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাইছে। অধিকার দেওয়ার পরিণাম তিনি জানেন। আজ টাইটানরা পরাজিত, আজ একজন টাইটান প্রমিথিউস তার স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা। সে অধিকার তিনিই তাকে দিয়েছেন, কেননা, প্রমিথিউস টাইটানদের অন্যায়কে সহ্য না করে তাদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। জিউস জানেন প্রমিথিউসের সহায়তা ছাড়া এ বিজয় সম্ভব হত না। অধিকার আর তিনি হাতছাড়া করবেন না। কে জানে, প্রমিথিউস-এর উদ্দেশ্য কী?

জিউস আগুন দিতে অস্বীকার করলেন। প্রমিথিউসকে বললেন, মানবজাতিকে অগ্রাহ্য করো। তাদের ভাগ্যের ওপরে ছেড়ে দাও, হোক না তাদের দুর্বহ জীবন। তোমার পথ অন্য, তুমি সুখী, তুমি প্রভু। মানবজাতি ওই অবস্থায় দিন কাটাক, রাত্রি অতিবাহিত করুক।

প্রমিথিউস সত্য ও ন্যায়ের পথ ধরে চলেন। তিনি বলিষ্ঠ মানসিকতার প্রতিভূ। যা চিন্তা করেছেন, তা থেকে সহজে নিবৃত্ত হবেন না। বিশেষ করে ওরা যে তারই সৃষ্টি। সৃষ্টিকে অসম্পূর্ণ রাখেন কেমন করে? সৎ উদ্দেশ্য থেকে কোনোভাবেই বিচ্যুত হওয়া তার স্বভাব নয়।

প্রমিথিউস নলখাগড়ার একটি গুচ্ছ সংগহ করলেন, সূর্যের আলোয় তাকে শুকনো করে তুললেন। গাছের আঠায় তাকে ডুবিয়ে নিলেন, আবার শুকিয়ে নিলেন। সব তৈরি, মনও তৈরি। সংকল্প অটল।

যে স্থান থেকে সূর্যদেব অ্যাপোলো আকাশপথে তার উজ্জ্বল পরিক্রমা শুরু করেন, এক রাতে প্রমিথিউস সেখানে লুকিয়ে রইলেন। অ্যাপোলো যাত্রা শুরু করলেন, সেই মুহূর্তে প্রমিথিউস নলখাগড়ার গুচ্ছটি সূর্যদেবের রথের অগ্নিময় চাকায় চেপে ধরলেন। রঙিন শিখায় জ্বলে উঠল হাতের গুচ্ছ। সন্তর্পণে লুকিয়ে ফেললেন সেই গুচ্ছ। কেউ দেখতে পেল না।

সময় নেই। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললেন প্রমিথিউস, গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হল, চুরি-করা আগুন হাতের মুঠোয় জ্বলছে, জ্বলছে অনির্বাণ শিখা।

তিনি নেমে এলেন পৃথিবীতে। আগুন দিলেন মানুষকে। আগুনের যত ধরনের ব্যবহার আছে সব শেখালেন তিনি। আগুন সম্পর্কে সব জানল মানুষ। মানুষ এই প্রথম আগুন পেল, পেল প্রমিথিউসের কাছে। মানুষ এই প্রথম নিজেকে পশুর থেকে আলাদা ভাবতে পারল, সে নিজেকে উন্নততর প্রাণী বলে অনুভব করল। সে যে শ্রেষ্ঠ সেই অনুভূতি জাগল।

প্রমিথিউস মানুষকে বললেন, এই গোপন বস্তুটি তারা যেন গোপন রাখে, কে তাদের এটা দিয়েছে তা যেন কেউ না জানে। তিনি জানতেন, এ খবর জিউসের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লে তাকে বড় কঠিন মূল্য দিতে হবে। বিপদের সব কথা জেনেও তিনি কিন্তু পিছু হটে যাননি— এখানেই তার আনন্দ।

একদিন রাতে জিউস বসে রয়েছেন। এদিকে-ওদিকে দেখছেন হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন। তিনি পৃথিবীর বুকে মিট্‌মিট্‌ করে কিছু আলো জ্বলতে দেখলেন। এক ঝাঁক জোনাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে— আগে তো এমন দেখেননি।

তিনি একজন দেবদূতকে পৃথিবীতে পাঠালেন। সে এসে সংবাদ দিল, মানুষ সবচেয়ে অমূল্য বস্তুটির অধিকারী হয়েছে, সে তার ব্যবহারও সব শিখে ফেলেছে।

কয়েকদিন আগের একটি অনুরোধের কথা জিউসের মনে পড়ল। তিনি জানতেন কে সেই 'হীন অপরাধী'। কিন্তু কেমন করে তাকে অভিযুক্ত করবেন? তার হাতে সত্যিকার প্রমাণ কোথায়?

দিন কেটে যায়। প্রমিথিউস নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তার গোপন কাজটি কেউ জানতে পারেনি। তিনি বেশিমাত্রায় সাহসী হয়ে উঠলেন। আর একবার তার প্রভুকে 'প্রবঞ্চনা' করতে চাইলেন।

এবার জিউস ধরে ফেললেন। তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। প্রমিথিউসের ধৃষ্টতায় তিনি পূর্বের সব কৃতজ্ঞতার কথা ভুলে গেলেন। অভিশাপ দিলেন, এই টাইটান প্রমিথিউস একদিন তার পক্ষ হয়ে লড়াই করেছিল, কিন্তু আজ সে সমস্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হল। তাকে চরম শাস্তি পেতেই হবে।

জিউস দুজন দৈত্যকে ডাকলেন, তাদের নাম অত্যাচার ও বীভৎসতা। তারা দুজনে মিলিতভাবে প্রমিথিউসের চেয়ে শক্তিমান। জিউস আদেশ দিলেন, ককেশাস পর্বতের এক জনহীন নৈঃশব্দ্যে-ভরা দুর্গম চূড়ায় একে নিয়ে যাও! হেফিস্টাস এমন একটি শৃঙ্খল তৈরি করুক যা কখনও ছিন্ন করা যাবে না। সেই নিগড়ে ওই পর্বত-চূড়ায় প্রমিথিউসকে শৃঙ্খলিত করে রাখো।

একটু থেমে জিউস আবার বললেন, শোনো, এতেই অত্যাচার শেষ হবে না। অপরাধ আরও ভয়াবহ, শাস্তিও চরম হতে হবে। একটি শকুন প্রতিদিন টাইটানের যকৃৎ কুরে কুরে খাবে। কিন্তু প্রতি রাত্রে আবার নতুন করে টাইটানের দেহে যকৃৎ বেড়ে উঠবে। এমনি করে তাকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।

জিউস আশা করেছিলেন, প্রমিথিউস তার এই অপরাধের জন্য অনুশোচনায় ভেঙে পড়বেন। প্রমিথিউস ভবিষ্যতের অনেক ঘটনা আগে থেকে জানতে পারতেন। এরকম আগাম খবর তিনি যদি আবার জিউসকে সরবরাহ করেন, তবে জিউস তাকে ক্ষমা করে দেবেন, তাকে শৃঙ্খলমুক্ত করবেন। এটাও জানানো হল প্রমিথিউসকে।

অনুশোচনার লেশমাত্র নেই প্রমিথিউসের। অবিশ্বাস্য ধৈর্য, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও মানসিক বল তার, তিনি অন্যায় করেননি। কোনো অত্যাচার ও ভয়ের কাছে তিনি মাথা নোয়াতে শেখেননি— উৎকোচে তিনি বশীভূত হতে শেখেননি। তিনি মনে করলেন, মানুষের জন্য তিনি যা করেছেন তা ন্যায়সঙ্গত উপযুক্ত কাজ। তিনি কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষে তার নিজ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করেননি? তিনি এও জানেন, এ আশাও করেন— অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে এমন একজন বীর আসবেন যিনি শৃঙ্খলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাকে মুক্ত করবেন। কেননা, তিনি অপরাধী নন, ন্যায়-প্রতিষ্ঠাতার মুক্তি ঘটবেই।

বহু বহু শতাব্দী ধরে অ্যাপোলো তার প্রজ্বলিত রথে আকাশ-পথে শত সহস্রবার প্রদক্ষিণ করে চললেন। নীচে ককেশাস পর্বতে তিলতিল করে যন্ত্রণায় দগ্ধে আর্তনাদ করছেন প্রমিথিউস। সে আর্তনাদ কেউ শুনতে পায় না, তার ভেতরেই তা গুমরে মরে।

প্রমিথিউস পৃথিবীতে জন্মেছিলেন। পৃথিবীর মানুষকে আগুন দিয়েছিলেন। আর একজন মাটির পৃথিবীতেই জন্মালেন, তিনি হারকিউলিস।

সোনালি আপেলের খবর জানতে হারকিউলিস অ্যাটলাসের কাছে যাচ্ছিলেন। সেই পথে এলেন ককেশাস পর্বতে। অসীম বীরত্বে সেই শকুনকে হত্যা করলেন, তার পূর্বসূরি প্রমিথিউসকে শৃঙ্খলমুক্ত করলেন। যে মহান বীর আত্মত্যাগী প্রমিথিউস মানুষকে আগুন দিয়েছিলেন, পৃথিবীর একজন সেই বীরকে শৃঙ্খলমুক্ত করে ঋণের কিছুটা অংশ বোধহয় পরিশোধ করলেন।

প্রমিথিউসের কাহিনির এক জায়াগায় রয়েছে— অনুশোচনার লেশমাত্র নেই প্রমিথিউসের। চরিত্রটি এখানেই স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। যে কাজে অনুশোচনা থাকে, সে কাজ মহৎ হতে পারে না। প্রমিথিউস জানেন, তিনি এক মহান কর্তব্য পালন করেছেন, তাই তিনি অনুশোচনা করবেন কেন? মহান কর্তব্য-সম্পাদনে অভিশাপ নেমে আসতে পারে কিন্তু অনুতপ্ত হয়ে দুর্বলতা ও ভীরুতার পরিচয় দিতে প্রমিথিউস রাজি নন। অনন্য এক মহৎ দৃঢ় চরিত্র।

ঈশপের নীতিকথা

বর্তমান বিশ্বে ঈশপের নীতিকথা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। পৃথিবীর লিখিত এমন কোনো ভাষা নেই যাতে এই নীতিকথা প্রকাশিত হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে হল্যান্ড-স্পেন-ইতালি-ফ্রান্স-জার্মানি-গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলি সারা পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের মাধ্যমে ইউরোপীয় ভাষায় ঈশপ প্রথম উপনিবেশগুলিতে প্রবেশ করে। তারপরে উপনিবেশগুলির নিজস্ব মাতৃভাষায় সেগুলি অনূদিত হতে থাকে। ঈশপের নীতিকথাগুলি অত্যন্ত সরল, সম্পাদনায় কোনো পরিশীলিত

কৌশল যেহেতু অবলম্বন করা হয়নি, তাই খুব সহজেই সেগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নীতিশিক্ষার বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে এইসব গল্পে প্রকাশিত হয়েছে, তাই সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ঈশপের নীতিকথাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর ইউরোপের সম্পদগুলির প্রচার একটু বেশিমাত্রায়ই ঘটেছে উপনিবেশবাদীদের শাসনবিস্তারের সুবাদে। তাই ঈশপের খ্যাতি ও প্রচার আজ দুনিয়াজোড়া।

বহু পণ্ডিত মনে করেন, ঈশপের কাহিনিগুলোর সঙ্গে লোকঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈশপ তার সৃষ্টিশীল কল্পনায় এগুলির জন্ম দিয়েছেন। ঈশপের লিখিত নীতিকথা পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে জনসমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই যুক্তিকে মেনে নেওয়া অসম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লোককথা সংগ্রহের একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিছু উদার খ্রিস্টান ধর্মযাজক, ইউরোপীয় প্রশাসক ও নৃবিজ্ঞানী এ বিষয়ে পথিকৃৎ। তারা বিভিন্ন আদিবাসীদের ভাষা শিখে তাদের লোককথা সংগ্রহ করেন। এইসব জনগোষ্ঠীর ভাষার কোনো লিপি ছিল না, এরা সকলেই নিরক্ষর গ্রামীণ কৃষিজীবী অথবা পশুপালক শিকারজীবী। এদের সঙ্গে আগে কোনোদিন বাইরের দুনিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেনি। অথচ তাদের লোককথায় ঈশপের বলা অনেক নীতিকথার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বের লোকসমাজের অসম বিকাশ ঘটেছে, অর্থনৈতিক-সামাজিক স্তরগুলি একইভাবে বিকশিত হয়নি। কিন্তু একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে লোকসমাজকে এগোতে হয় বলে, একই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে এগোতে হয বলে বিশেষ বিশেষ স্তরে তারা একই চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করে। তাই পাত্র-পাত্রী আলাদা হলেও তারা যে লোককথা সৃষ্টি করেন তাতে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মাইগ্রেশন না ঘটলেও একই লোককথা একইভাবে কিংবা কিছুটা অন্য রূপে বিভিন্ন লোকসমাজে দেখা যায়। ঈশপের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। একথা কোনোভাবেই স্বীকার করা যায় না যে এইসব নীতিকথা ঈশপের মৌলিক সৃষ্টি।

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসী গোষ্ঠীর লোককথার নিদর্শন নিলেই একথা প্রমাণিত হবে। এগুলি যখন সংগৃহীত হয় তখনও বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে এদের তেমন কোনো সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি।

ঈশপের নীতিকথার বেশ কিছু নিদর্শন আমরা পাচ্ছি আফ্রিকা মাহদেশের সিয়েরা লিওনের মেনডে, ক্যামেরুনের বাফুন, কঙ্গোর বাপেন্দে, জাম্বিয়ার লোজি, কেনিয়ার মাসাই, গাবোনের ফ্যাঙ, নাইজিরিয়ার ইকোই, মোজাম্বিকের মাকোন্দে, সুদানের শিলুক প্রভৃতি আদিবাসী; প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ের মেলানেশিয়ার নামাউ, মোন্-আলু, কেরাকি, মালেকুলা আদিবাসী; পলিনেশিয়ার কারোঙগোয়া, হাপাই আদিবাসী; মাইক্রোনেশিয়ার উলিথি, ছামারো আদিবাসী; আমেরিকার মধ্য ও উত্তরপূর্ব এলাকার রেড ইন্ডিয়ান আদিবাসী; ভারতের ওরাওঁ, লখের, গাদাবা, বোনদো আদিবাসী প্রভৃতির মধ্যে। এদের মধ্যে থেকে যখন লোককথাগুলি সংগ্রহ করা হয়, তখন এদের সামাজিক অবস্থান এমন স্তরে ছিল যে অবস্থায় ঈশপ কোনোভাবেই তাদের নাগালের মধ্যে আসতে পারেন না। তাই ঈশপ সেইকালের গ্রিস তুরস্ক এলাকার কৃষকদের লোককথাই বলেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটা হতে পারে, লোককথা সংগ্রহ করতে করতে তিনি দু-একটি লোককথা নিজেও হয়তো সৃষ্টি করেছেন। তবে মূল প্রেরণার উৎস লোকসমাজ।

বিশ শতকে রিচার্ড এ. ওয়াটারম্যান ঈশপের নীতিকথার সঙ্গে অন্যান্য দেশের নীতিকথার সাদৃশ্য বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তিনি দেখিয়েছেন, ঈশপের নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে ২৩১ থেকে ২৫৬ টি কাহিনি। তার মধ্যে এক চতুর্থাংশ সরাসরি যুক্ত ভারতবর্ষীয় নীতিকথার সঙ্গে। অর্থাৎ ৫৮ থেকে ৬৪ টি নীতিকথা রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যে। ১৩টি রয়েছে জাতকে, যেমন— নেকড়ে ও ভেড়া, সিংহচর্মাবৃত গাধা, শেয়াল ও দাঁড়কাক, যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে। মহাভারতে রয়েছে কয়েকটি, যেমন— সিংহ ও ইঁদুর, কৃষক ও সাপ, দুটি পাত্র। এ ছাড়াও পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, পিলপের লোককথা সংগ্রহের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। আমি এসব সাদৃশ্য মিলিয়ে দেখেছি, ঈশপের নীতিকথার পঁচিশ শতাংশ নয়, পঞ্চাশ শতাংশ রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যে, বিশ শতাংশ রয়েছে আফ্রিকার ঐতিহ্যে। তবে এসব ঈশপের কল্পনায় এসেছে কোনো প্রভাবজনিত কারণে নয়। আগেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছি।

গ্রিসের প্রাচীনতম লিখিত ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যাদের নিয়ে গোটা পৃথিবীর গর্ব, গ্রিসের সেই মহান সন্তানদের লিখিত পুথি

অধিকাংশই সভ্য জগতের হাতে এসেছে। কিন্তু ঈশপের লিখিত কোনো পুথি আজও পাওয়া যায়নি। তাই কিছু পণ্ডিত মনে করতেন, ঈশপ নামে কেউ কোনোকালে ছিলেন না, নানা নীতিকথা তার নামে চলে এসেছে। এই ধারণাও বোধহয় সঠিক নয়। এটা ঠিকই, পরবর্তীকালে গ্রিসের বেশিরভাগ নীতিকথাই ঈশপের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে ঈশপের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ঈশপের সংগৃহীত অনেক নীতিকথা যে ছিল তারও প্রমাণ রয়েছে।

মনে রাখতে হবে— Metaphorical expression of any kind was something novel in Greece of his time, having been almost entirely absent in Homer and only recently exploited in fables, but poeticaly, by Archilochus (d. sometime after 648 B.C). This historical fact may account in large measure for Aesop'sfame as a fabulist. He was not a writer, either of poetry or of prose. *B. E. Perry : Babrius and Phaedrus. 1965*

ঈশপ তার নীতিকথাগুলির কোনো সংকলন গ্রন্থ লিখেছিলেন কি না তার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে গ্রিসের একজন স্মরণীয় ব্যক্তি ডিমেট্রিয়াস ফ্যালেরিউস ঈশপের নীতিকথার প্রথম সংকলন প্রকাশ করেন। সংকলন-গ্রন্থটির পরিচয় অন্যান্য লেখকদের রচনায় পাওয়া গেলেও সেই গ্রন্থটি আর পাওয়া যায়নি। কিন্তু এটুকু অনুমান করা যায়, ঈশপ এই কালের আগে জন্মেছিলেন এবং তার নীতিকথা যথেষ্ট সমাদর না পেলে ডিমেট্রিয়াস সেগুলি সংকলিত করতেন না। এর একশো বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে বাবরিয়াস ঈশপের নীতিকথার আর একটি সংকলন প্রকাশ করেন। অনেকের ধারণা, ডিমেট্রিয়াসের সংকলনের ভিত্তিতেই বাবরিয়াস এটি সংকলন করেছিলেন। শুধু এই দুজনই নন, ঈশপের নামের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিসের আরও কিছু পণ্ডিত মানুষের নাম যুক্ত রয়েছে। প্লেটো (৪২৮-৩৪৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) তার গুরু সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সম্পর্কে বলেছেন যে, সক্রেটিস ঈশপের কিছু নীতিকথা কবিতায় রূপান্তরিত করেন। গ্রিসের হাস্যরসাত্মক কবিতার জনক অ্যারিস্টোফেনিস (৪৫০-৩৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বলেছেন, বাগ্মীরা তাদের

বক্তব্য সহজে বোঝাবার জন্য ঈশপের নীতিকথাকে ব্যবহার করত। ভোজসভায়, হালকা হাসির আসরে ঈশপের নীতিকথা বলবার রেওয়াজ ছিল। রোমান কবি ফিদ্রাস ও আভিয়ানাস প্রথম শতাব্দীতে ঈশপের ৪২টি নীতিকথা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। অনেকের ধারণা, এগুলি ডিমেট্রিয়াসের গদ্য-সংকলনকে ভিত্তি করেই অনূদিত হয়েছিল। নবম শতকে ইগনাটিয়াস ডায়াকোনাস ঈশপের ৫৩টি নীতিকথা কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন। আনুমানিক ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্সিমাস প্লানুডেস নামে একজন পুরোহিত ১৪৪টি ঈশপীয় নীতিকথার সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থের সঙ্গে ঈশপের একটি জীবনীও ছিল। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় মিলান শহরে। কয়েকটি বাড়তি নীতিকথা অন্তর্ভুক্ত করে গ্রন্থটি পারিতে ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে আবার প্রকাশিত হয়। বাবরিয়াসের সংকলনের অনুসরণ করে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ১৩৬টি নীতিকথার একটি হাইডেলবার্গ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর পরে ১৭১৮-১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অক্সফোর্ড ও লাইপজিগে ঈশপের নীতিকথার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে বড় সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে, এর সংখ্যা ২৩১টি। নিউইয়র্ক থেকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত জোশেফ জেকোবের ২৩১ ঈশপের নীতিকথা সংকলনই সবচেয়ে প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়েছে।

নীতিকথার সংখ্যায় তারতম্য ঘটেছে, কিন্তু খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে ঈশপের নীতিকথার ধারাবাহিক প্রকাশ থেকে অন্তত এটা অনুমান করা যায়, ঈশপ কিংবদন্তির নায়ক নন, যদিও তাকে ঘিরে কিছু কিংবদন্তি রয়েছে।

ঈশপের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ একটি ইতিহাস-গ্রন্থ, লেখক হেরোডোটাস (৪৮৪-৪২৮খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। খুব সংক্ষিপ্তভাবে হলেও হেরোডোটাস ঈশপের কিছু পরিচয় দিয়েছেন।

সক্রেটিস প্লেটো অ্যারিস্টোফেনিস ও হেরোডোটাস খ্রিস্টপূর্ব যুগের মানুষ। গ্রিসের ইতিহাসবোধ খুব প্রখর। অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিদের পরিচয় সেকালেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এদের লেখায় যখন ঈশপের নাম রয়েছে তখন কোনোভাবেই ঈশপকে কিংবদন্তির মানুষ বলা যায় না। আর তার কাল সম্পর্কেও ধারণা জন্মায়, কেননা তিনি নিশ্চয়ই সক্রেটিসের পূর্ববর্তীকালের মানুষ।

ঈশপকে নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার প্রধান কারণ হল ঈশপের নীতিকথা লিখিত আকারে পাওয়া যায়নি। হতে পারে ঈশপ এসব মুখে মুখেই কথকের ভূমিকায় বলে যেতেন। তাহলে পুথি থাকবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর এক হতে পারে, গ্রিসের অভিজাত সম্প্রদায় ক্রীতদাসের পুথি ধ্বংস করে ফেলেছেন।

কিংবদন্তির আলোচনা না করে ঈশপের ইতিহাসসম্মত জীবনী অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। ঈশপ বেঁচে ছিলেন ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তিনি ছিলেন আয়াডমন-এর ক্রীতদাস, আয়াডমন ছিলেন সামোস-এর অধিবাসী। যে কোনো কারণেই হোক ঈশপ এই প্রভুর কাছ থেকে মুক্তি পান। মিডিয়ার রাজা ক্রিসাস কোনো বিশেষ কাজে ঈশপকে ডেলফিতে পাঠিয়েছিলেন। এই ডেলফির অধিবাসীরা ঈশপকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং পাহাড়ের চুড়ো থেকে তাকে ফেলে দেন। ঈশপের মৃত্যু হয়। অনেকে মনে করেন, ঈশপের ব্যঙ্গাত্মক নীতিকথা সেখানকার অধিবাসীদের উত্তেজিত করে। আর পুরনো একজন ক্রীতদাসের জীবনের কীইবা মূল্য? তাকে হত্যা করলেও তো কোনো প্রতিরোধ আসবে না কোনো দিক থেকে।

এর অতিরিক্ত অনেক কিংবদন্তি রয়েছে ঈশপকে ঘিরে। আমাদের দেশের সব পুরাণ যেমন বেদব্যাসের নামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হত, গ্রিসের সব নীতিকথাই ঈশপের নামে প্রচার করা হত। এতে একদিকে ঈশপের জনপ্রিয়তা যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি ঈশপের সংকলিত নীতিকথার উৎস-সন্ধানেও ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো অত ইতিহাস-নির্ভর যুক্তি মেনে চলতে পারেন না! তাই বেদব্যাস আর ঈশপের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিরও শেষ নেই।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, ঈশপের নীতিকথা বলে যা প্রচারিত হয়েছে তার অধিকাংশই শুধুমাত্র ঈশপের নামের সঙ্গে যুক্ত। ঈশপের সঙ্গে সেসব লোককথার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই আধুনিক সংকলন-গ্রন্থের ওপর নির্ভর না করে প্রাচীনতম যে সংকলনগুলি রয়েছে, সেগুলিকে ভিত্তি করেই ঈশপের আলোচনা যুক্তিযুক্ত। সেখানেও হয়তো বাড়তি লোককথা প্রবিষ্ট হয়েছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

কিছু কিছু পণ্ডিত বলেছেন, ঈশপের নীতিকথাগুলি মৌলিক। কিছু নীতিকথা মৌলিক হতে পারে, কিন্তু সর্বাংশে এ মত কেন মেনে নেওয়া যায়

না তা আগেই আলোচনা করেছি। ঈশপের জন্মের বহু আগে থেকেই গ্রিসে বা তার সন্নিহিত এলাকায় এসব লোককথা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন কালের লোককথা সংগ্রাহকেরা তাদের পুথি সংকলন করবার সময় নিজস্ব ধ্যান-ধারণার কিছু পরিচয় রেখে গিয়েছেন। এক বিশেষ উদ্দেশ্যেই তারা লোককথা সংকলন করেছিলেন। ঈশপেরও উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিটি গল্পের শেষেই নীতিকথা রয়েছে। শুধুমাত্র আনন্দদানের জন্যই ঈশপ এগুলির সংকলন করেননি, মানুষের সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিমানুষকে নীতিকথার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দেওয়াই ছিল তার লক্ষ্য। এর জন্য তিনি প্রাসঙ্গিক লোককথা সংগ্রহ করলেন ঠিকই, কিন্তু সংকলন করবার সময় কোনো কৌশল বা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। যেমনভাবে শুনেছিলেন সেভাবেই পরিবেশন করেছেন। এই হিসেবে ঈশপের নীতিকথা অনেক বেশি লৌকিক, লোকঐতিহ্যের সম্পদটি তিনি অবিকৃতভাবে শুনিয়েছেন।

ঈশপের নীতিকথা সম্পর্কে সাধারণভাবে এই উক্তি প্রযোজ্য। কিন্তু ঈশপের পুরনো সংকলনে দুটি লোককথা রয়েছে যা লৌকিক বলে আমার মনে হয়নি। ঈশপ ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ঠিকই, ক্রিসাস তাকে অসাধারণ শ্রদ্ধাও করতেন, প্লুটার্ক ঈশপকে আটটি রত্নসদৃশ শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের একটি রত্নও বলেছেন— কিন্তু সেকালের গ্রিসের অভিজাত সম্প্রদায়ের সামাজিক মানসিকতা এমনই ছিল যে এককালের ক্রীতদাস 'কুরূপ' ঈশপকে তারা কোনোভাবেই সহজে গ্রহণ করে নেননি। পদে পদে তাকে অসহ্য অপমান ও লাঞ্ছনা নিশ্চয়ই সহ্য করতে হয়েছিল। এইসব সামাজিক অবমাননার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই দুটি লোককথায়। এ লোককথা লোকসমাজের সৃষ্টি নয়, ঈশপের মৌলিক সৃষ্টি।

ডেলফির অভিজাত নাগরিকেরা ঈশপকে নিয়ে চলল পাহাড়ের চুড়োয়। দুদিকে দুটি চুড়ো, মাঝখানে গভীর গহ্বর। দুটি কাঠ দুটি চুড়োর মাথায় রাখা হল। ঈশপ হেঁটে গেলেন সেই কাঠের ওপরে। মনে হয় যেন, মৃত্যুর আগে ঈশপ জীবনের শেষ লোককথা শুনিয়ে যাচ্ছেন। কী করুণ পরিণতি গ্রিসের ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্নের! দুপাশ থেকে কাঠ দুটি ছেড়ে দিল ঘাতক, নিঃশব্দে গহ্বরে বিলীন হয়ে গেলেন ক্রীতদাস ঈশপ, যিনি

চিরকাল মানুষের সংগ্রামী মনের কথা প্রকাশ করেছেন, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস জুগিয়েছেন, শৃঙ্খলিত মানুষের অবমাননার গান শুনিয়েছেন, আর শুনিয়েছেন, 'আমি সামান্য কুকুর, বনে বনে কষ্ট করে খাদ্য সংগ্রহ করি, কিন্তু প্রভুর গৃহে ভালো খাদ্যের বিনিময়েও গলায় শেকল পরতে পারব না।'

'রাজহাঁস ও বক' পশুকথাটির মধ্যে ঈশপ যেন নিজের ধিক্কৃত জীবনের সমস্ত গ্লান্তি ও অবমাননা প্রকাশ করেছেন। রূপকের আড়ালে ব্যক্তিজীবনের আশ্চর্য বেদনা প্রকাশ পেল।

পাহাড়ি বনের পাশে এক ঝিলের ধারে গান গাইছিল এক রাজহাঁস। একটু পরেই সে মারা যাবে। তবু সে গান সুন্দর, মধু ঝরে পড়ছিল।

পাশেই ছিল এক বক। সে বলল, হায় কপাল! এ তো কোনোদিন দেখিনি? মরার সময়ে কেউ গান গায় নাকি? আর এমন সময় গান গাওয়ারও তো কোনো মানে নেই। তা, তুমি এমন সময় গান গাইছ কেন?

রাজহাঁস বলল, আঃ, কী আরাম, গান গাইতে কত আনন্দ! আমি আজ যেখানে যাচ্ছি সেখানে আচমকা কোনো তির এসে আমার রক্ত ঝরাতে পারবে না। আজ আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে কোনো খাঁচা আর আমায় বন্দি করতে পারবে না। আজ আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে প্রচণ্ড খিদে আমাকে আর যন্ত্রণা দিতে পারবে না। এমন মুক্তির দিনে আমি গান গাইব না? বলো কি তুমি?

এই একটি পশুকথার মধ্যেই ঈশপের জীবন ও জীবনদর্শন যেন লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গল্পটি বোধহয় লোককথা নয়, ঈশপের নিজস্ব সৃষ্টি, নিজের জীবনকথা।

আর একটি কাহিনির মধ্যেও ঈশপের নিঃসঙ্গ জীবনের করুণ ছবি রয়েছে। এখানে রয়েছে নিঃসঙ্গ একাকিত্বের দীর্ঘশ্বাস।

এক যে ছিলেন মহান দার্শনিক। তার অগাধ পাণ্ডিত্যে সকলেই মুগ্ধ। একবার তিনি একটি ঘর তৈরি করলেন। সেখানেই থাকবেন তিনি। কিন্তু ঘরটা ছিল খুব ছোট। তাই দেখে কয়েকজন পরিচিত মানুষ দার্শনিককে বললেন, এ কী করেছেন? আপনার মতো এত বিরাট পণ্ডিত মানুষ শেষে থাকবেন এই ছোট্ট ঘরে? কী আশ্চর্য!

দার্শনিক একটু চুপ করে থেকে বললেন, হায়! এই ছোট্ট ঘরটাই যদি সত্যিকারের বন্ধু দিয়ে ভরে দিতে পারতাম!

প্রথম কাহিনিতে লৌকিক পাত্র-পাত্রী থাকলেও মেজাজে ও বক্তব্যে তা লোকঐতিহ্যের পশুকথা হয়ে ওঠেনি, আর দ্বিতীয় কাহিনিটি কোনোভাবেই লোককথা নয়। তবু এই দুটি কাহিনির মধ্যে ঈশপের ব্যক্তিমনটিকে যেন ছোঁয়া যায়। লোককথা-পশুকথায় কখনও দার্শনিক নামের কোনো মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। মৌখিক ঐতিহ্যে দার্শনিক অনেক অনন্য সুন্দর কথা থাকলেও, দার্শনিক চরিত্র নেই। তই মনে হয়, এই দুটি লোককথাই ঈশপের নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি।

ঈশপ তো ছিলেন গ্রিসের মিথকথার স্বর্ণযুগের মানুষ, চিরায়ত সাহিত্যের বর্ণময় যুগের অনন্য কথক। তিনি যখন নীতিকথাগুলি সৃষ্টি করছেন, তখন নীতিশিক্ষা তাঁর ধ্যান-ধারণায় প্রাথমিক শর্ত ছিল। কিন্তু গ্রিসের মিথগুলির সর্বব্যাপী প্রভাব এড়াবেন কেমন করে? সেসব সেকালের গ্রিসের মানুষের চিন্তায় এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে ছিল যাকে কেউ সচেতন-অচেতনভাবে উপেক্ষা করতে পারত না। প্রাচীন গ্রিসের ঈশপ তাঁর নীতিকথায় এমন দুটি কাহিনি যুক্ত করেছেন যার শেষে নীতিকথা রয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে ক্লাসিক্যাল মিথের কয়েকটি চরিত্রের নামও যুক্ত হয়েছে। যদিও ক্লাসিক্যাল মিথে এসব চরিত্র যেভাবে রূপায়িত হয়েছে, ঈশপ সেই প্রথাগত পথ থেকে সরে এসেছেন। তবু তিনি যে চিরায়ত মিথের প্রভাব কাটাতে পারেননি, সেটাও সত্য।

প্রথম কাহিনিটি হল 'জুপিটার নেপচুন মিনার্ভা ও মোমাস'।— সেই প্রাচীন কালে জুপিটার নেপচুন ও মিনার্ভা তর্ক জুড়ে দিলেন, এই তিনজনের মধ্যে কে সবচেয়ে নিখুঁত জিনিস তৈরি করতে পারবে। বিচারক হবেন মোমাস, সে তখনও অলিম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়নি।

জুপিটার তৈরি করলেন একজন মানুষ। নেপচুন তৈরি করলেন একটা ষাঁড়। মিনার্ভা তৈরি করলেন একটা বাড়ি।

বিচারক মোমাস এলেন বিচার করতে। নেপচুনের তৈরি ষাঁড়কে দেখে তিনি বললেন, এই ষাঁড়ে ত্রুটি রয়েছে, কেননা ষাঁড়ের শিং তার চোখের নীচে নেই। ফলে যখন ষাঁড় ঢুঁ মারবে তখন সে কিছুই দেখতে পাবে না।

জুপিটারের তৈরি মানুষে খুঁত রয়েছে। মানুষের বুকে কোনো জানালা রাখা হয়নি। ফলে মানুষের দেহ থেকে মানসিক চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশিত হতে পারবে না।

আর মিনার্ভা যে বাড়ি তৈরি করেছেন তাও নিখুঁত নয়। কেননা, বাড়ির নীচে কোনো চাকা নেই, বাড়ির বাসিন্দারা তাহলে কীভাবে মন্দ প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে!— Jupiter, incensed with the carping critic who could not be pleased, forthwith drove the faultfinding judge out of the home of the gods.

ঈশপ নীতিকথায় বলেছেন— It is time to criticize the works of others when you have done some good thing youıself.

এই কাহিনিতে গ্রিসের মিথকথার চারটি চরিত্র থাকলেও ক্লাসিক্যাল মিথকথার সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। নীতিকথাও ঈশপের নিজস্ব। কিন্তু ঈশপ এই ক্লাসিক্যাল চারটি চরিত্রকে ঘিরে নিজস্ব দর্শনের কথা শুনিয়েছেন।

দ্বিতীয় কাহিনি হল— মার্কারি ও ভাস্কর। অনেক কাল আগে একদিন মার্কারির হঠাৎ মনে হল, মানুষের মধ্যে তার প্রতি শ্রদ্ধা এখনও কি আগের মতো অটুট আছে? তাই সেটা পরীক্ষা করতে একজন সাধারণ পথিকের বেশে তিনি নেমে এলেন অলিম্পাস্ পাহাড় থেকে। ঘুরতে ঘুরতে শহরের এক ভাস্করের দোকানে ঢুকলেন। সেখানে অনেক পাথরের মূর্তি সাজানো রয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে তিনি থামলেন জুপিটারের মূর্তির কাছে।

জিজ্ঞেস করলেন, এই মূর্তিটা কত দামে বিক্রি করবেন? ভাস্কর বললেন, এটা আমি সস্তায় ছেড়ে দিতে পারি । এই মূর্তির চাহিদা নেই। এক দ্রাখমা দিলেই হবে।

মার্কারি হাসলেন। তারপরে অপরূপা জুনোর মূর্তির দিকে চেয়ে দাম জিজ্ঞেস করলেন।

ভাস্কর বললেন, মেয়েদের মূর্তি ভালো বিকোয়, কিছু বেশি দাম পড়বে।

হঠাৎ মার্কারির দৃষ্টি পড়ল একটি মূর্তির দিকে। সেটা তারই মূর্তি, পাথরের তৈরি। ভাবলেন, দেবতাদের দূত ও সমস্ত ব্যবসায়িক ঐশ্বর্যের দেবতা মার্কারির মূর্তির দাম নিশ্চয়ই খুব বেশি হবে। মনে মনে খুশি হয়ে

তার মূর্তির দাম জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, এরকম অপরূপ সুন্দর মূর্তির দাম নিশ্চয়ই বেশ বেশি হবে।

ভাস্কর বললেন, আপনি লাভবান হতে পারেন, যদি জুপিটার ও জুনোর মূর্তি দুটো কেনেন, তবে মার্কারির এই মূর্তিটা আপনাকে বিনা পয়সায় দেব। ফাউ হিসেবে।

উপদেশ হল: হি হু সিক্‌স্‌ আ কম্‌প্লিমেন্ট সামটাইম্‌স্‌ ডিসকভার্‌ দ্য ট্রুথ। নীতিকথাটি যতই বাস্তবসম্মত হোক না কেন, লৌকিক ঐতিহ্যের কাহিনিতে এভাবে প্রকাশ করা হয় না।

এই দুটি ব্যতিক্রমী কাহিনি ঈশপের নীতিকথায় কীভাবে যুক্ত হয়ে গেল, তার সমাধান আজও মেলেনি।

ল্যাটিন ঐতিহ্য

প্রাচীন গ্রিক ও রোমক সভ্যতার মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রিসের প্রায় সমস্ত মিথকথা অবিকল আবার কখনও কিছুটা পরিবর্তিত আকারে প্রাচীন ইতালিতে পাওয়া যায়।

ভৌগোলিক ও মানসিক সান্নিধ্যের কারণেই এই অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। গ্রিসের খুব কাছেই ইতালি। স্থলভাগে কোনো সম্পর্ক নেই। গ্রিসের পশ্চিমে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর এবং ইতালির দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর বয়ে এসে গ্রিসের দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে গিয়েছে। সেকালে এই সাগরপথ ছিল খুবই সহজ যাতায়াতের পথ। দুই সভ্যতাকে তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করতে পেরেছিল।

ল্যাটিন ভাষা প্রথমে ছিল ল্যাটিয়াম। এই ভাষা বলত রোমান ও তাদের নিকট প্রতিবেশীরা। আর রোমান সাহিত্য হল রোমান গণতন্ত্র ও রোমান সাম্রাজ্যের অপরূপ সৃষ্টি। রোমান সাম্রাজ্যর পতনের পরে Latin remained the literary language of the western medieval world

until it was superseded by the romance languages it had generated and by other modern languages.

ল্যাটিন সাহিত্যের প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হল, ল্যাটিন পরিশীলিত সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে গ্রিক সাহিত্যের প্রভাবে।

প্রাচীন গ্রিসের অসংখ্য লোককথা আধুনিক বিশ্বের মানুষ জেনেছেন ল্যাটিন ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থ থেকে। গ্রন্থটির নাম 'মেটামরফোসিস্'। লেখক পাবলিয়াস ওভিদিয়াস নাসো। তিনি ওভিদ নামেই খ্যাত।

ওভিদ খ্রিস্টপূর্ব ৪৩-খ্রিস্টাব্দ ১৮ সময়কালের মানুষ। তাঁকে স্মরণ করা হয় অগাস্টাস যুগের শেষ কবি অথবা ল্যাটিন সাহিত্যের রৌপ্য যুগের প্রথম কবি। তাঁর সাহিত্যকর্মের ব্যাপক প্রভাব পড়ে পরবর্তীকালের ল্যাটিন সাহিত্যে।

তাঁর জন্ম সুলমোতে যার আধুনিক নাম সুলমোনা। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনা তিনি লিখে গিয়েছেন 'ত্রিসতিয়া' নামে বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক বৃহৎ কাব্যে। রোমে পড়াশোনা শেষ করে গ্রিস, এশিয়া মাইনর ও সিসিলিতে ভ্রমণ করেন। সরকারি কিছু চাকরিও করেছিলেন। কিন্তু সব ছেড়ে দিয়ে তিনি কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

উচ্চসমাজে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দুটি গ্রন্থ লেখায় মনোনিবেশ করেন— 'মেটামরফোসিস্' ও 'ফাস্তি'। প্রথম পরিকল্পনা শেষ হয়। দ্বিতীয়টি অর্ধসমাপ্ত থাকে। কেননা, এই সময়েই ৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট অগাস্টাস তাঁকে নির্বাসন দেন। কৃষ্ণসাগরের তীরে তাঁর এই নির্বাসন তাঁকে পর্যুদস্ত করে দেয়। কেন যে নির্বাসিত হলেন তার সঠিক কারণ জানা যায় না। নানা রকম কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে।

লোকসংস্কৃতির জগৎ কৃতজ্ঞ রয়েছে যে, নির্বাসনে যেতে বাধ্য হওয়ার আগেই 'মেটামরফোসিস্' গ্রন্থটি লেখা শেষ হয়েছিল। এই গ্রন্থের ১৫টি 'বুক' বা অংশ। এর মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার অনেক মিথকথা নতুনভাবে শুনিয়েছেন ওভিদ। সবচেয়ে বেশি শুনিয়েছেন গ্রিসের পুরাণকথা। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব জানা যাবে গ্রন্থের নামকরণে। মেটামরফোসিস্ অর্থ আকৃতির পরিবর্তন, রূপান্তর, রূপান্তরিত আকৃতি।— the Metamorphoses, a vast collection of myths and legends unified by the fact that

each story involves some supernatural transformation, as when Daphine is changed into a laurel, or Ceyx and Alcyone into sea birds. *Horst Frenz.*

এই রূপান্তর ঘটানোর জন্য কী পরিমাণ মুনশিয়ানা ও দক্ষতা প্রয়োজন তা সচেতন পাঠক উপলব্ধি করে এসেছেন শত শত বছর ধরে।

রোম সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবি হলেন পাবলিয়াস ভারজিনিয়াস মারো। তিনি ভার্জিল নামেই খ্যাত। ৭০-১৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ কালের মানুষ।

তিনি জন্মেছিলেন উত্তর ইতালির মানতুয়া এলাকায়। পড়াশোনা করেন ক্রিমোনা, মিলান ও রোমে। শিক্ষাশেষে ফিরে আসেন বাবার খামারে এবং কাব্য রচনায় আত্মবিয়োগ করেন।

ভার্জিল মহাকাব্যের লেখক। কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে সবুজ গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে। তাঁর জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল লোকসমাজের প্রতিদিনের জীবনচর্যা। পশুপালকেরা সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়ি উপত্যকায় স্বপ্নময় পরিবেশে গান গাইছে রাখালিয়া গান, পাহাড়ি নদীতে বয়ে চলেছে ছন্দময় ঢেউ, গাঁয়ের মেয়েরা পাহাড়ি নদীর মতোই চপল ভঙ্গিমায় নিত্যদিনের কাজে যাচ্ছে। গাঁয়ের পরিচিত ছেলে কত পড়াশোনা করে গাঁয়ে ফিরে এসেছে, যতই জ্ঞানী মানুষ হোক না কেন, ছেলেবেলায় দেখা সেই বালক তো আমাদের আপনজন পড়শি। কত গান শোনায় তারা, লোককথা মিথ শোনায় তারা। জ্ঞানী কবিও মন দিয়ে সেসব শোনেন। আর এই পরিবেশের প্রভাবেই ভার্জিলের কাব্য কবিতায় লৌকিক ঐতিহ্যের বর্ণময় রূপ আমরা দেখতে পাই।

ভার্জিলের কাব্যসম্ভারের মধ্যে লৌকিক কাহিনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মহৎ কবি বলেই তিনি লোকমানসের সম্পদকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'ঈনিড' গ্রন্থেও কিছু কিছু অংশে লোককথার পরম্পরাকে অনুসরণ করেছেন। পাতালের অভিযান বর্ণনায় হোমারের ওডিসির প্রভাব রয়েছে, যে বর্ণনা হোমার লৌকিক ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ভার্জিল ছিলেন অতি শিক্ষিত বিদগ্ধ কবি, তাই নিজের কাব্য-মহাকাব্যের প্রয়োজনে লোককথাকে পরিবর্তন করেন। কিন্তু লৌকিক মোটিফ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। লোককথার পরিবর্তিত লিখিত রূপ হলেও সেকালে প্রচলিত অনেক লোককথা যা কিছুকাল আগে পর্যন্তও জনপ্রিয় ছিল, তার সন্ধান মিলেছে।

প্রাচীন ল্যাটিন ঐতিহ্যে যাঁর লেখায় লৌকিক উপাদান ও লোককথা সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছে তিনি হলেন লুসিয়াস অ্যাপুলেইয়াস। তাঁর জন্ম ১২৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি জন্মেছিলেন আফ্রিকার আধুনিক আলজিরিয়ার নুমিডিয়া এলাকায়। লেখাপড়া করেন কার্থেজ ও এথেন্সে। তার পরে গ্রিস ও এশিয়া মাইনরে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, অসংখ্য সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে আসেন।

তিনি এই সময়ে ধর্মীয় 'জাদুময়-অতিপ্রাকৃত-ইন্দ্রিয়াতীত' জ্ঞান বিষয়ে নাকি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এই কিংবদন্তির পেছনে যদিও কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য নেই। রোমে কিছুকাল অলংকারশাস্ত্রের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। তার পর ফিরে যান আফ্রিকায়। সেখানে একজন ধনী বিধবা আমিলিয়া পুতেনতিল্লাকে বিয়ে করেন। ভবঘুরে লুসিয়াসের সঙ্গে এই বিয়ে মেনে নেননি বিধবার পরিবার। তারা অভিযোগ করেন, ধর্মীয় জাদুক্রিয়ার দ্বারা লুসিয়াস তাদের মেয়েকে বশীভূত করে বিয়ে করেছে। ফিরে আসেন স্বদেশে, আত্মনিয়োগ করেন দর্শন ও সাহিত্যে। অনন্য প্রাজ্ঞ মানুষ অলংকারশাস্ত্রবিদ, প্লেটোনিক দার্শনিক, কথাসাহিত্যিক লুসিয়াসের জীবন সত্যিই বর্ণময়।

তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ 'ফ্লোরিডা' অথবা 'গারল্যান্ড,' 'অন দ্য গড অব সক্রেটিস,' 'অ্যাপোলজি' প্রভৃতির কথা পরবর্তী প্রজন্ম তেমন করে মনে রাখেনি, সেগুলি রয়ে গিয়েছে গ্রন্থাগারে গবেষকদের জন্য।

কিন্তু একটি গ্রন্থ তাঁকে অমর করে রেখেছে। গ্রন্থটির নাম 'মেটামরফোসিস্' বা 'দ্য গোল্ডেন অ্যাস'। একটি উপন্যাস। Apuleius'rhetorical and philosophical writings are all but forgotten now and his reputation depends on his novel The Golden Ass. *William L. Halstead.*

'সোনালি গাধা' উপাখ্যানটি বেশ মজার। একজন যুবক অভিযানে বেরিয়েছে। তার নাম লুসিয়াস। ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছল উত্তর গ্রিসের থেসালি এলাকায়। এই এলাকায় ডাইনি-বিদ্যার প্রচলন ছিল। অনেকেই ডাইনি-বিদ্যা শিখত। ফেটিস্-এর কাছে যুবক জাদু মলম পেল। এই মলম ব্যবহার করলে পাখি হয়ে যায়। লুসিয়াস জাদু-মলম ব্যবহার করল, কিন্তু পাখি না হয়ে একটা গাধা হয়ে গেল। এই গাধা কথা বলতে পারে না. কিন্তু

মানুষের সব বোধই তার ছিল। একদিন একদল ডাকাত সেই গাধাকে চুরি করে পালিয়ে গেল। শুরু হল গাধার অভিযান। পথ চলেছে ডাকাতের দল, সঙ্গে রয়েছে সেই গাধা। সবাই ভাবত, ও-তো গাধা, বোধবুদ্ধি নেই, তাই লোকজন গাধার সামনে নানা রকম গল্পগুজব করত, কিছুই গোপন রাখত না। গাধা তো আদতে মানুষ, সে সব শোনে, সব বুঝতে পারে। অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয় গাধার, গল্পভাণ্ডার জমে ওঠে। কাহিনির শেষে অবশ্য দেবী আইসিস্-এর অনুকম্পায় লুসিয়াস গাধা থেকে আবার মানুষ হয়ে যায়। সেটা আবার অন্য কাহিনি।

ডাকাতের সঙ্গে গাধার পথ চলার সময় অনেক লোককথা শোনা গেল। গ্রিসে ও ইতালিতে প্রচলিত লোকসমাজের রূপকথা পশুকথা পুরাণকথা কিংবদন্তি সংগৃহীত হয়েছে এই গ্রন্থে।

একটি লোককথা রয়েছে এই গ্রন্থে যা গ্রিক কিংবা ল্যাটিন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। অথচ লোকসমাজের মধ্যে এই কাহিনি প্রচলিত ছিল।

কিউপিড ও সাইকি। লোকসংস্কৃতির সাধারণ মোটিফগুলি এই কাহিনিতে রয়েছে। গল্পকার অ্যাপুলেইয়াস অপরূপ দক্ষতা ও আন্তরিকতায় লৌকিক গল্পটি বিবৃত করেছেন। এই কাহিনির মধ্য একটি প্রতীক সুকৌশলে ব্যবহার করা হয়েছে: সাইকি হল আসলে মানবিক আত্মা। এক বৃদ্ধার কাছে গাধা এই গল্পটি শুনেছিল।

সাইকি ছিল অনন্যা রূপবতী। তার রূপের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই ভেনাসকে ঈর্ষান্বিত করে তুলল। তারই সন্ধানে কিউপিড মায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই রূপসী নারীকে বিয়ে করতে আগ্রহী। অনেক বাধা-বিপত্তি প্রতিকূলতার শেষে কিউপিড ও সাইকির শেষ পর্যন্ত মিলন ঘটল।

এই 'সোনালি গাধা' যেমন সেকালের লোকসমাজের লৌকিক কাহিনির ভাণ্ডার হিসেবে লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, তেমনি অন্যবিধ গুরুত্বেও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।— The Golden Ass illustrates the contemporary reaction against a period of skepticism and also the influx of oriental and Egyptian ideas into the old theology. The novel as a whole, however, is invaluable as an illustration of ancient manners and is full of entertainment.

মধ্যযুগের ইতালির লোকঐতিহ্যের আর একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন গিওভানি বোক্কাচিও। অনন্য প্রাজ্ঞ মানুষ কিন্তু লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজও একজন দীপ্ত ব্যক্তিত্ব। এমন মানবিক সাহিত্যিক সেকালের ইতালিতে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। তাঁকে বলা হয় ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্যতম মহান প্রতিভূ।

১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের পারিতে এই ইতালীয় সাহিত্যিকের জন্ম। ফরাসি মা ও ইতালির ফ্লোরেন্সের ব্যবসায়ী বাবার 'অবৈধ' সন্তান গিওভানি।

প্রথম শৈশব কাটে অসুখী মন নিয়ে। ফ্লোরেন্সে বাবার কাছে থেকে কোনো সহানুভূতি তিনি পাননি। তাঁর কবিত্ব-শক্তির প্রতি বাবার আগ্রহ ছিল না, ছেলেকে ব্যাবসা-বাণিজ্য শেখার জন্য নেপল্‌স-এ পাঠিয়ে দেন। তারপরে বেশ জটিল বিপর্যয়কর জীবন। শেষপর্যন্ত সমস্ত ব্যবসায়িক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গিওভানি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন আর আমরা পেয়ে যাই তাঁর অনন্য সৃষ্টি 'ডেকামেরন'।

বোক্কাচিওর যে সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থান তাতে 'ডেকামেরন' লিখবার কথা নয়। তিনি তো ক্লাসিক্যাল সাহিত্যিক। 'ডেকামেরন' তো 'ভালগার পিপ্‌ল'-এর জন্য সাহিত্য, তাই লেখককে অনেক গালমন্দও সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর অসাধারণ সব সাহিত্য কীর্তি রয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি খ্যাতি এসেছে কিন্তু এই গ্রন্থ থেকেই। অবশ্য পরবর্তীকালে। ইতিহাসের পরিহাস।

ইতালীয় কবি ও অনন্য পণ্ডিত ফ্রানসেস্‌কো পেট্রার্ক ছিলেন বোক্কাচিওর বন্ধু ও সাহিত্য-নির্দেশক। ডেকামেরন লিখবার সময়কালেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় পেট্রার্কের। এ গ্রন্থ লিখবার পরে বোক্কাচিও আর এই ধরনের কোনো গ্রন্থ লেখেননি। পেট্রার্ক-এর ক্লাসিক্যাল মানসিকতার প্রভাব বলেই সমালোচকরা মনে করেন। বোক্কাচিও প্রয়াত হন ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে আর পেট্রার্ক প্রয়াত হন ১৩৭৪ সালে। অর্থাৎ তাঁর ওপরে পেট্রার্ক এর প্রভাব ছিল আমৃত্যু।

'ডেকামেরন' গ্রন্থের আঙ্গিক পুরোপুরি লোকসংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করেছিলেন লেখক। গোটা পৃথিবী জুড়েই এই আঙ্গিকটি খুব জনপ্রিয়। ১৩৪৯ সাল থেকে ১৩৫১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তিন বছরে এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল।

১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে ভয়াবহ রোগ প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। সেই রোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সাতজন নারী ও তিনজন পুরুষ অর্থাৎ দশজন ফ্লোরেন্স থেকে রওনা দিলেন। তারা পনেরো দিন ধরে যাত্রা করেছিলেন। দশদিন-এর যাত্রাপথে তারা যেসব কাহিনি শুনিয়েছেন তারই সংকলন ডেকামেরন। যাত্রাপথের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য প্রত্যেকে দিনে একটি করে গল্প বলবে বলে অঙ্গীকার করল। ডেকা অর্থাৎ দশ দিনের কাহিনি। সব মিলিয়ে একশোটি গল্প। এই আঙ্গিকটি খুব পরিচিত লোকসমাজে।

ডেকামেরন-কে সমালোচকরা বলেছেন, এই গ্রন্থে বোক্কাচিও হলেন the master of the spoken word and of the swift, vivid, tense narrative free from the proliferation of ornament. These two aspects of the Decameron make it the fountain head of Italian literary prose for the succeding centuries.

আর এইসব অনন্য কৃতিত্বের প্রেক্ষাপটে সক্রিয় ছিল সেই কালের ইতালির অতি সাধারণ লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত লোককথা। আর বোক্কাচিও আশ্চর্য দক্ষতায় সেসব কাহিনি প্রায় অবিকৃত অবস্থাতেই এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ক. প্রথম দিনের প্রথম গল্প: সমাজে একজন ছিলেন যিনি অত্যন্ত দুর্বৃত্ত মানসিকতার মানুষ। হেন কুকীর্তি নেই যা তিনি জীবিত অবস্থায় করেননি। কিন্তু মৃত্যুর পরে পাকেচক্রে তিনি সন্ত হয়ে গেলেন, হলেন সেন্ট চিয়াপ্লেপ্লেতো।

খ. প্রথম দিনের চতুর্থ গল্প: এক মন্দিরের পুরোহিত এক সাংঘাতিক পাপ করেন। সেজন্য সমাজের কাছে তার ভয়ানক শাস্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু কৌশল ও অসাধুতা করে পুরোহিত প্রমাণ করলেন মন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষই আসলে পাপ কাজ করেছে। পুরোহিত শাস্তি এড়িয়ে গেলেন।

গ. দ্বিতীয় দিনের পঞ্চম গল্প: একজন লোক নেপল্‌স শহরে গেল ঘোড়া কিনতে। এক রাতে তিনবার অনভিপ্রেত সমস্যার মুখোমুখি হয়ে বিপর্যস্ত হল। কৌশলে সব বিপদ থেকে মুক্তি পেল। বাড়িতে ফিরে এল চুনি অর্থাৎ পদ্মরাগ মণি নিয়ে। সে সৌভাগ্যবান।

ঘ. দ্বিতীয় দিনের সপ্তম গল্প: একজন ধনী মানুষ তার মেয়েকে পাঠালেন ভিন দেশের এক রাজার সঙ্গে বিয়ে করবার জন্য। চার বছর ধরে মেয়ে নানা জায়গায় অভিযান করে। এই সময়কালে মেয়ে নয়জন পুরুষকে দেহ সম্ভোগ করতে দেয় স্বেচ্ছায়। চার বছর পরে ফিরে আসে বাবার কাছে। বাবা ভাবলেন, মেয়ে অক্ষতযোনি কুমারী। সেই রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

ঙ. পঞ্চম দিনের তৃতীয় গল্প: একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে গেল। পথে তাদের আক্রমণ করল কয়েকজন ডাকাত। প্রেমিকা জঙ্গলে পালিয়ে গেল। পরে গেল এক গাঁয়ে। প্রেমিক ডাকাতের হাতে ধরা পড়ল। কিন্তু বুদ্ধি করে পালিয়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে এক গাঁয়ে এল। সেই গাঁয়েই আশ্রয় নিয়েছিল প্রেমিকা। তাদের দেখা হল। তারা বিয়ে করল, তারপর ফিরে এল দেশে।

গিওভানির 'ডেকামেরন'-এর একশোটি গল্পের মধ্যে এরকম লৌকিক গল্পের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। উনিশ-বিশ শতকের ইতালীয় লোকসংস্কৃতি গবেষকরা ডেকামেরনের কাহিনিগুলোতে লোককথার যেসব রেশ রয়ে গিয়েছে তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন।

ল্যাটিন ঐতিহ্যে সবচেয়ে প্রাচীন লোককথা সংগ্রাহকের সম্পর্কে কিছু জানানো জরুরি। তথ্য রয়েছে খুবই কম, তবু এই আলোচনা ছাড়া ল্যাটিন পরম্পরা অসম্পূর্ণ থাকবে।

লোককথা সংগ্রহের লিখিত ঐতিহ্যে গ্রিসের ঈশপ ও ভারতবর্ষের বিষ্ণুশর্মার যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, ল্যাটিন ঐতিহ্যেও রয়েছেন তেমন একজন মহান সংগ্রাহক। এই ক্ষেত্রে গ্রিস ও ভারতবর্ষের পাশাপাশি ইতালির অবদানও কম নয়। তাঁর সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাচীনতর ঈশপের প্রভাব থাকলেও তাঁর স্বাতন্ত্র্যও উপেক্ষার নয়।

এই সংগ্রাহকের নাম কাইয়াস জুলিয়াস ফিদ্রাস বা ফেদ্রে। তাঁর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ১৫ অব্দে. সঠিক জানা না গেলেও পণ্ডিতেরা মনে করেন তাঁর মৃত্যু হয় ৫০ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ ক্লডিয়াসের রাজত্বকালেও তিনি জীবিত ছিলেন। সেকালের ও কিছু পরের রোমান চিরায়ত সাহিত্যিকরা এই সংকলনকে তেমন মর্যাদা দেননি। কিন্তু মধ্য যুগ থেকে ল্যাটিন ভাষার এই প্রথম লোককথা সংকলন ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ফিদ্‌রাস জন্মগ্রহণ করেন থ্রেস শহরে। অল্প বয়সে তিনি চলে আসেন ইতালিতে এবং গ্রিক ও ল্যাটিনে প্রথাগত শিক্ষালাভ করেন। জন্মসূত্রে ছিলেন ক্রীতদাস, শেষপর্যন্ত গৃহকর্তা অগাস্টাস-এর বদান্যতায় মুক্তি পান। পরবর্তীকালে একজন রাজ কর্মচারীর অসাধুতায় তাকে অভিযুক্ত হতে হয় এবং শাস্তি ভোগ করতে হয়।

তাঁর অনেক নীতিকথাই ঈশপের নীতিকথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। নেকড়ে ও মেষশাবক, সিংহের অংশ, দুটি থলি, শেয়াল ও টক আঙুর, গোবরের মধ্যে মুক্তো— ফিদ্‌রাস-এর গ্রন্থেও ঈশপের এসব জনপ্রিয় নীতিকথা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবু তাঁর অনন্যতাও স্বীকার করতে হবে। অনেক নতুন নীতিকথাই শুধু নয়, তার ওপরে ফিদ্‌রাস 'was tne first writer to latinize whole books of fables.

তিনি নীতিকথার পাঁচটি খণ্ড লিখেছিলেন। তাঁর এই সংকলন প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে। তারপরে উনিশ শতকের গোড়ায় ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে নতুনভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরে গোটা ইউরোপে তাঁর নীতিকথা ছড়িয়ে পড়ে। পরপর বহু ভাষায় অনূদিত হতে থাকে।

আরব্য-রজনী

বিশ্বের লোককথার এক অনন্য সম্পদ আরব্য-রজনী যার পরিচয় 'হাজার এক রাত্রি' হিসেবে। মধ্যযুগের আরবি ভাষায় এই লোককথা সংকলিত। প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো লোককথা বলব কোন যুক্তিতে? প্রথমত, এইসব কল্পনা-কাহিনির কোনো সংকলকের নাম আমরা জানি না— লোকসংস্কৃতির অন্যতম পরম্পরা হল, এগুলো মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত, এর কোনো একজন রচয়িতা থাকলেও সমগ্র সমাজ যখন এই মৌখিক সংস্কৃতিকে নিজেদের সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দেন তখন এর আদি স্রষ্টা আড়ালে চলে যান, লোকসংস্কৃতির মালিক হন গোটা লোকসমাজ। আর লিখিত কাহিনি প্রচারিত হতে সময় লাগে, তাও প্রচারিত হয় সাক্ষর মানুষজনের মধ্যে। আরব্য-রজনীর ক্ষেত্রে কী ঘটেছে সেটা দেখা দরকার।

ইতিহাসের সাক্ষ্য রয়েছে, দশম শতাব্দীতে আরব্য-রজনীর ২৬৪টি কাহিনি নিকট প্রাচ্যের ইসলামি দেশগুলোতে প্রচারিত হয়। তখন তো পুথির নকল ছাড়া লিখিত মাধ্যমে প্রচারের কোনো সুযোগ ছিল না। আর লিখিত পুথির মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল এমন কোনো নিদর্শন নেই। আসলে এগুলো

নিকট প্রাচ্যের বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল মৌখিক মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, এর কিছুকাল পরে মধ্যযুগে ইউরোপের ব্যাপ্ত এলাকায় এসব কাহিনি ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে বণিকদের মাধ্যমে। আরবি ভাষার পুথি নিশ্চয়ই ইউরোপের মানুষ পড়তে পারতেন না। আর অত পুথি নকল করবেনই বা কে! তাই এই প্রচারের মাধ্যমও ছিল মৌখিক। এই তথ্য আরব্য-রজনীর লৌকিক ঐতিহ্য বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করে।

আর একটি তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরব দুনিয়ায় হজরত মহম্মদ জন্মেছিলেন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, প্রয়াত হন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। জিশুখ্রিস্ট কিংবা গৌতম বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই ধর্মনেতার মৌলিক একটি পার্থক্য আছে। খ্রিস্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম জিশু ও বুদ্ধের প্রয়াণের অনেক বছর পরে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। কিন্তু মহম্মদের জীবৎকালেই ইসলামধর্ম আরব দুনিয়ার বৃহৎ অংশের মানুষের ধর্মে পরিণত হয়। কোরাননির্ভর এই ইসলাম ধর্মের মানুষকে কতকগুলি ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম বিধি পালন করে চলতে হয়। সামাজিক কোনো ব্যভিচার বিকৃতি ও অসংযম এই ধর্ম সহ্য করে না। নারীজাতির ক্ষেত্রেও অনেক সম্ভ্রম ও শীলতা মেনে চলার বিধান রয়েছে এবং ইসলামধর্মীরা তা মেনেও চলতেন। অথচ আরব্য-রজনীতে এমন সব কাহিনি ও আচরণ রয়েছে, নারীর লাস্যময়ী রূপের পরিচয় রয়েছে যা ইসলাম বিরোধী। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেও এইসব লোককথার লৌকিক পরম্পরার সন্ধান আমরা পাব। ইসলামধর্ম প্রতিষ্ঠার ছ-সাতশো বছরের পরের জনজীবন আমরা আরব্য-রজনীতে পাই, তার মধ্যেই এর উত্তর রয়েছে।

সাধারণ হাটবাটের গ্রামীণ মানুষ শাস্ত্রীয় ধর্মও পালন করেন, সেইসঙ্গে লৌকিক ঐতিহ্যও মেনে চলেন। লৌকিক ঐতিহ্য প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে লোকসমাজ কোনোভাবেই তাকে পরিত্যাগ করতে পারে না। আজকের আফ্রিকায় কিংবা ল্যাটিন আমেরিকায় অধিকাংশ মানুষই খ্রিস্ট ও ইসলামধর্মের আওতায় রয়েছেন। তারা গির্জা ও মসজিদেও যান আবার আদিবাসী ধর্ম ও ঐতিহ্যও পালন করেন। ভারতীয় যেসব আদিবাসী খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন তারাও এই শাস্ত্রীয় ধর্মের পাশাপাশি আদিবাসী ঐতিহ্যকেও ভুলে যাননি।

আরব দুনিয়ার মুসলমানেরাও একই রকমভাবে শাস্ত্রীয় ইসলামধর্মের প্রতি অনুগত থেকেও লৌকিক ঐতিহ্যের চটুল লঘু আরব্য-রজনীর

কাহিনি উপভোগ করেছেন, রসগ্রহণ করেছেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তা পুত্র-নাতিদেরও শুনিয়ে এসেছেন। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধেনি। এই মানসিক উদারতার জন্যই লৌকিক ঐতিহ্য বহমান থাকে। ইসলামের ধর্মীয় পরিবেশেও যে আরব্য-রজনী এত জনপ্রিয় হতে পেরেছে, তার কারণ আরব্য-রজনীর লৌকিক উৎস। নিজস্ব প্রাণপ্রিয় সম্পদ লোকসমাজ হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও বিসর্জন দেন না।

আরব্য-রজনীর কাহিনিগুলির যে রূপ আজকে আমরা দেখি, সেগুলি সুষ্ঠু রূপ পায় ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ— অন্তত পণ্ডিতেরা তাই অনুমান করেন। অর্থাৎ চারশো বছর মৌখিক ঐতিহ্যে লালিত হয়ে মধ্যযুগে বিশিষ্ট আঙ্গিকে তার পরিণতি ঘটল। এর বেশ কিছুকাল আগে থেকেই কাহিনিগুলি পুথিবদ্ধ হয়ে লিখিত আকার পায়। যারা লিখিত আকার দিলেন তারা শিক্ষিত মানুষ, তারা মনন-সমৃদ্ধ। লৌকিক সম্পদগুলি লিখিত আকারে প্রকাশিত করবার সময় তারা ভাষা পরিশীলিত করলেন, নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে কাহিনিগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাহিনির পরিবর্তন ঘটালেন। লৌকিক মানুষের মৌখিক ঐতিহ্য লিখিত আকার দেওয়ার সময় এসব পরিবর্তন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর সর্বত্রই এই পরিশীলন চোখে পড়ে।

গ্রিক কৃষকদের মৌখিক লোককথা ঈশপ লিখিত রূপে প্রকাশ করলেন, ভারতীয় কৃষকদের লোককথা বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্রে, নারায়ণ হিতোপদেশে, পিল্‌পে নীতিকথায় এবং অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কথাসরিৎসাগর, বৃহৎকথামঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করলেন। এইসব লৌকিক লোককথা তাদের মনন-ঋদ্ধ পুথিতে নতুনভাবে প্রকাশ পেল। আরব্য-রজনীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই ১৭০৪-১৭ খ্রিস্টাব্দে আরব্য-রজনীর প্রথম ইউরোপীয় অনুবাদ যখন ফরাসি ভাষায় প্রকাশ করলেন Antoine Galland তখন তিনি বলেছিলেন, আরব্য-রজনীর অনেক পুথি তিনি দেখেছেন যাতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রয়েছে, তিনি একটি পাঠই গ্রহণ করেছেন। লোকসমাজের মৌখিক সৃষ্টি বলেই তিনি নানা ধরনের পাঠের সন্ধান পেয়েছেন। যদি আরব্য-রজনী লিখিত ঐতিহ্যের সম্পদ হত তাহলে কখনই ভিন্ন ভিন্ন পাঠান্তরের সন্ধান মিলত না।

অন্য একটি প্রসঙ্গও উল্লেখ করার মতো। লোকসংস্কৃতির মধ্যে বিশ্বজনীন মানসিকতা থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকসংস্কৃতি মূলত আঞ্চলিক

সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কেননা, লোকসমাজ বৃহৎ ভৌগোলিক সীমারেখার সন্ধান জানে না, তার পরিবেশকেই সে গুরুত্ব দেয়, তার চেনাজানা সমাজকেই গুরুত্ব দেয় তার শ্রুতিনির্ভর লোকসাহিত্যে। আরব্য-রজনীতে আমরা লোকমানসের সেই আঞ্চলিক রূপের সন্ধান পাই— the tales convey the spirit of the Eastern and Mahammedan life, its exotic setting and customs and its sensuality. Although there is no specific moral purpose, there is a moral core beneath the fantasy. The astaunding narrative cover an amazingly wide range of fact and fiction. *The Reader's Companion to World Literature: Ed. Lillian Herlands Hornstein.*

আরব্য-রজনীর কাহিনির মধ্যে যে ইন্দ্রিয়গত বাসনা, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা এবং ইহজাগতিক কামনা পরিস্ফুট হয়েছে তা লৌকিক সংস্কৃতির জগতে স্পর্ধিত ব্যতিক্রমী জীবনদর্শন হিসেবে দুনিয়ার মৌখিক ঐতিহ্যে অনন্য হয়ে রয়েছে।

বিশ শতকের একজন প্রাজ্ঞ মানুষ ইংলন্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের আরবি ভাষার অধ্যাপক জন আলফ্রেড হেইড় 'আলফলায়লা ওয়া লায়লা' বা আরব্য-রজনী বিষয়ে দীর্ঘদিনের গবেষণায় জানালেন— এগুলো অনেক কাহিনির সংকলন, এর অন্য নাম রয়েছে, আরব্য-রজনীর কাহিনি। এসব কাহিনি কবে সংগৃহীত হয়েছে তার কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করার উপায় নেই, দ্বিতীয়ত এসব কাহিনির উৎস লৌকিক আর তাই এসব কাহিনির কোনো লেখক কিংবা কথকের নাম জানা যায় না— a collection of stories of uncertain date and authorship. সারা বিশ্বের লোকসংস্কৃতি-গবেষক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা লোকসংস্কৃতির যেসব সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তাতে বারবার বলা হয়েছে, লোকসংস্কৃতির সব আঙ্গিকের উৎস-সময় বলা যায় না আর এর কোনো লেখকের সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে— মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত বলেই পুরুষানুক্রমে এসব প্রবহমান থাকে লোকসমাজের মধ্যে, তাই কোন সময়ে এগুলির উৎসার ঘটেছে তার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, এর রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই ব্যক্তিগতভাবে কেউ এগুলো রচনা করেছেন, কিন্তু তিনি এসবের মধ্যে

কোথাও তার নাম প্রকাশ করেন না। এইসব আঙ্গিক লোকসমাজ গ্রহণ করে তাদের নিজস্ব সম্পদে রূপান্তরিত করেন। ব্যক্তিগত সৃষ্টি সামগ্রিক সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হয়। লোকসংস্কৃতির সবকিছুই তাই সামগ্রিক সৃষ্টি। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আরব্য-রজনীর কাহিনিগুলি পুরোপুরি লৌকিক সম্পদ হিসেবে গণ্য হতে পারে। জন আলফ্রেড হেইড্-এর গবেষণা আরব্য-রজনীর লৌকিক উৎস সম্পর্কে আমাদের দ্বিধামুক্ত করতে সহায়ক হয়েছে।

আরব্য-রজনীর কাহিনির কাঠামো বিশ্লেষণ করলে আমরা লৌকিক উৎসের আরও সন্ধান পেতে পারি। আরব্য-রজনী লোককথার সংকলন। লোককথার ভাগগুলির মধ্যে আমরা পাই রূপকথা, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, রোমাঞ্চকর বিবরণ, নীতিকথা, কৌতুককাহিনি, সত্যমূলক বিবরণ— এসবই আমরা পাই আরব্য-রজনীর কাহিনিগুলির মধ্যে। কাঠামোগত বিশ্লেষণেও আরব্য-রজনীর লৌকিক উৎসের সন্ধান এভাবেই ধরা দেয়।

লোককথার বিশ্লেষণে মোটিফ ইন্ডেক্সের ভূমিকা অপরিসীম। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা লোকঐতিহ্যের বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। আরব্য-রজনীর কয়েক শো কাহিনির মধ্যে আমি এক হাজার মোটিফ খুঁজে পেয়েছি, যা লৌকিক উৎস বিষয়ে ব্যাপ্ত ও গভীর প্রমাণরূপে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

মোটিফ ইনডেক্সের সংজ্ঞায় বলা হয়, A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. মৌখিক ঐতিহ্যের প্রতিটি লোককথায় এক বা একাধিক মূল বিষয়ে থাকে— এই মূল বিষয়কে বলে মোটিফ। একটি লোককথাকে ভেঙে কাহিনি-ব্যবচ্ছেদ করলে তার এক বা একাধিক কাহিনি অংশ পাওয়া যাবেই, সেই কাহিনি অংশ বা কাহিনি অংশসমূহকে জুড়ে অখণ্ড কাহিনি গড়ে ওঠে। লোকসংস্কৃতিবিদেরা কোনো কাহিনির লৌকিক উৎস আবিষ্কার করতে মোটিফের সন্ধান করেন।

এই অধ্যায়ে সমগ্র মোটিফেরই উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমি অতি পরিচিত কিছু মোটিফের সন্ধান দিচ্ছি:

সাগরতলে দেবতার আবাসস্থল। ভাগ্যদেবী। দুর্ভাগ্যের দেবতা। সৌভাগ্যের দেবী। বহুভুজ দেবতা। অগ্নিলোচন দেবতা। পশু-আকৃতির দেবতা। পশুর রূপে দেবতা। দানবরূপী দেবতা। দেবতাদের আজ্ঞাবাহক দৈত্য। দুধসাগরে দেবতা। দেবদূত। রূপের দেবী। ন্যায়ের দেবতা। সম্পদের

দেবী। মৃত্যুর দেবতা। স্বর্গ। ধ্বংসের দেবতা। সাপের সঙ্গে যুদ্ধ। সোনালি মাছ। বুদ্ধিমান পশু-পাখি। পাখির ভাষা। উপকারী ঘোড়া। পাখি-বাহিত মানুষ। দৈত্য-বাহিত মানুষ। জাদু-প্রদীপ। পাখি মানুষকে সম্পদ দেয়। বিষধর সাপ। সপ্তফণা সাপ। সহস্র-ফণা সাপ। সাপের মাথার মণি। জাদু-ঘোড়া। পশুর কাছ থেকে জাদু-বস্তু লাভ। দৈত্যের কাছ থেকে জাদুবস্তু লাভ। চলার পথে নিষিদ্ধ দিক। নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন। রাক্ষসী মানবী মূর্তি ধারণ করে। দৈত্য মানুষের রূপ ধারণ করে। রূপ পরিবর্তন: নারী থেকে ডাইনি। ঘ্যান ঘ্যান করা বউ। জাদুবস্তু। বহুফুল। জাদুপালক। জাদুপাখা। জাদুপ্রণালী। জাদুপ্রয়োগ। রূপ পরিবর্তন: মানুষ থেকে পাথর। চুম্বন দ্বারা জাদুমুক্ত হওয়া। জাদুপোশাক। জাদুমণি। জাদু আংটি। জাদু প্রদীপ: জাদু সংগীত। জাদু বাজনা। জাদু আংটি রক্ষা করে। স্বপ্নের মাধ্যমে উপদেশ। জাদুর দ্বারা অদৃশ্য হওয়া। জাদুর সাহয্যে পলায়ন। পুনর্জীবন। রক্তশোষক রাক্ষসী। পুনর্জন্ম। বহিরঙ্গ আত্মা। বস্তুর মধ্যে আত্মা। সুচতুর চোর। সাধুর ছদ্মবেশে চোর। ফাঁদে ফেলে বন্দি করা। নিগৃহীত প্রণয়ী। নিন্দিতা বউ। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু। পুনর্মিলন। মানুষের ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত থাকে। ভাগ্যবান নায়ক। সাহায্যকারিণী মেয়ে। ভাই ও বোন। দয়ালু ও নির্দয়। যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। উৎপীড়িতা স্ত্রী। জাদু রঙ ভ্রান্তি আনে। জিয়ন-জল। সোনার ফুল। সাপের রূপে রাক্ষস। সতী। স্বৈরিণী। ধূর্ত ও লোভী নাপিত। কুঁজো। শাস্তি। অঙ্গচ্ছেদন। অধর্মের শাস্তি। সতিনের প্রতি হিংসে। উদারতা। কৃপণতা। কৃতজ্ঞতাবোধ। অবিশ্বাসী স্ত্রী। দেহগত কামনা। লাম্পট্য।

আরব্য-রজনীতে যে এক হাজার মোটিফের সন্ধান মিলেছে তার কয়েকটি নমুনা দিলাম। উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের মধ্যেও মোটিফের সন্ধান মিলবে, কেননা কোনো মহৎ সাহিত্যিকই তাঁর লৌকিক পরম্পরাকে অস্বীকার করতে পারেন না। উইলিয়াম শেকস্‌পিয়র, লেভ তলস্তয় গিওভানি বোক্কাচিও, টমাস্ মান, রবীন্দ্রনাথ, মুন্সি প্রেমচাঁদ, বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক, সমারসেট মম, ন্যুট হামসুন, ভিক্টর হুগো, সাদাত হাসান মন্টো প্রমুখের কথাসাহিত্যেও আমরা মোটিফের সন্ধান পাব। কিন্তু আরব্য-রজনীর মধ্যে যে অসংখ্য লৌকিক অতি-পরিচিত মোটিফের সন্ধান পাই তা অন্য কোথাও পাই না। এই মোটিফ-পদ্ধতি জানিয়ে দেয় কীভাবে আরব্য-রজনীর কাহিনিগুলির উৎসভূমি লৌকিক ঐতিহ্য থেকে উৎসারিত হয়েছে।

লোকসংস্কৃতির উৎস-নির্ণয়ে আর একটি পদ্ধতি হল রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির অন্যতম প্রবক্তা হলেন অ্যালান ডানডেস। তিনি বলেছেন, লোককথা বিশ্লেষণ করে আমরা পাই, Lack and Liquidition of Lack. অভাববোধ ও অভাববোধ থেকে অভাব দূরীকরণের আর্তি ও প্রয়াস। আরব্য-রজনীর সব কাহিনিতে রয়েছে একটা অভাববোধ এবং শেষপর্যন্ত অভাব পূরণের মধ্যে কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে। সাধারণ হাটবাটের মানুষ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত, কিন্তু কল্পনায় তারা অনেক কিছুর সমাধান করে। তাদের জীবনে যেসব অভাববোধ আছে তা তারা লোককথার মাধ্যমে পূরণ করে নেয়। এক ইচ্ছাপূরণের তাগিদ। গোটা আরব্য-রজনীর মধ্যে আমরা এই অভাবপূরণ কিংবা ইচ্ছাপূরণের তাগিদের সন্ধান পাই।

আরব্য-রজনীর লৌকিক উৎস বিষয়ে আর একজন প্রাজ্ঞ মানুষের কথা বলতে হবে। তাঁর নাম Antoin Silvestre de Sacy. তিনি ছিলেন ফরাসি প্রাচ্যবিদ। উনিশ শতকে তাঁর উদ্যোগেই শুরু হয় আরব্য-রজনীর উৎস-সন্ধান। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন— এই কাহিনিগুলি একজন লেখকের সৃষ্টি নয়, এবং এর উৎস আরবীয় লোকসমাজ। দীর্ঘ দিনের গবেষণায় জানা গেল, Nights consisting of popular stories originally transmitted orally and developed during several centuries with material added somewhat haphazardly at different periods and places.

আরব্য-রজনীর অনেক কাহিনির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ভারত ইরান মিশর তুরস্ক ও গ্রিসে। লোককথার মাইগ্রেশন তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় একই লোককথা কোনো প্রভাব বা পরিভ্রমণ ছাড়াই নিরপেক্ষভাবে নানা দেশে উদ্ভূত হতে পারে। এই তত্ত্বেও আরব্য-রজনীর লৌকিক উৎস সম্পর্কে তথ্য রয়েছে।

পরবর্তীকালের নাগরিক কথকদের মুখে ও লিখিত হওয়ার সময় আরব্য-রজনীতে অনেক পরিবর্তন ঘটে, পরিশীলিত হাতের ছোঁয়া পড়ে। কিন্তু এসব কাহিনির মূল উৎস লৌকিক জগৎ, স্রষ্টা হলেন লোকসমাজ।

জাঁ দ্য লা ফঁতেন

লোকসংস্কৃতি-গবেষক কিংবা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী না হয়েও ছাব্বিশ বছর ধরে নীতিকথার সংকলন-কাজে একাগ্রভাবে ব্রতী থেকেছেন এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। সেই স্পর্ধিত মানুষটি হলেন জাঁ দ্য লা ফঁতেন।

ফরাসি পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত কবি লা ফঁতেন ১৬২১ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই ফ্রান্সের Champagne-এর Chateau-Thierry-তে জন্ম গ্রহণ করেন। কুড়ি বছর সেখানে ছিলেন বনদপ্তর ও জলাভূমির পরিদর্শক। ধনী পরিবারের সন্তান পারিবারিক ঐতিহ্যে খিস্টীয় পুরোহিত হওয়ার কথা। কিন্তু ধরাবাঁধা জীবনে আটকা পড়া তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাই পরিদর্শকের কাজ বেছে নেন। চলে আসেন পারি শহরে। জীবনও অন্য খাতে আবর্তিত হল। এখানেই Boileau, Racine, Moliere ও লা ফঁতেন এই চারজন বন্ধু মিলে খ্যাতনামা সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এঁরা চারজনেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক। ১৬৮৩ সালে লা ফঁতেন ফ্রেঞ্চ আকাদেমির

সদস্য হন। কিন্তু পরবর্তীকালে লা ফঁতেন-এর সেসব সাহিত্য-কর্ম গ্রন্থাগারে আবদ্ধ হয়ে রইল। স্মরণীয় হয়ে রইলেন নীতিকথার সংকলক হিসেবে।

ছাব্বিশ বছরে তিনি ২৪৩টি নীতিকথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। সময়কাল ১৬৬৮ থেকে ১৬৯৪ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ ১৬৯৫ সালে মৃত্যুর এক বছর আগেও নীতিকথা তাঁর সাহিত্যক ভাবনাকে উদ্দীপিত করে রেখেছিল।

তিনি অকপটে সংগ্রহের ঋণ স্বীকার করে গিয়েছেন। বলেছেন, ঈশপ, হোরেস, বোক্কাচিও, অ্যারিওস্‌টো, টাসো ও ম্যাকিয়াভেলির রচনাই তাঁর প্রেরণা। সঙ্গে আরও দুটি ভারতীয় নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন, ভারতীয় সাহিত্য পঞ্চতন্ত্র ও পিলপের নীতিকথা।

নীতিকথার দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লা ফঁতেন লিখেছেন, This is the second book of fables that I present to the public... I must acknowledge that the greatest part is inspired by Pilpay, the Indian Sage, 'Pilpay sage Indien.'

তাঁর ১২৪টি নীতিকথার প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয় ১৬৬৮ সালের ৩১ মার্চ। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৬৭৮ সালে। সর্বশেষ খণ্ড ১৬৯৪ সালে। ইউরোপীয় ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত থাকলেও প্রাচ্যের ঐতিহ্যের নিদর্শনই বেশি।

লা ফঁতেন ছিলেন উচ্চমানের কবি। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, তিনি ২৪৩টি নীতিকথাই কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এও এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নীতিকাহিনি হিসেবেই শুধু নয়, কাব্য হিসেবেও সেগুলি উচ্চাঙ্গের।

নীতিকথার মধ্যে পশুপাখির অনেক চরিত্র থাকে। কিন্তু তারা দেহাবয়বে পশুপাখি হলেও আচরণে-স্বভাবে-চরিত্রে-ভাবনায় মানুষ। মানুষের সব দোষ-ত্রুটি-গুণ-মহত্ত্ব-নীচতা-সংকীর্ণতা-হিংসা-প্রতিশোধ পরায়ণতা এসব পশুপাখি চরিত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়। নীতিকথার এইসব বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সচেতনভাবে লা ফঁতেন অনুসরণ করেছেন এবং সার্থকভাবে। অন্য সব নীতিকথার মতোই তাঁর নীতিকথার শেষে নীতি-উপদেশ রয়েছে। লঘু হাস্যরসাত্মক কাহিনির মধ্যেও জীবনের বাস্তব কঠিন সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। They are infused into La Fontaine's love of rustic life

and belief in ethical hedonism; all are written with his marvelous wit and elegance. He reveals his immense affection of humanity, complete with its foibles, vices and foolishness, conjured up in the guise of farm animals and farmers. *Edward Marsh.*

উনিশ শতকে লা ফঁতেন-এর কাব্য-আকারে নীতিকথা ফরাসি চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করল এবং অনুবাদের মাধ্যমে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। আজও ফ্রান্সে শিশু-কিশোরদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় লোককথা হল লা ফঁতেন-এর নীতিকথাগুলি।

লা ফঁতেন এর নীতিকথার জনপ্রিয়তার একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যেতে পারে। বিশ শতকের তথ্য। তাঁর মৃত্যুর ২৩২ বছর পরের ঘটনা। মার্ক শাগাল জন্মেছিলেন ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে, জারশাসিত বেলোরুশিয়ায় এক ইহুদি ঐতিহ্যের পরম্পরায়। তাঁর অনন্য শিল্পীজীবনের কথা সকলেই জানেন। অন্য একটি প্রসঙ্গ এখানে বলা প্রয়োজন যার সঙ্গে লা ফঁতেন-এর নীতিকথা যুক্ত।

১৯১০ সালে শাগাল পারিতে এসেছিলেন, আবার ফিরেও যান স্বদেশে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হওয়ার পরে যান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সাঁড়াশি আক্রমণে শিল্প সাহিত্যকেও ছক-বাঁধা পথে যেতে বাধ্য করা হল। শাগালের শিল্প নাকি 'সরকারি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না এই অজুহাত এলে শাগাল ১৯২২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছেড়ে বার্লিনে এলেন, পরের বছর এলেন পারিতে। মানুষ শাগালের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিলেন।

পারির একজন প্রকাশক শাগালকে প্রস্তাব দিলেন যে, লা ফঁতেন-এর নীতিকথাগুলির 'এচিং' করতে হবে যেগুলি 'ফেবল্‌স অব লা ফঁতেন' গ্রন্থে ব্যবহৃত হবে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত তিনি এসব ছবি আঁকলেন। শিল্প-সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করলেন, In these plates we move from the fantastic Russia of Chagall's imagination and memory to the more dream-like world of ancient myth and fable, told and retold, charging from time to time and place to place, but ultimately always the same. *P.W. Goetz*

লা ফঁতেন-এর কয়েকটি নীতিকথার অনুবাদ দেওয়া হল, যেগুলোর মধ্যে ভারতীয় নীতিকথার প্রভাব স্পষ্ট তার কিছু নমুনা। লা ফঁতেন তাঁর সব নীতিকথাই কাব্য-আকারে লিখেছিলেন। বাংলা অনুবাদে তাঁর কোনো নীতিকথাই বোধকরি এ যাবত প্রকাশিত হয়নি।

ক. ফড়িং ও পিঁপড়ে। বসন্ত কাল। মনে তাই ফুর্তি। ফড়িং গোটা ঋতু গান গেয়ে উড়ে কাটিয়ে দিল। বসন্ত শেষে উত্তুরে হাওয়া বইতে লাগল। উত্তরের গান ভেসে আসছে হাওয়ার দাপটে। ফড়িং দেখল খাওয়ার মতো তার কিছুই সঞ্চয় নেই। একটা দানাও নেই।

পড়শি পিঁপড়ের কাছে গেল। বলল, খিদে সহ্য করতে পারছি না। খুব কষ্ট। কয়েকটা দানা ধার দাও, নইলে মরেই যাব। বসন্ত আসা পর্যন্ত কিছু ধার দাও। কথা দিচ্ছি, তখন শোধ করে দেব, সঙ্গে বাড়তি কিছু দেব।

পিঁপড়ে সব বুঝল। ফড়িং-এর এই অবস্থার জন্য সে দায়ী নয়। তুমি গোটা বসন্তকাল কী করেছ?

ফড়িং বলল, তুমি নিশ্চয়ই রাগ করবে না, আমি গোটা বসন্তকাল দিনে-রাতে গান গেয়ে কাটিয়েছি।

তুমি গান গেয়ে কাটিয়েছ? আমার রাগ করার কিছুই নেই। তুমি পড়শি, এখন নেচে নেচে বেড়াও, এখন তোমার নাচার সময়।

খ. শেয়াল ও কাক। কাক বসে রয়েছে এক গাছের ডালে। মুখে তার এক টুকরো পিঠে। গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল এক শেয়াল। পিঠের সুন্দর গন্ধে সে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে, কাকের মুখে পিঠে।

শেয়াল ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, কাক, প্রণাম নাও। কী সুন্দর তোমাকে দেখতে। রূপবতী পাখি তুমি। সত্যি কথা বলতে কী, তোমার পালকের মতোই সুন্দর তোমার গান। যে শুনেছে সে কোনোদিন ভুলতে পারবে না। বনের সবচেয়ে সুন্দর পাখি হলে তুমি।

শেয়ালের মুখে একথা শুনে কাকের খুব আনন্দ হল। তার গানের গলা যে কত মিষ্টি তা শোনাতে গিয়ে সে ঠোঁট ফাঁক করে গাইতে গেল। মুখ থেকে পড়ে গেল পিঠে।

পিঠে মুখে ঢুকিয়ে শেয়াল বাঁকা হেসে বলল, কাক, যারা অকারণে প্রশংসা করে তারা সবসময় জিতে যায়, যার প্রশংসা করছে সে বোকা বনে যায়। কোনো প্রশংসাকেই গুরুত্ব দিতে নেই।

গ. হরিণ ও প্রতিবিম্ব। একদিন এক হরিণ পাহাড়ি নদীর তীরে দাঁড়িয়েছিল। জলের মধ্যে তার ছায়া পড়েছে। অপরূপ সুন্দর ডালপালা ছড়ানো শিং দেখে গর্বে তার আনন্দ হল। আঃ কী সুন্দর শিং আমার।

হঠাৎ জলের ছায়ায় তার পায়ের দিকে নজর গেল। ছিঃ কী সরু সরু বিশ্রী পা আমার। পাগুলো আমার মাথার শিং-এর মতো সুন্দর নয়।

এইসব ভাবছে হরিণ। এমন সময় এক বুনো কুকুর ঝোপ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে তাকে তাড়া করল। প্রাণভয়ে ছুটল হরিণ। বনের এদিক ওদিক দিয়ে ছুটছে সে, পেছনে বুনো কুকুর। তার পায়ে দুরন্ত গতি। বুনো কুকুর অনেক পেছনে পড়ে রইল।

হঠাৎ বনের এক ঝোপে তার বড় আঁকাবাঁকা শিং আটকে গেল। ছাড়াতে চেষ্টা করছে, পারছে না। লাফিয়ে পড়ল কুকুর। কুৎসিত সরু সরু পা তাকে বাঁচিয়েছিল কিন্তু গর্বের শিং তার মৃত্যুর কারণ হল।

এই নীতিকথার শেষে লা ফঁতেন কাব্য-আকারে উপদেশ দিয়েছেন এভাবে: We value what is beautiful and scorn the useful, yet beauty often destroys us. The stag despised his feet which gave him life, while valuing the crown which caused him strife.

ঘ. কুকুর ও প্রতিবিম্ব। কুকুর এক টুকরো মাংস মুখে ধরে তাড়াতাড়ি দৌড়চ্ছে। হঠাৎ পথের পাশের জলে চেয়ে দেখে, আর একটা কুকুর মাংস মুখে নিয়ে পালাচ্ছে। কুকুর লাফ দিল জলে, সে ওই মাংসের টুকরোও পেতে চায়। নদীর ঢেউ তাকে অনেক দূরে নিয়ে ফেলল। কোনোরকমে তীরে উঠে কুকুর হাঁপাতে লাগল। নিজের মুখের মাংসের টুকরোও গেল, জলের মধ্যের টুকরোও কোথায় মিলিয়ে গেল।

লা ফঁতেন শেষে বললেন,—

People fool ourselves in this world;
Chasing after shadows
So numerous are they that often,
We cannot count the number.

লা ফঁতেন-এর ২৪৩টি নীতিকথার সংকলন বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে যে নীতিকথাগুলি সংগ্রহ করে কাব্য-আকারে প্রকাশ করেছেন তাঁর পেছনে রয়েছে সামাজিক মঙ্গলচিন্তা এবং উচ্চমানের

দার্শনিক প্রত্যয়। সেই কারণে নীতিকথাগুলির নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আর অন্যান্য সংকলকেরা যেভাবে শেষে নীতি উপদেশ দিয়েছেন, লা ফঁতেন-এর উপদেশের মধ্যে উপরন্তু দার্শনিক ভাবনাও প্রকাশ পেয়েছে। আর তাই তাঁর উপদেশগুলি নীতিকথার প্রচলিত উপদেশের মতো সংক্ষিপ্ত নয়। কিছুটা বিস্তৃত। সমাজের কল্যাণ-কামনার আন্তরিক সদিচ্ছায় দার্শনিক প্রত্যয়ের উৎসার।

হানস্ খ্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেন

হানস্ খ্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেন উনিশ শতকের গোড়ায় ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল ডেনমার্কে জন্মেছিলেন, ফিন দ্বীপের ওডেন্‌সে শহরের বস্তিতে। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৭৫ সালের ৪ অগাস্ট কোপেনহেগেন শহরে।

বাবা ছিলেন চামড়ার জুতোর কারিগর, মা ছিলেন আদ্যন্ত কুসংস্কারে মগ্ন নিরক্ষর নারী। পিতামহ ছিলেন অপ্রকৃতিস্থ, ঠাকুমা ছিলেন অস্বাভাবিক বিকারগ্রস্থ সদা-মিথ্যেবাদী। এই ঠাকুমা নাতির ছেলেবেলাকে ধ্বংস করে দিতে খুব তৎপর ছিলেন। সেকালে বস্তি ও গরিব এলাকার এই ছিল পরিবেশ। কলুষিত নগর-পরিবেশ। কিন্তু গ্রামীণ ডেনমার্ক ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। গোটা ইউরোপের নগরগুলির বস্তি এলাকার এটাই ছিল স্বাভাবিক আবহাওয়া। এরই মধ্যে অ্যান্ডারসেনের উত্থান ও বিকাশ।

পারিবারিক এই অবস্থান, আশেপাশে অসুস্থ আত্মীয়-স্বজন। একটিই আলোর পরশ ছিল। বাবা ছিলেন কারিগর, তার ছিল শিল্পীর মন। শত

প্রতিকূলতার মধ্যেও কেমন যেন সৃষ্টির নেশা ছিল। বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। বাবা চামড়ার টুকরো দিয়ে ছোট ছোট পুতুল গড়ে দিতেন ছেলেকে। ছেলে ছিল স্বপ্নবিলাসী, দিবাস্বপ্নে বিভোর, বিচিত্র সব চিন্তা মাথায় ঘুরত আর এই ছোট ছোট পুতুল ছিল তার বন্ধু, সঙ্গী, স্বপ্নের বাস্তব বস্তু।

ডেনমার্ক তখন উত্তপ্ত। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাবা ডেনমার্কের দেশপ্রেমিক যুদ্ধে অংশ নেন। সত্যিই দেশপ্রেম বুঝবার মতো শক্তি তার ছিল কিনা জানা যায় না, খামখেয়াল কিংবা দারিদ্র্যও হতে পারে। কিছুকাল পরে দেহে-মনে বিপর্যস্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। মারা যান ছেলের বয়স যখন এগারো, ১৮১৬ সালে। বিকারগ্রস্ত মা আবার বিয়ে করেন।

নিঃসঙ্গ বালক অসহায়। বস্তি এলাকায় দারিদ্র্য, পীড়ন, হতাশা, ঝগড়া-ঝাঁটি, ঈর্ষা আর চারিত্রিক স্খলন বোধহয় মানুষের স্বাভাবিক বোধগুলিকেও ভোঁতা করে দেয়। নইলে মাত্র এগারো বছরের পিতৃহীন পুত্রকে মা ছেড়ে চলে যান কোন মানসিকতায়? অষ্টাদশ-উনিশ শতকের ইউরোপের অনেক কথাসাহিত্যিকের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক উপন্যাসের কথা আমরা জানি।

বাবা বেঁচে নেই, বাবা আর তার চারপাশে হেঁটে বেড়াবে না, এ উপলব্ধি তার সে বয়সে হয়েছে। মা ছিল, কোথায় চলে গেল, তার খোঁজও নেয় না। কষ্ট কান্না নিদারুণ অসহায়তা— এসব তো আছে। কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ পেটের খিদে। এই খিদেই তাকে নিয়ে চলল অন্য জগতে। শিক্ষানবিশ হয়ে কিছু কাজ জোটানো, সামান্য অর্থ, কিছুটা খিদে মেটে, রাতে অপরিসর অপরিচ্ছন্ন দোকান-কারখানায় শোয়া। সে-ও সহ্য হয় কিন্তু সহকর্মীদের টিটকিরি, দৈহিক অত্যাচার এবং কুৎসিত অশ্লীল গালাগালি মনকে বিষিয়ে দেয়। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'দ্য ডাইং চাইল্ড' (১৮২৭) এবং তাঁর প্রথম এবং সবচেয়ে সফল আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'ইমপ্রোভাইজেটোরেন' (১৮৩৫)-এর মধ্যে উনিশ শতকের ডেনমার্কে তার ছেলেবেলার যন্ত্রণাবিদ্ধ দিনগুলি ও তার থেকে উত্তরণের সংগ্রামের কথা আছে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ইউথফুল অ্যাটেম্প্টস'-এ কিছু আভাস আছে। গ্রন্থটির প্রকাশকালে তার বয়স ছিল সতেরো বছর। লেখকের নাম ছিল বিচিত্র, শেক্সপিয়রের উইলিয়ম, স্কটের ওয়াল্টার এবং নিজের খ্রিশ্চিয়ান জুড়ে উইলিয়ম খ্রিশ্চিয়ান ওয়াল্টার।

কিন্তু এগারো বছরের নিঃসঙ্গ বালক কেমন করে মাত্র ছয় বছর পরে গ্রন্থপ্রকাশের সুযোগ পেল, ইউরোপের লেখকদের নাম জানল, লেখার তাগিদ এল কোথা থেকে? বড় অল্প সময়ে পর্বতসমান উত্থান— এই রহস্যের সন্ধান করলেই অ্যান্ডারসেনের প্রতিভা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায় এবং পরাভূত না হওয়ার মানসিকতার হদিস মিলবে। এই মানসিকতা তাকে শুধু ডেনমার্ক শেখায়নি, শিখিয়েছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার অন্য দেশগুলি, স্পেন, জার্মানি এবং তাঁর স্বপ্নের দেশ ইতালির মানুষজন।

১৮১৯ সাল, বয়স চোদ্দো, হাতে কিছু পয়সা জমাতে হয়েছে, বড় হয়ে 'বিখ্যাত' হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে চলে এল সেই কিশোর অচেনা কোপেনহেগেনে। আরও বড় শহর, আরও প্রতিকূলতা, আরও নির্মমতা। তাঁর লক্ষ্য রয়্যাল থিয়েটার, সেখানে কিশোর খ্যাতিমান হতে চায় সংগীতশিল্পী হিসেবে, শুধু তাই নয় সে নৃত্যশিল্পী হবে, হবে অভিনেতা, তা না হলে অন্তত নাট্যকার। কে তাকে এই স্বপ্ন দেখিয়েছিল তার কথা উত্তরজীবনে তিনি লেখেননি, বোধহয় তাঁর রূপকথার চরিত্রগুলির স্বপ্নের মধ্যে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উনিশ শতকের প্রথম সত্তর-আশি বছরের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্যগুলির সঙ্গে মিলিয়ে কেউ যদি অ্যান্ডারসেনের গ্রন্থগুলির অনন্য বিবরণ পড়েন তাহলে বিস্মিত হবেন। সেই সময়কালের ডেনমার্কের উত্তাল হৃদয়হীন ঝোড়ো দিনগুলি বিধৃত হয়ে রয়েছে তাঁর লেখায়, এমনকী রূপকথাতেও।

কিশোরের সামনে দাঁড়িয়ে কোপেনহেগেনের বিশাল রয়্যাল থিয়েটার, যেখানে অভিজাতদের প্রাধান্য। সপ্রতিভ কথাবার্তায় তার একটা চাকরি হল, কিন্তু বদলি কর্মীর চাকরি। সেখানেও বিপদ দেখা দিল। টালমাটাল অবস্থা। কিন্তু রয়্যাল থিয়েটারের কয়েকজন প্রভাবশালী উদার নাট্যকার-লেখক-সুরকার সেই কিশোরের সৌজন্য-আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা হানস্-এর পাশে দাঁড়ালেন। অভিনয়ের সময় তাঁর গলা ভেঙে গেল, দীর্ঘদিনের কষ্টকর দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনযাপনের ফল। রয়্যাল থিয়েটার থেকে বিতাড়িত হলেন।

আবার অন্ধকার, নিঃসীম অন্ধকার। আশায় বুক বেঁধে তিনি লিখলেন একটি ট্র্যাজেডি। সেই নাটক রয়্যাল থিয়েটার বাতিল করে দিল একটিমাত্র অজুহাতে— মঞ্চস্থ করার পক্ষে একেবারে অচল নাটক।

পরাভূত হতে শেখেননি হানস্। আবার পেলেন একজন উদার মানুষকে, তিনি এই যুবকের মধ্যে আগুন দেখেছিলেন। অনেক হতাশার মধ্যে আলোর বিচ্ছুরণ হয়। রয়্যাল থিয়েটারের অন্যতম পরিচলক জোনাস কোলিন তাকে অর্থসাহায্য দিয়ে পাঠালেন স্লাগেলসে গ্রামার স্কুলে, ১৮২২ সালে। তখন হানস্-এর বয়স সতেরো বছর। কোলিন-এর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও স্থান নির্বাচনে চরম ভ্রান্তি হয়েছিল। গ্রামার স্কুলের প্রধানশিক্ষক হানস্-এর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। প্রধান শিক্ষক ছিলেন সাইমন মেইসলিং— এক বিচিত্র মানসিকতার মানুষ, হানস্ হতাশার গভীরে ডুবতে থাকেন সেই বয়সেই। চার বছর কেটে যায়, ১৮২৬ সালে মেইসলিং হানস্‌কে নিয়ে চলে আসেন এল্‌সিনোরে-এ। সেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী হানস্-এর জীবনকে এমন পর্যুদস্ত করে দেন যে বাধ্য হয়ে কোলিন প্রধান শিক্ষকের থাবা থেকে হানস্‌কে বের করে এনে একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত অধীনে তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন, যার পরিণতিতে হানস্ দুবছর পরে ১৮২৮ সালে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। আলোকিত দুনিয়ার সন্ধান পেলেন হানস্। এগারো বছর বয়সের পরে প্রথম মুক্তি। আর এই মুক্তির পর অপরাজেয় হানস্‌কে কোনোদিন কোনো শক্তি পরাভূত করতে পারেনি, পরাভব মানেন ১৮৭৫ সালে, যার বন্ধন ছিন্ন করার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। আজ হোক কাল হোক তাকে বরণ করতেই হবে।

অজেয় হানস্ যে রয়্যাল থিয়েটার থেকে অবমানিত হয়ে বিতাড়িত হয়েছিলেন, সেই থিয়েটারেই তাঁর নাটকের অভিনয় হয়েছিল। রয়্যাল থিয়েটার নত হয়েছিল, হানস্ নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ১৮২৮ সালে, তেইশ বছর বয়সে। কিন্তু তার আগেই সাহিত্যিক হানস্-এর আত্মপ্রকাশ ছয় বছর আগে ১৮২২ সালে।

হানস্-এর সাহিত্যিক জগতের পরিচয় প্রথম নেওয়া প্রয়োজন। কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয় আগে দিয়েছি।

হানস্-এর যে পৃথিবী-জোড়া খ্যাতি সেই রূপকথাকার হিসেবে যাঁর আবির্ভাব ১৮৩৫ সালে যখন তাঁর বয়স তিরিশ বছর। সেই বয়সকালে তিনি প্রতিষ্ঠিত হননি, দারিদ্র্য ঘোচেনি। এইসব রূপকথা তিনি লিখেছেন ১৮৭২ সাল পর্যন্ত। সবচেয়ে বিস্ময়কর, ১৮৩৫ সালে প্রথম রূপকথা লিখবার

পরে মাত্র এগারো বছরের মধ্যে সেসব রূপকথা ১৮৪৬ সালে গোটা ইউরোপের প্রতিটি গৃহকোণে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮২৯ সালে কোপেনহেগেনের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন Fodreise fra Holmens Canal til Ostpynten of Amager,–an imaginative arabesque in the style of E.T.A. Hoffmann, describibing a journey on foot through the streets of Copenhegen. সত্যিকার খ্যাতি পেলেন তিনি আর এই বছরেই তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হল রয়্যাল থিয়েটারে।

এর দুবছর পরে গেলেন জার্মানিতে। ফিরে এসে অনেকগুলি ভ্রমণমূলক গ্রন্থ লেখেন। পরের দু বছরে অনেকগুলি কবিতা. নাটক, অনূদিত নাটক লেখেন। সেগুলি জনপ্রিয় হয়নি। ১৮৩৩ সালে চলে যান তাঁর স্বপ্নের দেশ ইতালিতে। এখান থেকে ফিরে আসার কয়েক বছর পরে বিশেষ করে ১৮৪৫ সালে The Improvisatore প্রকাশিত হওয়ার পরে হানস্ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক হিসেবে গণ্য হলেন। সংগ্রামের সাফল্য এল। ইতালি ভ্রমণের পরেই প্রকাশিত হল ও.টি. (১৮৩৬), কুন এন স্পিলেমান্ড (১৮৩৭), দ্য টু ব্যারোনেসেস (১৮৪৮) টু বি অর নট টু বি (১৮৫৭) এবং লাকি পিয়ার (১৮৭০)— সবই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনায় যেগুলি পূর্ণ। পাশাপাশি লেখা চলল রূপকথা-পরিকথার কাহিনি। যে পরিচয় আমাদের বেশি জানা।

ডেনমার্ক ছেড়ে বার বার গিয়েছেন বিদেশে, এশিয়া মাইনর, আফ্রিকা, গ্রিস, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন। ইংলন্ডে গিয়ে পাঁচ সপ্তাহ ছিলেন চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে। তাঁর ডায়েরিতে সেকালের সমাজ ও মানুষের অনেক অজানা কথা জানা যায়, যদিও অধিকাংশ ডায়েরি আজও অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছে।

পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ডেনমার্ক সংযুক্ত স্ক্যানডিনেভীয় সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল। ১৮১৫ সাল পর্যন্ত নরওয়ে দেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৮৩০ সালে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের অধীন হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে ব্রিটেন ইউরোপের সবচেয়ে বেশি শস্য আমদানির দেশরূপে গণ্য হল। ফরাসি বিপ্লব ও দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়কালে গোটা ইউরোপে খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত পণ্যের দাম অত্যন্ত বেড়ে

যায়। ডেনমার্ক কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করতে থাকে, ফলে ১৮০৭ সাল পর্যন্ত ডেনমার্কের অর্ধেক কৃষক নিষ্কর বা লাখেরাজ জমির অধিকারী হয়। এতে ডেনমার্কের গ্রামাঞ্চলের সমৃদ্ধি ঘটে, অধিকাংশ কৃষকই ছিল খুব পরিতৃপ্ত। হানস্-এর রূপকথায় এই কৃষকদের ছবি আছে। কিন্তু ডেনমার্কের নাগরিক জীবন ছিল বিপর্যস্ত, একদিকে অভিজাতদের লাগামছাড়া বৈভব ও উচ্ছৃঙ্খলতা আর অন্যদিকে নীচের তলায় অপরিসীম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা। এই নগরজীবনের ছবি আছে তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে।

ডেনমার্কের জাহাজশিল্প ও সমুদ্র-ব্যাবসা বেশ উন্নত ছিল। ১৮০০ সালের ডিসেম্বর মাসে ডেনমার্ক বালটিক শক্তিসমূহের সঙ্গে যোগ দেয়। পরের বছর গ্রেট ব্রিটেন হাইড পার্কার ও নেলসনের নেতৃত্বে কোপেনহেগেনে জাহাজ অভিযান চালায় এবং ডেনমার্ককে বালটিক চুক্তি থেকে সরে আসতে চাপ দেয়। ডেনমার্ক সরকার অস্বীকার করায় এপ্রিলের কোপেনহেগেন যুদ্ধে ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটেন ডেনমার্কের অধিকাংশ জাহাজ ধ্বংস করে দেয়। ব্রিটেনের শর্তে ডেনমার্ককে নত হতে হয়। এই ভয়াবহ যুদ্ধের পর থেকে ডেনমার্কের নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতি চুরমার হয়ে যায়। আর এই সময়েই কাটে হানস্-এর শৈশব ও কৈশোর।

তারপরে আর এক বিপর্যয়। জার্মানি ও ডেনমার্কের মধ্যে বিরোধ যা 'The Schleswig Holstein Question' নামে ইতিহাসে খ্যাত। এইসব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যার চাপ গিয়ে পড়ে গ্রামীণ খেত-খামারে। ১৮৫০ সালের পরেই কৃষকদের জীবনেও টালমাটাল অবস্থা দেখা দেয়। ভূমি সংস্কারের আন্দোলন হয়। এক কথায় ডেনমার্কের অভ্যন্তরে সর্বব্যাপী বিপর্যয় নেমে আসে। এই ডেনমার্কের অস্থির যন্ত্রণাময় পরিবেশ ও তার মানুষজন হানস্-এর কাব্যে-উপন্যাসে-নাটকে-ভ্রমণকাহিনি ও ডায়েরিতে বর্ণময় ও জীবন্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু সেইসব চরিত্র বাস্তবের প্রতিফলন বলেই চরিত্রগুলির মধ্যে এত হতাশা, যন্ত্রণা আর আশাহীনতা। ডেনমার্কের নগরজীবনে এগুলিই সেদিন সত্য ছিল।

আর ডেনমার্কের মানুষ? হানস্ কোন মানুষকে চিনতেন? ডেনমার্কের মানুষ নর্ডিক জাতির শরিক। এরা দীর্ঘদেহী, সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী, সোনালি চুল, সবুজ অথবা রুপোলি চোখের মণি এবং 'মেসোসেফ্যালিক'

খুলির মানুষ। জার্মানিক শাখার নর্ডিক ভাষায় কথা বলে। নরওয়ে ও সুইডেনের গীতিময় ভাষার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য। সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা ব্যাপক। অধিকাংশ মানুষ লুথেরান গির্জার অন্তর্ভুক্ত। আর আছে বৃহৎ সংখ্যক রোমান ক্যাথলিক, এরা খুব রক্ষণশীল জাতি হিসেবে গণ্য হত, কিন্তু উনিশ শতকের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ভাঙনের পর থেকে পুরনো ঐতিহ্য ভাঙার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকী গ্রাম এলাকায়ও সেই ঢেউ পৌঁছে গিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ডেনমার্ক লুথেরান ও রোমান ক্যাথলিক ধর্মের আওতায় থেকেও পোশাক-আশাকে অতি আধুনিকতা ও উগ্রতার প্রকাশ ঘটাতে তাকে। ইউরোপে এমন কৌতুকরসবোধসম্পন্ন ও আনন্দ-উচ্ছল জাতি আর দ্বিতীয় নেই।

ডেনমার্কের উনিশ শতকীয় ইতিহাস, সেখানকার কৃষিজীবী ও নগরবাসী মানুষ, তাদের সহনশীলতা-দারিদ্র্য-সংগ্রাম-ভেঙে পড়া, বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থান মূর্ত হয়ে আছে অ্যান্ডারসেনের লেখায়। দুটোকে মিলিয়ে না পড়লে হানস্-এর মানসিকতাকে অনুভব করা যাবে না। গভীর দ্রষ্টা ও প্রকৃত শিল্পী ছিলেন এই যন্ত্রণাকাতর মানুষটি— ইনি এক ব্যতিক্রমী স্রষ্টা।

অনন্য সব সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এই সংগ্রামী মননশীল মানুষটি। কিন্তু আজকের বিশ্বে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি অসাধারণ হৃদয়গ্রাহী সব লোককথার স্রষ্টা। তাঁর লোককথা-সংগ্রহে যেগুলি ডেনমার্কের কৃষকদের মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সরাসরি গৃহীত হয়েছিল তার কয়েকটি উল্লেখ করছি। ইংরেজি নামগুলো দিলাম, কেননা এই নামগুলোই বেশি পরিচিত।

—দ্য স্নেল অ্যান্ড দ্য রোজ ট্রি। থামবেলিনা। দ্য স্টোরি অব এ মাদার। দ্য বিট্‌ল। দ্য লাভলিয়েস্ট রোড ইন দ্য ওয়ার্লড। দ্য পিগস্। এ লিফ ফ্রম দ্য স্কাই। দ্য নাইটিঙ্গেল। দ্য পোর্টারস্ সন।

লেভ তলস্তয়

অনেক কাল আগে রাশিয়ার ইয়াস্‌নায়া পলিয়ানায় একটা ভাবুক ছেলে ছিল। তার নাম নিকোলাস। অল্প বয়সে তার বাবা-মা মারা গিয়েছে, বড় একা একা কাটে দিন। বিশাল প্রাসাদ, অনেক লোকজন— তবু নিকোলাস একা। বয়স তার কম, কিন্তু সে জানে অসংখ্য গল্প। এগুলো সে শুনেছে বাড়ির কিষানদের কাছে। অসাধারণ তার স্মৃতিশক্তি, অনবদ্য তার গল্প বলার ভঙ্গি। একাকিত্বকে কাটাতে সে এক নতুন পথ বেছে নিল।

তার ছিল এক ছোট্ট ভাই। তাদের বাবা-মা যখন মারা যান, তখন এই ভাইয়ের বয়স মাত্র নয় বছর। নিকোলাস আর তার ছোট ভাই বুড়ি খুড়িমার আদরে থাকে, পড়াশুনা করে ফরাসি গৃহশিক্ষকের কাছে। অফুরন্ত সময়। এই অবসরের ফাঁকে নিকোলাস তার গল্পের ভাণ্ডার উজার করে দেয় ছোট ভাইয়ের কাছে। ডাগর চোখে সেই সব লোককাহিনি শোনে ছোট ভাই। এমনিতেই বড় কল্পণাপ্রবণ ছোট ভাই, তার বড় ভাইয়ের গল্পগুলো তাকে আরও বেশি আলোড়িত করে তোলে। রাজা-রানি-কোটাল-মন্ত্রী-পশু-পাখি পক্ষীরাজ-রাজকুমারী তাকে আর এক রাজ্যে নিয়ে যায়।

এই ছোট ছেলেটির নাম লেভ তলস্তয়। পুরো নাম লেভ নিকোলায়েভিচ তলস্তয়। শৈশবে ও কৈশোরে তার কল্পনার রসদ জুগিয়েছিল তারই বড় ভাই নিকোলাস। পরবর্তী জীবনে লোককথা সংগ্রহে ও সংকলনে তলস্তয়ের আগ্রহ, মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও তাদের কল্যাণের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা— সবই প্রত্যক্ষভাবে নিকোলাসের প্রভাবে ঘটেছে।

অবাক চোখে নিকোলাস ভাইকে বলত, এমন একদিন আসবে যেদিন সব মানুষ সুখী হবে, মানুষের কোনো রোগ থাকবে না, কোনো কষ্ট থাকবে না, কেউ কারও ওপর রাগ করবে না, সবাই সবাইকে ভালোবাসবে— মানুষ হবে 'পিঁপড়েদের' মতো। তাদের মধ্যে সবাই ভাই, হিংসে নেই, শত্রুতা নেই, আছে শুধু সহযোগিতা ও শ্রম। কেমন করে সেই সুদিন আসবে? তাও নিকোলাস গোপনভাবে জেনে ফেলেছে। সবকিছু সে লিখে রেখেছে একটা সবুজ কাঠিতে, পুঁতে রেখেছে কাছের গিরিখাতের শেষে একটা রাস্তার পাশে। নিকোলাস প্রায়ই ফান্‌ফারোনোভ পাহাড়ের কথা বলত, যেখানে রয়েছে অনন্ত সুখ ও প্রেম। ভাই যদি ঠিকমতো চলে তবে একদিন সেই পাহাড়ে তাকেও নিয়ে যাবে। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিকোলাস অনন্য সব স্বপ্নের কথা লোককথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে যেত। এই গভীর প্রভাবের পরিণতিও খুব স্পষ্ট। তলস্তয় আজীবন লোককথা লিখে গিয়েছেন, কখনও ক্লান্তিবোধ করেননি। নিকোলাসের আদর্শবোধও তাঁকে প্রভাবিত করেছে লোককথা রচনায় ও সংকলনে।

সত্তর বছর বয়সে তলস্তয় স্মরণ করেছেন শৈশবের কথা— "সেই সবুজ কাঠি যার ওপরে লেখা আছে সেই গুপ্ত কথা যার ফলে একদিন সমস্ত পাপ পরাভূত হবে, মানুষ বিশ্বপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হবে। আজও আমি বিশ্বাস করি এই সত্য, এই সার্বিক সত্য বিকশিত হবেই, মানুষের মধ্যে একদিন এ সত্য উদ্‌ঘাটিত হবেই, মানুষ একদিন ভ্রাতৃত্ববোধকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দেবে।"

নিকোলাসের সবুজ কাঠির প্রতি তলস্তয়ের এমনই দ্বিধাহীন বিশ্বাস ও আশা ছিল যে, তিনি ঘোষণা করেছিলেন— তাকে যেন সেইখানেই সমাধিস্থ করা হয় যেখানে সবুজ কাঠি পোঁতা রয়েছে বলে ধারণা করা হবে। তার মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা সেই কাল্পনিক স্থানেই তলস্তয়কে সমাধিস্থ

করেন। শৈশবের লোককথার প্রভাব গভীর ও ব্যাপ্ত হলেই জীবনে সেই আদর্শকে বহন করে চলা যায়।

যৌবনের কয়েকটি উন্মাদনাময় বছর ছাড়া তলস্তয়ের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য ছিল মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তি। এই আদর্শের দ্বারা তিনি এমনভাবে ভাবিত ছিলেন যে, নানা অবৈজ্ঞানিক চিন্তার শিকার হয়েছেন, তিনি ভাবতেন ধর্মের মধ্যে মানবমুক্তি ঘটবে, ভাববাদী কল্পনাপ্রবণ চিন্তা তাঁকে অবাস্তব বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তুলেছে। এ সবই সত্যি। কিন্তু মানবকল্যাণের চিন্তায় তলস্তয়ের কোনো অসাধুতা ছিল না, চিন্তা খাদহীন, অনাবিল ও আন্তরিক। বিশেষ করে ১৮৭৯ সালে তলস্তয়ের দর্শন নতুন মোড় নিল। আনা কারেনিনা (১৮৭৫-৭৭) শেষ হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করলেন বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অবক্ষয়, তাদের বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদকামী মনোভাব, বাস্তব সমস্যা সমাধানে তাদের অক্ষমতা এবং সর্বোপরি কৃষক সমাজের প্রতি তাদের নিষ্ঠুর অমানবিক পশুসুলভ আচরণ। তিনি সাহিত্য-সৃষ্টিতে সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। তিনি বুঝলেন, মানুষের সার্বিক কল্যাণ যাতে সাধিত হয় না সে সব বস্তু মূল্যহীন। সবচেয়ে মূল বস্তু হল— মানুষের ভালোবাসা। এমনকী তার মহৎ সাহিত্য সৃষ্টিকেও তিনি ধিক্কার জানালেন। তিনি ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখার বিরোধিতা করলেন, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লব ও বলপ্রয়োগের তীব্র সমালোচনা করলেন।

এই মানবকল্যাণ-বোধের একাগ্রতাই তাঁকে লোককথা লিখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। সমগ্র জীবন ধরেই তিনি লোককথা লিখেছেন, যদিও ১৮৭২ সাল থেকেই এর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধ ও শান্তি (১৮৬২-৬৯) শেষ হয়েছে, আনা কারেনিনা আরম্ভ হবে,— এই সময়েই তিনি বেশি বেশি করে লোককথার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কারণ উপদেশাত্মক গল্প যেহেতু মানবচরিত্র বিকাশে সহায়ক হয়, তাই তাঁর মানবিক আদর্শবোধ এদিকে নজর দিয়েছে বেশি।

তলস্তয়ের জীবনকে তিনটে মোটা দাগে সাধারণভাবে ভাগ করা যায়। প্রথম যৌবন যখন তিনি 'ছেলেবেলা' 'দ্য কসাকস্' 'টেলস্ অব সিবাস্তোপল,' লিখছেন। দ্বিতীয় পর্বে তাঁর অনন্য অন্তর্দৃষ্টি খুঁজে পাওয়া যায়, যখন তার সৃষ্টিতে রয়েছে গভীর জীবনবোধ, বাস্তব চেতনা, বুদ্ধিদীপ্ত

বিশ্লেষণ। এই সময়ে যুদ্ধ ও শান্তি, আনা কারেনিনা লেখা হয়। তৃতীয় পর্বে তিনি নৈতিক শিক্ষক। ধর্মীয় রূপান্তর ঘটেছে তাঁর চিন্তায়। কিন্তু সবুজ কাঠির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করলে সব বিভাজন ভেঙে পড়ে, এই চিন্তা তাঁর গোটা জীবনকে অবিচ্ছিন্নভাবে ধরে রেখেছে। এদিকে বিবর্তন ও অন্যদিকে পিঁপড়ের ভ্রাতৃত্বচিন্তার অবিচ্ছেদ্য ধারা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। এই একটি বিস্ময়ে মানুষটির যেন কোনো বিবর্তন হয়নি বললেই চলে। বরং বলা চলে, এই বোধ শেষজীবনে তাকে পেয়ে বসেছিল, নইলে ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে বিশ্বজনীন রূপ দিতে এত অফুরন্ত নীতিকথা, পশুকথা, রূপকথা লিখতেন না। তাঁর মিস্টিক চিন্তাধারাকে সাহিত্যিক অবয়বে রূপ দিতেই এসব লোককথার অবতারণা।

কল্যাণের চিন্তা থেকে কীভাবে এর উৎসার তার একটা উজ্জ্বল প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। ১৮৯২ সালে রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মানুষের দুর্ভোগ ও বুভুক্ষা সমস্ত সীমা ছাড়িয়েছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের সাহায্যের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দ্যেশ্যে একটি গ্রন্থ সংকলন করা হয়। গ্রন্থটির নাম 'ক্ষুধার্তদের জন্য সাহায্য।' এই গ্রন্থে তলস্তয় যে লেখাটি পাঠালেন তা একটি লোককথা—'এমেলিয়ান অ্যান্ড দ্য এম্‌প্টি ড্রাম।' উদ্দেশ্য দুটি, অর্থ সংগ্রহে সাহায্য ও জনগণকে নৈতিক শিক্ষা দান। তলস্তয়ের প্রবণতা এ থেকেই বোঝা যাবে। লোককথার যেসব সংগ্রহ তলস্তয় একের পর এক প্রকাশ করতে লাগলেন তার পেছনে উদ্দেশ্য কী ছিল? উনিশ শতকের রাশিয়ার কৃষকদের ও ভূমিদাসদের জীবন দুঃসহ। আইনে হয়তো কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কৃষকেরা পশুর জীবন যাপন করেন। তাদের দিকে তাকাবার কেউ নেই। তলস্তয় বুঝলেন, দান-ধ্যানে তাদের সমস্যার সমাধান হবে না, তাদের জাগতে হবে, অশিক্ষার অন্ধকারের জাল ছিন্ন করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠন করতে হবে। তাই কৃষকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যই এইসব লোককথার সংকলন তিনি প্রকাশ করতে লাগলেন।

নিকোলাসের প্রভাব তো অটুট ছিলই, আর একজনের প্রভাবও তাকে এই কাজে সাহায্য করল। প্রাচীন রাশিয়ার অনবদ্য অনেক লোককথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন মহান কথক এ.এন. আফানাসেভ। আফানাসেভ-এর সংকলিত কয়েকটি লোককথার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তলস্তয় অবিকল ওই আদর্শে কয়েকটি লোককথা লিখলেন।

আর একটি ঘটনার কথা বলতে হয়। ইহুদি-বিদ্বেষ তখন রাশিয়ায় বীভৎস আকার নিয়েছে। তারই ঘৃণ্যতম প্রকাশ ঘটল ১৯০৩ সালে কিশিনেভে। শান্তিপ্রিয় ইহুদিদের বিরুদ্ধে নৃশংস আক্রমণ চালানো হল। অনেক ইহুদি নারী-পুরুষ-শিশু দাঙ্গার শিকার হলেন। তলস্তয় বিবেকের উজ্জ্বল তাড়নায় জারকে এক খোলা চিঠিতে জানালেন, এই নোংরা সাম্প্রদায়িকতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী জারের প্রশাসন।

এই সময় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি সংকলন বের করা হল। শোলোম আলেইখেম তলস্তয়কে তিনটি গল্প পাঠাতে বললেন। তলস্তয় তিনটি গল্প পাঠালেন, দুটিই লোককথা। 'তিনটি প্রশ্ন' এবং 'ইশারহাদ্দোন, আসিরিয়ার সম্রাট'। প্রথমে গল্প দুটি ইদ্দিস ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে লোককথা দেওয়ার উদ্দেশ্যও সেই একই আদর্শজাত।

এইসব লোককথার মূল বিষয় সম্পর্কে তলস্তয় ব্যক্ত করেছেন তাঁর শৈশবের স্বপ্ন ও পরিণত বয়সের আদর্শকে। তলস্তয়ের লোককথার অধিকাংশ নায়ক বীর, এই বীরত্ব কিন্তু শৌর্য ও সাহসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই বীরদের প্রধান মানবিক গুণ হল নম্রতা, ধীরতা ও করুণা। জীবনের পথে তাদের সামনে যত বিপদই আসুক না কেন, এইসব গুণের জন্য তারা সেসব বাধাকে অতিক্রম করেত সমর্থ হবে, এবং শেষপর্যন্ত পুরস্কৃত হবে। এই পুরস্কার-প্রাপ্তি শুধুমাত্র অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকুমারী লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনে বীর নায়ক নির্মল শান্তির পুরস্কারও পেতে পারে, আর সেটাই তলস্তয়ের ভাবনায় সবচেয়ে বড় পাওয়া। কেন নায়ক এ পুরস্কার পেল? কেননা, সে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, সে দয়ালু ও সুজন। সৌজন্য কারুণ্য না থকলে তলস্তয়ের কোনো নায়ক চরম কিছু পাওয়ার অধিকারী নয় আর নায়ক যা পাবে তা শুধু তার ব্যক্তিগত পাওয়া নয়, মানুষের জন্যও তা বিস্তৃত হতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ ও দায়িত্বসচেতনতার গভীর ও ব্যাপক আদর্শ ছাড়া তাঁর লোককথার সমাপ্তি ঘটে না। তাই শুধুমাত্র আনন্দ দেবার জন্য তলস্তয়ের লোককথা নয় কিংবা সেইসব লোককথাই তিনি সংগ্রহ করে প্রচার করেছেন যার মধ্যে মানবিক আদর্শের উপদেশ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত গল্পকে 'বিকৃত' করতেও দ্বিধা করেননি। এখানে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোককথা কথকের একটা উদ্ধৃতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক

বলে মনে হয়। হানস্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসেন বলেছিলেন,There are no better tales than those which are born of life itself. তলস্তয়ের লোককথায় জীবনের এই সত্যটিকে সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হতে দেখি। জীবনের গভীর থেকে যার উৎসার ঘটেনি তার কোনো মূল্য তলস্তয় স্বীকার করেননি, বিশেষ করে লোককথার ক্ষেত্রে।

জীবনকে অনুসন্ধান করার ঐকান্তিক প্রয়াসের মধ্যেই শিল্পীর শিল্পের অপরাজেয়তা ধ্বনিত হয়। মানুষের দুরবস্থা, তার জীবনের অসঙ্গতি, বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করেন মহৎ শিল্পী, জীবন ও সমকালীন সমাজকে রূপায়িত করে তাকে চিরকালীন সত্যে উত্তরণ ঘটান। তলস্তয়ের আবেগপ্রবণ ও বুদ্ধিবৃত্তিজাত অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত তাঁকে পর্যুদস্ত করে রেখেছে। কথাসাহিত্যে এই দ্বন্দ্ব রয়ে গিয়েছে অমীমাংসিত, কিংবা বলা যায় এ মীমাংসার সমাধানও বোধহয় সম্ভব নয়।

কিন্তু লোককথার জগতে তলস্তয়কে আমরা অন্য রূপে দেখি। লোককথায় তলস্তয় কখনও বিষাদমগ্ন হননি, মৃত্যু তাকে বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ করে তোলে নি, শিল্পভাবনা তাঁকে ক্লান্ত করেনি। অপরূপ শব্দচয়নের আগ্রহ দিনে দিনে বেড়েছে, কেননা এই মহৎ পরিশীলিত শিল্পী উপলব্ধি করেছেন শব্দের জাদুকে, তার অন্তর্নিহিত অর্থকে আর তাই সেগুলোকে ব্যবহার করেছেন অনুপ্রাণিত মিতব্যয়িতার সঙ্গে। লোককথায় তার ভাষা যেমন সহজ তেমনি ব্যঞ্জনাময় যা সহজেই মনকে লোককথার কল্পনাময় জগতে পাঠককে বয়ে নিয়ে যায়। তলস্তয়ের এই প্রশংসনীয় ভঙ্গি আয়ত্তে আনা কিন্তু বড় সহজে হয়নি। বিবেকবান যুক্তিবাদী তলস্তয় এসব গল্প লিখবার সময় নিজেকে শিশুর ভাবনায় নামিয়ে আনতেন, শিশুর চিন্তায় যখন তিনি এগুলিকে ব্যক্ত করতে সমর্থ হতেন তখনই তার আত্মসন্তুষ্টি ঘটত। কত বড় শিল্পী ছিলেন তলস্তয়, যার ফলে এই মানসিকতার বিবর্তন ঘটাতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তলস্তয়ের উপন্যাসে দেখি মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি, সমুদ্র-জলোচ্ছ্বাসের গম্ভীরতা, রাজসিক গাম্ভীর্য, সে ভাষায় ও বিষয়বস্তুতে রয়েছে শক্তিশালী অনন্য উজ্জ্বলতা ও কঠোর বাস্তববোধ। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে সেই তলস্তয়ের লোককথার বিষয় ও ভাষায় কত সহজ ও স্বাভাবিক উত্তরণ। এই দুই তলস্তয়কে একই দেহধারী বলে ভাবা যেমন শক্ত, তেমনি কোনোটিকে উপেক্ষা করাও মূঢ়তা। আজও পর্যন্ত বোধহয় তলস্তয়ের দ্বিতীয় সত্তার মূল্যায়ন হয়নি।

শিশুর যে শিক্ষায় ছন্দ, আনন্দ, সত্য, সুন্দর ও শুভ নেই সে শিক্ষায় তলস্তয়ের কোনো আস্থা ছিল না। তলস্তয় যে বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন সেখানে এইসব আদর্শের প্রকাশ ঘটাতে তৎপর ছিলেন। সেই বিদ্যালয়ে তিনি শুধুমাত্র শিক্ষক ছিলেন না, ছিলেন একজন ছাত্র। কথায় ও জীবনাচরণে এমন সততার জন্যই তার চিন্তায় স্বচ্ছতা এসেছিল, কথা ও কাজকে তিনি মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর পরীক্ষার সফল ফসল হল লোককথাগুলি। এ সম্পর্কে রেমন্ড রোজেনথাল খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, There was one lasting acquisition from all his educational feror and enthusiasm— a reading primer which Tolstoy labored over long and finally published in 1872 , a few years after he had written War and Peace. Among such books this primer is perhaps unique, for it is the outcome of the collaboration of a refined genius of language with the raw genius of the folk, as represented by the young peasant boys in Tolstoy's school. এইসব লোককথা লিখবার পরে সেগুলোকে সংশোধন করার এক অনবদ্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতেন তলস্তয়। যেসব কৃষকের মধ্যে তিনি একাত্ম হয়ে বাস করতেন, তাদের পড়ে শোনাতেন এই গল্পগুলো। তারা যে প্রস্তাব দিত সেইভাবে তিনি সেগুলোর সংস্কার ঘটাতেন। বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি লৌকিক ভাবনায় সংশোধিত ও জারিত হয়ে সত্যিকার লোকসমাজের লোককথা হয়ে উঠত। শিল্পীর ব্যক্তিগত সকল দম্ভ ও আত্মম্ভরিতা এক্ষেত্রে বিসর্জন দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তলস্তয়। সৃষ্টির প্রতি শিল্পীর যে স্বাভাবিক দরদ থাকে, তাকেও নির্মমভাবে সংকুচিত করতে সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হননি তলস্তয়। লোককথাগুলিকে লোকসমাজের মানসিকতার প্রতিবিম্ব করে তুলতে তাঁর সততার আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়।

'বোকা ইভান' গল্পটি তিনি অত্যধিক পরিশ্রম করে লিখলেন। ১৯০৬ সাল, তখন তাঁর বয়স আটাত্তর। তিনি একদল কৃষকের কাছে গল্পটি বললেন। তারপরে তিনি তাদের মধ্যে একজনকে সেই গল্পটি বলতে বললেন। অনুরোধ করলেন, কৃষকটি যেন নিজের প্রাণের ভাষায় গল্পটি বলেন। কৃষকটি ছিলেন কথাবার্তায় সপ্রতিভ, শব্দের জাদু ছিল তার

বলার ভঙ্গিতে। কৃষকটি যখন গল্পটি বললেন, আসল গল্পের বহু জায়গা তখন পরিবর্তিত রূপ নিয়েছে। কৃষক বলেছেন তার প্রাণের ভাষায় নিজেদের মানসিকতার রসে সিক্ত করে। তলস্তয় উদ্‌বুদ্ধ হলেন এই পরিবর্তনে, তাড়াতাড়ি লিখে নিলেন কৃষকের পরিবর্তিত বিষয়বস্তুটিকে। তারপরে কৃষকটির সেই পরিবর্তিত 'নতুন' গল্পকে লিখে প্রকাশ করলেন। তার সহচর শিষ্যদের বললেন, এই পদ্ধতিই তিনি অনুসরণ করেন। কেননা, 'এটাই হল সাধারণ মানুষের জন্য গল্প লেখার একমাত্র পথ।' বার্ধক্যে মানুষের গ্রহণ করার শক্তি কমে আসে, আর শিল্পীরা তো গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্ভেদ্য প্রস্তরখণ্ডের মতো। কিন্তু মৃত্যুর সীমায় দাঁড়িয়েও পরিণত বার্ধক্যে তলস্তয়ের কি সীমাহীন সততা ও নমনীয়তা। আর গ্রহণ করছেন কাদের কাছে? যাদের সঙ্গে কোনোভাবেই তার বুদ্ধিগত, সামাজিক, আর্থিক ও চিন্তাগত মিল নেই। যদিও এদের মধ্যেই শেষজীবনে তিনি শান্তির নীড়ের সন্ধান পেয়েছিলেন।

সাধারণ মানুষের জন্য গল্প লেখার অপরাধে বহু কীর্তিমান সমালোচক তলস্তয়কে নানাভাবে আক্রমণ করেছেন। নীতিকথার বাণী যত যুক্তিগ্রাহ্যই হোক না কেন, মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি তার মাধ্যমে সম্ভব নয় বলে তারা অভিযোগ করেছেন। যে তলস্তয় এতগুলো মহৎ উপন্যাসের স্রষ্টা, তার বলিষ্ঠ চিন্তা থেকে কেন যে এসব নীতিকথার গল্প সৃষ্টি হল তাদের কাছে শুধু বিস্ময়ের নয়, বিরক্তিকরও বটে। জীবনের পূর্ণতা ও বৈচিত্র্য যে সাহিত্যিকের সাহিত্যকে কালজয়ী করেছে, তার এইসব 'ছেলেমানুষি'তে তারা মর্মাহত হয়েছেন। তারা বলেন, এইসব রচনায় তলস্তয়ের প্রতিভা অকারণ ব্যয়িত হয়েছে, আদর্শের কানাগলিতে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছে, মূল্যবোধের সহজ আকর্ষণে শুকিয়ে গিয়েছে বহতা বেগবতী পাহাড়ি নদী। চতুর্দশ শতকে ইতালির গিয়োভানি বোক্কাচিও 'ভালগার পিপল'-এর জন্য 'ডেকমেরন' লিখবার 'অপরাধে' সমালোচকদের কাছে ধিকৃত হয়েছিলেন। তাদের প্রখর বিরোধিতায় বোক্কাচিও এপথ ত্যাগ করতেও বাধ্য হন। ইতিহাসে 'ডেকামেরন' অমর হয়ে রয়েছে,— 'উন্নত মানুষের' জন্য বোক্কাচিওর 'চিরায়ত লেখা' আজ বিস্মৃতির অতলে। তাই তলস্তয়ের মহৎ উপন্যাসের পাশে এদের কী স্থান তাও ইতিহাস বিচার করবে। এক্ষেত্রে তলস্তয়ের এইসব লোককথা সম্পর্কে জি. কে. চেস্টারটনের উক্তি খুব

মূল্যবান বলে মনে করি। তিনি বলেছেন, The real distinction between the ethics of high art and the ethics of manufactured and didactic art lies in the simple fact that the bad fable has a moral, while the good fable is a moral. And the real moral of Tolstoy comes out constantly..., the great moral which lies at the heart of all his work, of which he is probably unconscious. It is the curious cold white light of morning that shines over all tales, the folklore simplicity with which 'a man and a woman' are spoken of without further clarification, the love— one might almost say the lust–for the qualities of brute materials, the hardness of wood, and the softness of mind, the ingrained belief in a certain kind of ancient kindliness sitting beside the very cradle of the race of man.

এখন বিচার করতে হবে, তলস্তয়ের এই লোককথাগুলি কতটা লৌকিক ও কতটা ব্যক্তিসৃষ্টি।

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি হল লোকসমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। একক ব্যক্তি এর প্রথম স্রষ্টা হলেও সমগ্র সমাজ যখন সেটাকে গ্রহণ করে মৌখিক ঐতিহ্যর মধ্যে লালন করেন, তখনই তা লোকসাহিত্য হয়ে ওঠে। ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে বিলীন হয়ে যান। তাই এগুলো সংহত সমাজের নিজস্ব বস্তু। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তলস্তয়ের কতকগুলো গল্প সরাসরি যেমন লোকসমাজ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বলে দেখা যাবে, তেমনি কতকগুলো গল্প তিনি তার প্রতিভা-বলে ঠিক লৌকিক আকার দিতে সমর্থ হয়েছেন। এগুলি যত অপূর্বই হোক, কৃষকদের চিন্তার স্পর্শ বয়ে যতই নতুনভাবে লেখা হোক না কেন, এগুলো তলস্তয়ের নিজস্ব সৃষ্টি, কোনোভাবেই লৌকিক সম্মান পেতে পারে না। কিন্তু সুখের বিষয় লৌকিক ভাণ্ডার থেকেও অনেক লোককথা তিনি অবিকৃতভাবে সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। রাশিয়ার গ্রামীণ কৃষকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার ফলেই তিনি এগুলির সন্ধান পান, আর কীভাবে সেগুলো অবিকৃত রাখতে হয় তার শিক্ষা তো নিকোলাসের কাছে আগেই পেয়েছেন। এই লৌকিক লোককথাগুলো সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

১. রাজা ও গায়ের জামা

রাজা ভীষণ অসস্থ, তার অসুস্থতা কেটে যাবে যদি তিনি এমন লোকের জামা পরেন, যে মানুষ সত্যিকার সুখী। পারিষদরা একজন মাত্র সুখী লোকের সন্ধান পেলেন যার কোনো জামাই নেই।

২. একটা ইঁদুর যে ভাঁড়ারে থাকত

ভাঁড়ারে ছোট্ট গর্ত করে ইঁদুর থাকত। বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানাবার জন্য সে গর্তটাকে অনেক বড় করল। বাইরে গেল বন্ধুদের আনতে। ফিরে এসে দেখে গর্ত নেই। কৃষক বড় গর্ত চোখে পড়ায় সেটা একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে।

৩. নেকড়ে ও বুড়ি

নেকড়ে ক্ষুধার্ত হয়ে গেরস্থের বাড়িতে এসে চুপটি করে রইল। শুনল, বাছা তুমি যদি কান্না না থামাও তাহলে আমি তোমাকে নেকড়ের মুখে দেব। নেকড়ে খুশি। পরে শুনল, বাছা, আমি কী তাই পারি। নেকড়ে এলে তাকে মেরেই ফেলব। নেকড়ে যেতে যেতে বলল, এখানকার লোক বলে এক, আর করে অন্য।

৪. হাঁস ও চাঁদ

জলের নীচে চাঁদ দেখে তাকে খাবার জন্য হাঁস ডুব দিল। সবাই তাকে দেখে হাসল। সেদিন থেকে খুব লজ্জা পেল হাঁস, জলের নীচে মাছ দেখলেও সে ডুব দিত না। এমনি করে না খেয়ে একদিন হাঁস মরে গেল।

৫. মা কাক ও তার তিন বাচ্চা

মা কাক তিন বাচ্চাকে একে একে অতি কষ্টে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে লাগল। তার মনে হল, সে যে কষ্ট করছে, বুড়ি বয়সে তার বাচ্চারা তাকে দেখবে তো? প্রথম দুজন মায়ের মন রাখতে ভয়ে মিথ্যে কথা বলল। মা তাদের জলে ফেলে দিল। ছোট বাচ্চা বলল, তা কী করে হবে? তখন তো আমারও বউ-বাচ্চা হবে,তাদেরই দেখব। যেমন তুমি এখন আমাদেরই শুধু দেখছ। সত্যি কথা বলাতে সে বেঁচে গেল।

৬. মাছি ও সিংহ

সিংহের সঙ্গে লড়াইতে মাছি এত তৎপর হয়ে উঠল যে সিংহ নিজের থাবাতেই নিজে আহত হল। সিংহ হার স্বীকার করল। পরে মাকড়সার

জালে আটকে মাছি বলল, হায়! পশুশ্রেষ্ঠ সিংহকে যুদ্ধে হারিয়ে শেষে কিনা এই অতি তুচ্ছ মাকড়সার জালে শেষ হলাম?

৭. জালে আটকানো পাখিরা

শিকারির জালে অনেক পাখি ধরা পড়ল। তারা একসঙ্গে জাল নিয়ে উড়ে চলল। একটা পাখি ধরা পড়লে শিকারি পেছনে ছুটত না, কিন্তু একসঙ্গে রয়েছে সবাই। সন্ধ্যার সময় যে যার বাসার দিকে উড়ে যেতে ঝাপটা-ঝাপটি করতে লাগল। টানাটানিতে জাল নীচে পড়ে গেল। শিকারি ধরল সব পাখিকে।

৮. শজারু ও খরগোশ

শজারু ধীর হওয়া সত্ত্বেও দ্রুতগতি খরগোশকে হারাল। পথে অনেক শজারু লুকিয়ে রইল, যখনই খরগোশ এগোয়, দেখে তার সামনে শজারু। সব শজারু একই রকম যে দেখতে। খরগোশ শেষপর্যন্ত দৌড় ছেড়ে দিল।

এই গল্পগুলি সবই লোকসমাজের নির্ভেজাল লোককথা। কৃষকদের মুখে শুনে তলস্তয় অবিকল এগুলো লিখে নিয়েছেন আর অসংখ্য এইসব লোককথা শুনে ও সংগ্রহ করে তার সহজাত ক্ষমতার সঙ্গে প্রতিভার মিশ্রণ ঘটিয়ে এইসব লোককথার আদলে তিনি আরও অনেক লোককথা নিজে সৃষ্টি করলেন। সহজ প্রকাশগুণে ও প্রসাদগুণে সেগুলো অনবদ্য নিঃসন্দেহে, তবে সেগুলোর মধ্যে ব্যাপক লোকসমাজের স্বীকৃতি অবশ্যই নেই। কিন্তু নাগরিক পাঠক এ দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্য বড় সহজে ধরতে পারবেন না। এইখানেই তলস্তয়ের কৃতিত্ব ও স্বীকরণের প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে।

লোককথা সংগ্রহে ও সৃষ্টিতে তলস্তয় সব সময় ছিলেন কৃষকদের ছাত্র। তাদের মনের গোপন সব কিছু ছিল তার একান্ত পরিচিত। তাদের জীবনকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, তাদের মধ্যে একাত্ম হবার কঠোর সাধনা করেছিলেন। তাই লোকসমাজের নিজস্ব সৃষ্টিকে তিনি চিরায়ত রূপ দিলেন। মৌখিক সাহিত্য অমর হয়ে রইল, তিনিও লোককথার মধ্যে চিরজীবী হয়ে রইলেন।

লোককথার সংগ্রহভাণ্ডার

ইউরোপীয় সমুদ্র-অভিযাত্রীদল যোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে নতুন নতুন দেশ 'আবিষ্কার' করতে লাগলেন। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে ম্যাজেলান এলেন মাইক্রোনেশিয়ার মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের গুয়াম দ্বীপে। এর পরবর্তী আরও তিনশো বছর চলল লুণ্ঠন-হত্যা-সম্পদ আহরণের কুৎসিত বীভৎস অভিযান। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই উপনিবেশবাদীরা 'স্থায়ী' উপনিবেশ গড়ে তুলল। এদের পথ বেয়ে কিছু মহৎ নৃবিজ্ঞানী-ধর্মযাজক-প্রশাসক এলেন উপনিবেশে। তাদের মানবিক অক্লান্ত পরিশ্রমে পৃথিবীর লোককথা সংগ্রহের ভাণ্ডার স্ফীত হতে লাগল।

অন্যদিকে ইউরোপের উত্তরে ছোট্ট একটি দেশ ফিনল্যান্ড নিজের দেশের লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ করতে শুরু করলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং সেইসব সংগ্রহ প্রকাশিত হতে লাগল১৮০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে' ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে বিপুল লোকসংস্কৃতি-সংগ্রহ ফিনল্যান্ডে প্রকাশিত হল তা অন্যান্য দেশকে এ বিষয়ে উদ্দীপিত করল। ১৮৩১ সালেই প্রতিষ্ঠিত হল 'ফিনিশ লিটারারি সোসাইটি।' উপনিবেশবাদী ইংল্যান্ড স্পেন ডেনমার্ক হল্যান্ড নরওয়ে ফ্রান্স দেশসমূহ নিজেদের দেশ ও নিজেদের উপনিবেশের লোকসংস্কৃতি প্রকাশ করতে শুরু করলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সারা বিশ্বের এক বিপুল লোককথা সংগ্রহ আমাদের হাতে এল। তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফলে একের পর এক উপনিবেশ স্বাধীন হতে শুরু করল। নতুন জাতীয় সরকার

ও নবজাগ্রত দেশপ্রেমিক মানুষ আরও ব্যাপকভাবে লৌকিক সংস্কৃতির অনন্য সম্পদকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে চললেন। আধুনিক পৃথিবীর এই লোককথা সংগ্রহের ইতিহাস আমাদের জানা।

কিন্তু লোককথা সংগ্রহের মানসিকতা যখন অবহেলিত ছিল কিংবা মুদ্রণযন্ত্রের সহয়তা-লাভ যখন সম্ভব ছিল না, তখনও লোকসমাজের এই মহান ঐতিহ্যের অসংখ্য নমুনা লিপিবদ্ধ রয়েছে মানুষের সৃষ্ট সাহিত্য শিল্প নীতিশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র ও অনুশাসনে। মধ্যযুগের আগে পর্যন্ত উচ্চতর সাহিত্যের স্রষ্টাদের সঙ্গে গ্রামীণ লোকসমাজের সাংস্কৃতিক বন্ধন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। সচেতনভাবে যদি নাও হয়, তবু এই গ্রামীণ ঐতিহ্যের কথা তাদের সৃষ্টির মধ্যে অবশ্যই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। সেই ঐতিহ্যকে আবিষ্কার করার মাধ্যমেই আমরা লোকঐতিহ্যের ধারাবাহিক সূত্রটি অনুধাবন করতে পারব। লৌকিক উপাদান তো অসংখ্য রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে লোককথার পূর্ণ, আংশিক কিংবা সম্পাদিত ও বিকৃত রূপ।

রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়াড-ওডিসি-গিলগামেশ প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যের উৎস লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত লোককথা— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যান্য যেসব গল্পকাহিনির গ্রন্থ রয়েছে সেখানেও পাওয়া যাচ্ছে লোকসমাজের লোককথা। লোককথার প্রাণের স্বরূপটি জেনে, তার টাইপ ও মোটিফ বিশ্লেষণ করে এবং বিশ্বের লোককথা ভাণ্ডারের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে আমরা উপলব্ধি করতে পারব— লিখিত সম্পাদিত সংকলিত গ্রন্থ কিংবা মহাকাব্যে কোন কোন লোককথা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, কোন কোন লোককথা লোকজীবন থেকে সংগ্রহ করা, আর তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ধরা পড়বে লিখিত রূপ দেবার সময় তাতে কী কী পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। কাজটি সহজ না হলেও অসম্ভব নয়। বিশেষ করে, লোককথা বিশ্লেষেণের যখন নানা বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি যদি লোকঐতিহ্যের সম্পদ না হত তবে প্রাচীন সভ্যতার লিখিত পুথিতে একই ধরনের লোককথার এই বিশ্বব্যাপী অনুপ্রবেশ ঘটত না। লোককথার সম্পদ মানুষের বিশ্বজনীন সীমাহীন মানবিক উত্তরাধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত করে। বিশ্বের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মানবিক মানসিক সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে লোককথা।

পরিশিষ্ট

টাইপ ইনডেক্‌স

এই পদ্ধতিটি প্রথম প্রচলিত হয় ফিনল্যান্ডে। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফিনিশ লিটারারি সোসাইটি'। এই সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ অধ্যাপক। উচ্চতর সাহিত্যের গবেষণার পাশাপাশি এঁরা লোকসংস্কৃতির চর্চায় ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে এঁরা দেশের মানুষের কাছে আবেদন জানালেন, তাঁরা যেন সাধ্য অনুযায়ী লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দেন। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগ্রহ বিষয়ে শিক্ষিত করে বৃত্তি দিয়ে দেশের নানা প্রান্তে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরাও বিপুল উপাদান সংগ্রহ করলেন।

আর এইসব সংগ্রহকে বিশ্লেষণ করবার তাগিদেই নানা পদ্ধতির জন্ম হয়। এমনই একটি সমৃদ্ধ পদ্ধতি হল টাইপ ইনডেক্‌স।

এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা এন্টি আর্নে। তাঁর জন্ম ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। এই শ্রেণিবিন্যাস করবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক লোকসংস্কৃতির অধ্যাপক কার্লে ক্রোন। অন্যান্য অনেকের সহযোগিতায় টাইপ ইনডেক্‌স তালিকা তৈরি করলেন এন্টি আর্নে।

তালিকা তৈরির সময়েই এন্টি আর্নে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর তালিকা কখনই সম্পূর্ণ নয়। ১৯২৬ সালে তালিকার সম্পূর্ণতা দানের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমেরিকার লোকসংস্কৃতিবিদ স্টিথ টমসনের ওপরে।

দুবছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হল 'দ্য টাইপস অব দ্য ফোকটেল'। আর্নে-টমসন যুগ্ম নামে অমর হয়ে রয়েছে এই গ্রন্থ।

আর্নে-টমসন-এর বিজ্ঞাননির্ভর এই টাইপ ইনডেক্‌স পদ্ধতি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই গোটা বিশ্বে লোককথার শ্রেণিবিন্যাসে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।

টাইপ ইনডেক্‌সের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale, but the fact that it may appear alone attests its independence. It may consist of only one motif or of many.

লোককথার মেজাজ ও চরিত্র বিচার করলে দেখা যাবে যে, এক-একটি লোককথা এক-একটি টাইপ বা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। একটি নির্দিষ্ট টাইপ

বেছে নিয়ে আমরা জানতে পারব বিশ্বের আর কোথায় কোথায় এই লোককথাটি প্রচলিত রয়েছে, এর সম্ভাব্য উৎসস্থান কিংবা উৎসস্থানগুলি আবিষ্কার করা সম্ভব।

এন্টি আর্নে-স্টিথ টমসন টাইপ ইনডেক্স এইভাবে সাজিয়েছেন:

১. পশুকথা

১-৯৯ বন্য বশু
১০০-১৪৯ বন্য পশু ও গৃহপালিত পশু
১৫০-১৯৯ মানুষ ও বন্য পশু
২০০-২১৯ গৃহপালিত পশু
২২০-২৪৯ পাখি
২৫০-২৭৪ মাছ
২৭৫-২৯৯ অন্যান্য জন্তু

২. সাধারণ লোককথা

৩০০-৩৯৯ অলৌকিক বাধা
৪০০-৪৫৯ অলৌকিক বা মোহময়-মোহময়ী স্বামী-স্ত্রী
৪৬০-৪৯৯ অসাধ্য-সাধন
৫০০-৫৫৯ অলৌকিক সাহায্যকারী ও সাহায্যকারিণী
৫৬০-৬৪৯ জাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু
৬৫০-৬৯৯ অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান
৭০০-৭৪৯ অন্যান্য অলৌকিক কাহিনি
৭৫০-৮৪৯ ধর্মীয় ও নীতিমূলক কাহিনি
৮৫০-৯৯৯ রোমান্টিক কাহিনি
১০০০-১১৯৯ বোকা রাক্ষসের কাহিনি

৩. হাসি ও পারিবারিক কাহিনি

১২০০-১৩৪৯ বোকার কাহিনি
১৩৫০-১৪৩৯ স্বামী-স্ত্রী
১৪৪০-১৫২৪ একজন নারীর কাহিনি
১৫২৫-১৮৭৪ একজন পুরুষের কাহিনি

১৮৭৫-১৯৯৯ মিথ্যেবাদীর কাহিনি

২০০০-২৩৯৯ সূত্রমূলক কাহিনি

২৪০০-২৪৯৯ অশ্রেণিভুক্ত কাহিনি

এই তালিকাকে ক খ গ ঘ ঙ প্রভৃতির সাহায্যে সম্প্রসারিতও করা যায়। বর্তমান গ্রন্থে অনেক লোককথা রয়েছে, কোনোটি সম্পূর্ণ আবার কোনোটি আংশিক। তাদের কিছু সংখ্যকের টাইপ ইনডেক্স দেওয়া হল। এসব কাহিনির মধ্যে কীভাবে লৌকিক উপাদান রয়েছে পাঠক তা জানতে পারবেন।

১	শেয়ালের দ্বৈত চরিত্র
৫গ	ডাঙায় উঠে দে চম্পট
৯গ	ফসলের ভাগাভাগিতে শেয়াল পেল রসালো অংশ আর কুমির পেল শুকনো অংশ
১৫	বেড়াল ও ইঁদুরের বন্ধুত্ব
১৫গ	শেয়াল পিঠে চুরি করে
৩৪গ	কুকুর প্রতিবিম্ব দেখে মুখের মাংসের টুকরো হারায়
৫১	সিংহভাগ
৫৬গ	শেয়ালপণ্ডিত
৫৯	আঙুর ফল টক
৭৫	দুর্বল প্রাণীর সাহায্য
৭৭ক	ঝরনার ধারে হরিণ শিং-এর প্রশংসা করে
৯২	নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সিংহ লাফিয়ে পড়ে
১০৩	বন্য পশু অপরিচিত পশুকে দেখে ভয়ে পালায়
১০৫	বেড়ালের একমাত্র কৌশল
১০৫গ	শেয়াল ও কুকুর
১১৩খ	ভণ্ড শেয়াল
১৩০	নির্বাসিত পশু
১৫০	শেয়ালের উপদেশ
২৭৫গ	খরগোশ ও শজারুর দৌড়
৩০৩	দুই একাত্মা ভাই
৩০৩ক	সহোদর
৩০৪	শিকারি

৩৩৩	মৃত রাজপুত্র জীবন ফিরে পায়
৪০২	পশু-বউ
৪০৩ক	ইচ্ছার সফল পরিণতি
৪১০	ঘুমন্ত রূপবতী
৪৩০	গাধা
৪৬০খ	ভাগ্যের অন্বেষণে যাত্রা
৪৭০	প্রাণের বন্ধু
৫০২	বুনো মানুষ
৫০২গ	যাযাবর মানুষ
৫১৬	বিশ্বাসী বন্ধু
৫৫৪ক	মহৎ পাখি
৫৬৩	জাদু-উপহার
৫৯০ঘ	রাজকন্যা ও ডাকাতদল
৬৫৫	বুদ্ধিমান দুই ভাই
৬৭০	পশুর ভাষা
৭২৫	স্বপ্ন
৭২৫ঘ	দুঃস্বপ্ন
৭৩৬	ভাগ্য ও সম্পদ
৭৫০ক	ইচ্ছাপূরণ
৮৪০	মানুষের পাপের শাস্তি
৮৮৮	পতিব্রতা স্ত্রী
৯৩০	ভবিষ্যৎ-বাণী
১৩৮০	স্বৈরিণী
১৫২৭	ডাকাতরা প্রতারিত হয়
১৫৩৯	চাতুর্য ও প্রতারণা
১৬৮৮	অশুভ প্রেমপ্রার্থনা
১৭৪১	প্রতারক বউ
২২০০	সূত্রাকার কাহিনি
২২৫০	অসমাপ্ত কাহিনি
২৩০০	যে কাহিনির শেষ নেই

মোটিফ ইনডেক্স

টাইপ ইনডেক্স পদ্ধতি আলোচনার সময়েই এন্টি আর্নে মোটিফের বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন। মোটিফের গুরুত্বের কথাও বলেন।

পরবর্তীকালে মোটিফ ইনডেক্সের কাজ বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। স্টিথ টমসন ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে মোটিফ ইনডেক্সের তালিকা প্রকাশ করতে থাকেন দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে। হেলসিংকির এফ এফ কমিউনিকেশন ও ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডিস থেকে।

অবশেষে স্টিথ টমসন ১৯৫৫-৫৮ সালের মধ্যে প্রকাশ করলেন সম্পূর্ণ তালিকা। ছয় খণ্ডের এই 'মোটিফ ইনডেক্স অব ফোক লিটারেচার' প্রকাশিত হয় ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে। লোকসংস্কৃতি-চর্চার পদ্ধতি বিশ্লেষণের সবচেয়ে পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা।

মোটিফ ইনডেক্সের সংজ্ঞায় টমসন বলেছেন— A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it.

পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীতে লক্ষ লক্ষ লোককথা ছড়িয়ে রয়েছে। এদের অধিকাংশের উৎপত্তি মৌখিক ঐতিহ্য থেকে। প্রত্যেকটি লোককথার এক বা একাধিক মূল বিষয় আছে। এই মূল বিষয়কে বলে মোটিফ। শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে গৃহীত। একটি লোককথাকে ভেঙে কাহিনি-ব্যবচ্ছেদ করলে তার এক বা একাধিক কাহিনি-অংশ পাওয়া যাবেই, সেই কাহিনি-অংশ বা কাহিনি-অংশসমূহকে মোটিফ বলা হয়। একটি লোককথার খণ্ড খণ্ড কাহিনি-অংশ সমগ্র কাহিনিকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে।

মোটিফ ইনডেক্সকে টমসন ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ২৩টি বর্গে ভাগ করেছেন। ২৬টি বর্ণমালার মধ্যে তিনটি বাদ দিয়েছেন, ও, আই এবং ওয়াই। এমনভাবে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, মানবজীবন ও সমাজ-পরিবেশকে কেন্দ্র করে তার বাইরে আর কোনো বিষয় হতে পারে না। টাইপ ইনডেক্সে যেমন ক খ গ ঘ ঙ দিয়ে সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা রয়েছে, মোটিফ ইনডেক্সেও দশমিক চিহ্ন দিয়ে সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে অনেক লোককথা কিংবা লোককথার অংশ দেওয়া হয়েছে। সেসব লোককথার মধ্যে যেসব মোটিফ রয়েছে তার আংশিক তালিকা দেওয়া হল। পাঠক মোটিফগুলির মাধ্যমে লৌকিক ঐতিহ্যের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন।

এ. লোকপুরাণ

এ২১.১	নারী ও পুরুষ সৃষ্টিকর্তা
এ১২৩.২.১.২	চতুর্মুখ দেবতা
এ১২৩.৫.১	বহুভুজ দেবতা
এ১২৪.১	অগ্নিলোচন দেবতা
এ১৩১	পশু-আকৃতির দেবতা
এ১৩২	পশুর রূপে দেবতা
এ১৩৩	দানবরূপী দেবতা
এ১৩৬.১.৩	বৃষবাহন দেবতা
এ১৫১	দেবতাদের আবাসস্থল
এ১৬২	দেবতাদের মধ্যে বিরোধ
এ১৬২.১	দেব-দানবে যুদ্ধ
এ১৬৫.২	দেবদূত
এ৩১৫	পাতালের দেবী
এ৪৮৭	মৃত্যুর দেবতা
এ৬১০	সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব সৃষ্টি করলেন
এ৬৬১	স্বর্গ
এ৭০১	আকাশের সৃষ্টি
এ৭১০	সূর্যের সৃষ্টি
এ৮০০	পৃথিবীর সৃষ্টি
এ১০১০	প্রলয়
এ১১৭২	দিন ও রাতের নির্ধারণ
এ১২০০	মানুষের জন্ম
এ১২৪১	মাটি থেকে মানুষের জন্ম
এ১৩৩৫	মৃত্যুর সৃষ্টি

বি. জীবজন্তু

বি৪১.২	পক্ষীরাজ ঘোড়া
বি১২০	বুদ্ধিমান পশু
বি১২০.২	বুদ্ধিমান শেয়াল
বি১২২.১	যে পাখি উপদেশ দেয়
বি১৪৩	জ্ঞানী পাখি
বি২১০	কথাবলা পশু
বি২১১.১.৮	কথাবলা গাধা
বি২১১.২.৮	কথাবলা ইঁদুর
বি ২১১.৪	কথাবলা বেড়াল
বি২১৫.১	পাখির ভাষা
বি২৪০.৪	পশুরাজ সিংহ
বি২৪০.৫	বাঘ
বি৩০০	সাহায্যকারী পশু
বি৫৫২	পাখি-বাহিত মানুষ
বি৫৭১	মানুষের জন্য পশু কাজ করে

সি. ট্যাবু বা নিষেধাজ্ঞা

সি৫০	নিষেধাজ্ঞা: দেবতাকে বিদ্রূপ করা
সি২০০	নিষিদ্ধ ফল
সি৬১৪	নিষিদ্ধ পথ
সি৯৩০	নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন

ডি. এন্দ্রজালকতা বা জাদু

ডি৬১০	বারবার রূপ পরিবর্তন
ডি৮০০	জাদুবস্তু
ডি৮১১	দেবতার কাছ থেকে জাদুবস্তু পাওয়া
ডি৯৬৭	জাদুশেকড়
ডি৯৬৮	জাদুফল
ডি১০৫২	জাদুপোশাক

ডি১০৭৬	জাদুআংটি
ডি১২২৩.১	জাদুবাঁশি
ডি১২৭৩.১	জাদুপ্রয়োগ
ডি১৩৪৭.৩	জাদুওষুধ বন্ধ্যাকে সন্তানবতী করে
ডি১৩৪৭.৮	ফল-বাটা খেয়ে বন্ধ্যা সন্তানবতী হয়
ডি১৬১০.২	কথাবলা গাছ
ডি১৭১২	ভবিষ্যৎ-বক্তা
ডি১৯৬০.৩	ঘুমন্ত রূপবতী

ই. মৃত

ই০	পুনর্জীবন
ই২১	বিপজ্জনক বস্তুটি সরিয়ে প্রাণ ফিরে পাওয়া
ই১২১.১	দেবতার কৃপায় পুনর্জীবন
ই৬০০	পুনর্জন্ম
ই৬৭১	বারবার জন্মগ্রহণ

এফ. অসাধ্য-সাধন

এফ০	অন্যজগতে পাড়ি
এফ১১	আকাশপথে যাত্রা
এফ১৬	চাঁদের দেশে যাত্রা
এফ২০০	পরি
এফ২৫২.২	পরিরানি
এফ২৬১	নৃত্যরতা পরি
এফ২৬৫	স্নানরতা পরি
এফ৩০৩	পরির সঙ্গে মানুষের বিয়ে
এফ৪৫১	বামনাকৃতি
এফ৫৭৪.১	চোখ-ধাঁধানো রূপ
এফ৫৭৫.১	পরম রূপবতী কন্যা
এফ৮১৪.৩	কথাবলা ফল

জি. রাক্ষস-খোক্কস-দৈত্য-দানব-ডাইনি

জি১০০	দৈত্য
জি৩০৩	মায়াবিনী রানি
জি৫০১	বোকা রাক্ষস
জি৫৩৫	রাজকন্যা রাক্ষসীকে হত্যা করার পথ বলে দেয়

এইচ. পরীক্ষা

এইচ৪০০	সতীত্বের পরীক্ষা
এইচ৯০০	অসাধ্যসাধন পরীক্ষা
এইচ১০১০	অসম্ভব কাজ
এইচ১০১০.৩	অজানা কাজ
এইচ১২১২	অসুখের ভান করে কাউকে দূরে পাঠানো
এইচ১২৩৩	অনুসন্ধানে সাহায্যকারী
এইচ১৩৭১	অসম্ভব অভিযান

জে. চালাক ও বোকা

জে১৫৫	নারীর কাছ থেকে জ্ঞান
জে১৫৫.২	মায়ের কাছ থেকে জ্ঞান
জে১৫৭	স্বপ্নের মাধ্যমে জ্ঞান
জে১১১২	বুদ্ধিমতী বউ
জে১৭০৫.৩.১	বোকা স্বামী
জে১৭০৫.৪	বোকা বউ
জে১৭০৫.৫	কৃপণ স্বভাবের মানুষ
জে২১৩০	বোকা ব্যক্তিগত ক্ষতি উপেক্ষা করে
জে২১৬০	অপরিণামদর্শিতা

কে. প্রতারণা

কে ১০০	প্রতারণার মাধ্যমে লাভ
কে২৪২.১	হিংসুটে বোনেরা

কে৩০১	সুচতুর চোর
কে৩১১.৪.১	সাধুর ছদ্মবেশে প্রতারক
কে৭৩৫	ফাঁদে পেলে বন্দি করা
কে১২১০	প্রতারিতা নায়িকা
কে১২১০.১	নিগৃহীত প্রণয়ী
কে১২১০.৩	প্রতারিতা ছোটরানি
কে১২১৮.৪	ফাঁদে-পড়া উপপতি
কে১২১৮.৯	ফাঁদে-পড়া বউ
কে১৫৩৮.২	প্রতারণাময় অসুস্থতা
কে১৮১৭	ভবঘুরের ছদ্মবেশ
কে১৮৬০	সঠিক সময়ে প্রতারণা
কে২১১০.১	নিন্দিতা বউ
কে২২১১	বিশ্বাসঘাতক ভাইয়েরা
কে২২১১.০.৪	বিশ্বাসঘাতক বন্ধু
কে২২১২.১	বিশ্বাসঘাতিনী শাশুড়ি
কে২২১২.২	বিশ্বাসঘাতিনী ননদ
কে২২১৩	বিশ্বাসঘাতিনী বউ
কে২২২২	বিশ্বাসঘাতিনী সতিন
কে২২৫২	বিশ্বাসঘাতিনী দাসী

এল. ভাগ্যচক্র

এল১০	বিজয়ী কনিষ্ঠ পুত্র
এল১২৩	কপর্দকশূন্য নায়ক
এল১২৩.৫	ভাগ্যবিড়ম্বিত নায়ক
এল৪১২	অবস্থার পরিবর্তন
এল৪৭৭	অহংকারীর পতন

এম. ভাগ্য বা নিয়তিকে বশে আনা

এম২০৫	সংকল্প ভাঙা
এম৩০২.২	মানুষের ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত থাকে

এম৩৬১	ভাগ্যবান নায়ক
এম৪১১.১২	ডাইনির অভিশাপ

এন. অদৃষ্ট বা কপাল

এন১০১	নিষ্ঠুর নিয়তি
এন২০৩	ভাগ্যবান মানুষ
এন২৫০	ধারাবাহিক মন্দ কপাল
এন৩৬৫	না জেনে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া
এন৩৯১	ভবিষ্যৎ-বাণী মিলে যাওয়া
এন৮১০	অলৌকিক সাহায্যকারী

পি. সমাজ

পি১৬.৪.১	সতী
পি১৮.৩	অসতী
পি২৫৩	ভাই ও বোন
পি৩১০	বন্ধুত্ব
পি৫২২	আদালত

কিউ. পুরস্কার ও শাস্তি

কিউ২	দয়ালু ও নির্দয়
কিউ৪২	উদারতার পুরস্কার
কিউ২০০	পাপের শাস্তি
কিউ২২০	অধর্মের শাস্তি
কিউ ২৪১	ব্যভিচারের শাস্তি
কিউ২৮১	অকৃতজ্ঞতার শাস্তি
কিউ ২৮৫	নিষ্ঠুরতার শাস্তি
কিউ ৩৩১	অহংকারের শাস্তি

আর. বন্দি ও পলাতক

আর১১০	বন্দির মুক্তি
আর১১১	বন্দিনী মেয়ের মুক্তি
আর১৫২	বউ স্বামীকে মুক্ত করে

এস. অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা

এস১১	নিষ্ঠুর পিতা
এস৩১	নিষ্ঠুর সৎমা
এস৫১	নিষ্ঠুর শাশুড়ি
এস১৪৩	বনে নির্বাসন
এস৪০০	যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

টি. যৌনবিষয়ক

টি১৫	প্রথম দেখাতেই প্রেম
টি২৪.১	প্রেম-কাতরতা
টি৩২	প্রেমিক-প্রেমিকার দেখা হয়
টি৫৩	ঘটক
টি৫৭	প্রেম-ঘোষণা
টি৮১	প্রেমের ফলে মৃত্যু
টি৯১	অসম প্রেম
টি৯৭	বাবা মেয়ের বিয়ের বিরোধিতা করে
টি১২১	অসম বিয়ে
টি২৩২.২	ব্যভিচারিণী নারী জঘন্য উপপতিকে পছন্দ করে
টি২৫৩	জ্বালাতন-করা বউ
টি২৫৬	ঝগরুটে বউ
টি২৫৭	হিংসুটে স্বামী
টি২৫৭.১	বড় রানিরা ছোট রানিকে হিংসে করে
টি২৫৭.২	সতিনের প্রতি হিংসা
টি৪৭১	ধর্ষণ

টি৫১১.১	ফল খেয়ে গর্ভবতী
টি৬৮৫	যমজ

ভি. ধর্ম

ভি৫০	প্রার্থনা
ভি২২২	ধার্মিক ব্যক্তি
ভি৩০০	ধর্মবিশ্বাস

ডাবলিউ. চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য

ডাবলিউ১১	উদারতা
ডাবলিউ১৫২	কৃপণতা
ডাবলিউ১৫৪	কৃতজ্ঞতাবোধ

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জি

আমেরিকান বাইবেল সোসাইটি: নূতন নিয়ম। দ্য বাইবেল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্গালোর। ১৯৭৪

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস: মহাভারত (১-৬ খণ্ড) কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত। সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা। ১৯৭৪-৭৫

ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট মিশনারিজ: দ্য হোলি বাইবেল ইন বেঙ্গলি। ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি, কলকাতা। দ্বাদশ সংস্করণ, ১৯২০

দিব্যজ্যোতি মজুমদার: আদিবাসী লোককথা। একুশ শতক, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭

: বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৫

মঙ্গলচন্দ্র সরেন: মারাং বুরুর মাহাত্ম্য। হিতৈষী প্রকাশনী, ঝাড়গ্রাম। ১৯৮১

নায়কে মঙ্গলচন্দ্র তুড়কু লুমাম সরেন: সাঁওতাল জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি (১ খণ্ড) গ্রামীণ গবেষণা ও চর্চাকেন্দ্র, ঝাড়গ্রাম। ১৯৮২

ফসবৌল সম্পাদিত: জাতক (১-৬ খণ্ড) ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ, ১৩৮৪-১৩৮৬

বাল্মীকি: রামায়ণ (১-২ খণ্ড) হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত। ভারবি, কলকাতা। ১৯৭৫-১৯৭৬

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (১৩ ও ১৫ খণ্ড)। নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা। ১৯৮২-৮৩

সোমদেব ভট্ট: কথাসরিৎসাগর। হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস অনূদিত। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, কলকাতা। ১৯৭৫

Boccaccio, Giovanni: The Decameron. Tr. by Richard Aldington. Bestseller Library, London. 1958

Bodding, P. O.: Santal Folktales. (3 vols). Oslo and Cambridge. 1925-29.

Bowra, C. M.: The Greek Experience. Mentor Book, New American Library. 1962

Breasted, James H.: Ancient records of Egypt. University of Chicago Press. 1929

Brown, William Norman: The Panchatantra in Modern Indian Folklore. JAOS, XXXIX, 1919

Budge, E. A. Wallis: Nile and Tigris, J. Murray, London, 1920

Buitenen, J. A. B.: Tales of Ancient India. University of Chicago Press. 1949

Chiera: Sumerian epics and myths. University of Chicago Press. 1934

Childe, V. Gordon: What happened in history. Penguin Books, London. 1967

Christiansen, Reider: The migratory legends. Helsinki. 1958

Cottrel, Leonand: Anvil of Civilization. New American Library, New York. 1959

Cowell, Edward Byles: The Jataka. Chambridge University Press. 1895-1907

Dawkings, R. W.: The meaning of folktales. Folklore, LXII, 1951

Feldmann, Susan: African myths and tales. Dell Publishing, New York. 1963

Frazer, J. G: Folklore in the Old Testament. London. 1918

: The Golden Bough. Ab. Ed. Macmillan, London, 1957

Goodrich, Norma Lorre: The Ancient Myths. Mentor Book, New York. 1959

Graves, R: Greek Myths. London. 1955

Hartland, E. S.: Mythology and Folktales. David Nutt, London. 1914

Homer: The Illiad. Tr, by E. V. Rieu. Penguin Books, London. 1951

: The Odyssey. Tr. by E. V. Rieu, Penguin Books, London, 1951

Hooke, S. H.: Middle Eastern Mythology. Penguin Books, U.S.A 1963

Hornstein, Lillian Herlands (Ed): The Reader's Companion to World Literature. Mentor Book, The New American Library, New York. 1961

Jacob, Joseph: The Fables of Aesop. New York. 1894

King, L.W: First steps in Assyrian. Kegan Paul, London. 1898

: Legends of Babylon and Egypt. London. 1918

Kramer, S.N.: From the Tablets of Sumer. Colorado. 1956

: Sumerian Mythology. American Philosophical Society, Philadelphia. 1944

Lang, A.: Introduction to Cox, Cinderella. Folklore Society, London. 1893

Leach, Maria (Ed): Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend (2 vols). Funk & Wagnalls Company. New York. 1949-50.

Mendelsohn, J: Religions of the Ancient Near East. New York. 1955

Ovid: The Metamorphoses. Tr. by Horace Gregory. Mentor Book, New York. 1960

Rose, H. J.: A handbook of Greek Mythology. Methuen & Co. London. 1928

Ryder, Arthur W.: The Panchatantra. Jaico Publishing House, Bombay. 1949

Sandars, N. K. (Tr.): The Epic of Gilgamesh. London. 1960

Smith, Sidney: Early history of Assyria to 1000 B. C. London. 1928

Tawney, C. H.: Kathasaritsagara. Bibliotheca Indica Series (2 vols). Asiatic Society of Bengal. Calcutta. 1880-84

Thompson, Stith: The Folktale. University of California Press. 1977

: Tales of the North American Indians. Indiana University Press, Bloomington. 1929

Valmiki: The Ramayana. Tr. by Hari Prasad Shastri. Shanti Sadan, London. 1957-59

Vijaydeb, Yogendra (Ed): Essays on Religious Traditions of the World. The Helen Vale Foundation of Australia. Melbourne. 2nd Ed. 1972

নির্দেশিকা

আরও গাঙচিল

প্রবন্ধ

অলীক সংলাপ রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত ২০০
কলকাতা প্রতিদিন অশোক মিত্র ২৫০
এক কুড়ি পছন্দের প্রবন্ধ অশ্রুকুমার সিকদার ৩০০
নির্বাচিত ধ্রুবপদ-১ সম্পাদনা: সুধীর চক্রবর্তী ৫০০
দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা সম্পাদনা: সেমন্তী ঘোষ ২৫০
স্বাধীনতা: স্বদেশ, সমাজ, সংস্কৃতি সম্পাদনা: আনন্দ দাশগুপ্ত ২৫০
মননের মধু অরিন্দম চক্রবর্তী ২৭৫
জীবনানন্দ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য ভূমেন্দ্র গুহ ২৭৫
The Rights and Wrongs of it: The Right to Information
Ed. Bhabesh Das & Rajiv K Bhattacharyya 700
A Unique Crime: Understanding Rape in India Ed Swati Bhattacharjee 450
Nandigram and Beyond: Ed. Gautam Ray 395
তথ্যের অধিকার (নব সংস্করণ) সম্পাদনা: ভবেশ দাশ ২৫০
সম্প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি সম্পাদনা: ভবেশ দাশ ৪০০
সংস্কৃতি, কী আছে তোমার পেটিকায় হাসান আজিজুল হক ১৫০
বাংলা ফিল্মের গান ও সত্যজিৎ রায় সুধীর চক্রবর্তী ১৭৫
কলিযুগ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ২৫০
ফকিরনামা সুরজিৎ সেন ২৭৫
বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫
মিডিয়া নিয়ে সাতপাঁচ সোমেশ্বর ভৌমিক ১৭৫
ভগবানের লেজি: ঈশ্বর না-ঈশ্বর বিজ্ঞান সমাজ আশীষ লাহিড়ী ১৭৫
শ্বেত অশ্ব আর ইয়েসমিন ও অন্যান্য প্রবন্ধ শুভাপ্রসন্ন ১৭৫
শূদ্র জাগরণ গৌতম রায় ১৭৫
অদ্বৈত মল্লবর্মণ: একটি ভিন্ন প্রতিস্রোত দেবীপ্রসাদ ঘোষ ১২৫
আদরের উপবাস: রবীন্দ্রনাথ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০
টাঁড় পাহাড়ের পদাবলি মিহির সেনগুপ্ত ১৫০
বাউলের চরণদাসী লীনা চাকী ১৭৫
অনন্তের অ্যানাটমি স্বাতী ভট্টাচার্য ২০০
বিবি থেকে বেগম আকিমুন রহমান ১৫০
নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ: এক বিতর্কিত সম্পর্কের উন্মোচন দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত ১৫০
পরমাণু চুক্তি নয়: নবীকরণযোগ্য শক্তিই ভরসা প্রদীপ দত্ত ১৫০

অভিধান

চলিত ইসলামি শব্দকোষ মিলন দত্ত ১৭৫
অভি-ধানাই-পানাই হিমানীশ গোস্বামী ১৫০
আহাম্মকের অভিধান গুস্তাভ ফ্লবের, অনুবাদ: চিন্ময় গুহ ১২৫

স্মৃতি

দয়াময়ীর কথা সুনন্দা সিকদার ১৫০
জীবন যেখানে যৌবন শানু লাহিড়ী ১৫০
উৎস থেকে মোহনা পারুল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৫
আমরা তো এখন ইন্ডিয়ার অধীর বিশ্বাস ৭৫
পুণ্য-পদ্মার কান্নাকাটি অধীর বিশ্বাস ৭৫
শৈ-শেরামের পাঁচালি আনসারউদ্দিন ১৫০
মেয়েদের হস্টেল জীবন অহনা বিশ্বাস ১৫০